মাকামে ছাহাবা

ও

কারামাতে ছাহাবা

মাকামে ছাহাবা
ও
কারামাতে ছাহাবা

হযরত মাওলানা মুফতী শফী ছাহেব (রহ.)
ও
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা
আশরাফ আলী থানবী (রহ.)

অনুবাদ
মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ

প্রকাশনায়
মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা-১২১১

মাকামে ছাহাবা ও কারামাতে ছাহাবা

রচনা
হযরত মাওলানা মুফতী শফী ছাহেব (রহ.)
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)

ভাষান্তর
মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ

প্রকাশক
মোহাম্মদ আশিক
মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা-১২১১
ফোন ঃ ৭৩১৫৮৫০

হাদিয়া ঃ ৯০.০০

প্রকাশ কাল
মার্চ ২০০৫ ইং

মুদ্রণে
মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস
৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড
ঢাকা-১২১১
ফোন ঃ ৮৬২২৩১৩

শব্দবিন্যাস
ক্রিয়েটিভ
এন-২০, কুমিল্লাপাড়া, আশরাফাবাদ
কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা।
০১৮৮২৬৭৩৮৯, ০১৯১২৬২৯৬৪

পরিবেশনায়
মোহাম্মদী লাইব্রেরী
বিশাল বুক কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা

মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৭৩১৫৮৫০

সূচীপত্র

মাকামে ছাহাবা

কারামাতে ছাহাবা

اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم

আমার সাহাবাগণ নক্ষত্র স্বরূপ, তোমরা তাদের যে কারো
অনুসরণ করবে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।

মাকামে ছাহাবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كَلِمَاتِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ رِضِي نَفْسِهِ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلي خَيْرِ خَلْقِهِ وَ صَفْوَةِ رُسُلِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ الَّذِيْنَ هُمُ النُّجُوْمُ الْمُهْتَدِي بِهِمْ وَالْقُدْوَةِ وَالْاُسْوَةِ فِيْ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَ السُّنَّةِ وَهُمُ الْاَدِلَّاءُ عَلي الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

উম্মতের মাঝে ছাহাবা কেরামের অবস্থান তো মর্যদার সর্বোচ্চ শিখরে। সুতরাং তাদের জীবন চরিতালোচনা আমাদের জন্য কত যে বরকতময় ও কল্যাণাবাহী তা বলাই বাহুল্য। এমনকি উম্মতের সাধারণ অলি-বুজুর্গদের বিভিন্ন ঘটনা ও গুণাবলীর আলোচনাও মানুষকে সত্যের পথে অনুপ্রাণিত করে। তাদের জীবনে আমূল ধর্মীয় বিপ্লব সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অচিন্তনীয় সুফল বয়ে আনতে পারে। যুগে যুগে উম্মতের বিভিন্ন দুর্যোগে বার বার প্রমাণিত এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে আমাদের বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু কিন্তু ছাহাবা কেরামের ফাযায়েল ও মানাকিব তথা গুণগাণের আলোচনা নয়। কেননা বিভিন্ন হাদীছ-গ্রন্থে সন্নিবেশিত 'মানাকিব' অধ্যায়গুলোর পাশাপাশি পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় এ বিষয়ে এ পর্যন্ত বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আলহাম্‌দুলিল্লাহ্।

তদ্রূপ ছাহাবা-যুগের ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। তবে ইতিহাস সম্পর্কে দুটো কথা এখানে বলে নিতে পারি। ইতিহাস মানে বিগত যুগের মানব সমাজের সন্দুর অসুন্দর উভয় দিক তুলে ধরা এবং 'অনুপাত' বিচারে কাওকে নন্দিত, কাওকে নিন্দিত এবং কাওকে সাধু, কাওকে অসাধু রূপে চিহ্নিত করা। 'অনুপাত' বিচারের প্রয়োজন এজন্য যে, পৃথিবীতে নবী রাসূলের পরে এমন বিশুদ্ধতম মানুষের অস্তিত্ব নেই যার জীবন ও চরিত্রে সামান্যতম খুঁত নেই। অসুন্দরের ক্ষীণতম ছায়াপাত নেই। তদ্রূপ এমন নিকৃষ্টতম মানুষও নেই যার জীবন ও চরিত্রে পুণ্যের কোন স্পর্শ নেই। সুন্দরের কোন ছাপ নেই। সুতরাং 'অনুপাত' বিচারই হবে ভাল মানুষ ও মন্দ মানুষের মাপকাঠি। অর্থাৎ গোটা জীবন যার কেটেছে সুন্দর কর্ম ও উত্তম চিন্তার মাঝে, কল্যাণ ও পুণ্যের সুস্নিগ্ধ পরশে। যার সকল 'আচরণ ও উচ্চরণে'

ঘটেছে ইখলাছ ও আল্লাহ্‌ প্রেমের সাবলীল প্রকাশ, জীবনের দু' একটি পদস্খলন বা দুর্ঘটনা সত্ত্বেও অবশ্যই তিনি শামিল হবেন উম্মতের নেক ও সৎ লোকদের কাতারে। তদ্রূপ যার জীবনের সকাল-সন্ধা কেটেছে পাপের অন্ধকারে, শরীয়তের আহকাম ও বিধান লংঘন করে করে, একটি বা দশটি পুণ্যকর্মের সুবাদে কিছুতেই সে পেতে পারে না অলী বুজুর্গের স্বীকৃতি।

তবে মনে রাখতে হবে যে, পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে ঘটনাবলীর নিরপেক্ষ বিবরণ দিয়ে যাওয়াই হলো ইতিহাসের ইতিকর্তব্য। সেই ঘটনাবলীর বিচার বিশ্লেষণ এবং লব্ধ ফলাফলের আলোকে ব্যক্তি ও শ্রেণীর ধর্মীয় বা জাগতিক মর্যাদার স্তর নির্ধারণ কিন্তু ইতিহাসের দায়িত্ব নয়। এটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বিষয়; যাকে ইতিহাসতত্ত্ব বলা যেতে পারে, ইতিহাস বলা যেতে পারে না।

পৃথিবীর সাধারণ মানুষ বা সাধারণ শ্রেণীর বেলায় অবশ্য এই ইতিহাসতত্ত্ব ইতিহাসের সাধারণ ঘটনাবিবরণীকে নির্ভর করেই গড়ে উঠে। সেক্ষেত্রে ইতিহাস জানেন বা বুঝেন এমন যে কোন ব্যক্তি নিজস্ব চিন্তা ও দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীন ও মুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু উম্মতের সকল যুগের সকল মানুষের অখণ্ড শ্রদ্ধার পাত্র ছাহাবা কেরামের বিষয়টি পৃথিবীর অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মত নয়।

এ অভ্রান্ত সত্যের আলোকে 'মাকামে ছাহাবা' গ্রন্থে আমি প্রমাণ করতে চাই যে, সাধারণ জীবনচরিত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইতিহাসের বিচার গ্রহণযোগ্য হলেও ছাহাবা কেরামের স্থান ও মর্যাদার পরিমাপ কিন্তু ইতিহাসের দাঁড়িপাল্লায় করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় নিছক ঐতিহাসিক ঘটনাবিবরণীর আলোকে ছাহাবা-চরিত্রের রূপ ও স্বরূপ নির্ণয় করা। কেননা ছাহাবা কেরাম হলেন আল্লাহ্‌র রসূল ও তাঁর সাধারণ উম্মতের মাঝে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এক মজবুত যোগসূত্র। এই যোগসূত্র ছাড়া কোরআনের 'শব্দ-পঠন' লাভ করা যেমন উম্মতের পক্ষে সম্ভব ছিলো না, তেমনি সম্ভব ছিলো না কোরআনের ব্যাখ্যা ও মর্মজ্ঞান অর্জন, যা পেশ করার দায়িত্ব স্বয়ং কোরআন সোপর্দ করেছে আল্লাহ্‌র রাসূলের যিম্মায়। ইরশাদ হয়েছে—

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

মানুষের উদ্দেশ্যে যা নাযিল করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা ও মর্ম যেন তাদের সামনে আপনি তুলে ধরেন।

তদ্রূপ 'রিছালাত' তথা রাসূলের বাণী ও শিক্ষার সম্পদভাণ্ডার এই যোগসূত্র ছাড়া লাভ করা সম্ভ নয় কারো পক্ষে।

ছাহাবা কেরাম হলেন রাসূল-জীবনের সার্বক্ষণিক সহচর। স্বয়ং আল্লাহ্‌

তাঁদের নির্বাচন করেছিলেন এ পবিত্র সাহচর্যের জন্য। তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, শিক্ষা ও আদর্শ ছিলো স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও আপন প্রাণের চেয়েও প্রিয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভাণ্ডারও ছিলো তার তুলনায় তুচ্ছ। তাই জানমাল কোরবান করে রাসূলের পায়গাম তারা ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্তে। ফলে তাদের জীবন-চরিত হয়ে উঠেছে নববী সীরাত ও জীবন-চরিতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং তাঁদের স্থান ও মর্যাদার নির্ভুল পরিচয় পেতে হলে কোরআন, সুন্নাহ ও সীরাতুন্নবীর দর্পণেই অবলোকন করতে হবে তাদেরকে। ইতিহাস গ্রন্থের ছেঁড়া পাতায় পাওয়া যাবে না তাঁদের জীবন ও চরিত্রের আসল ছবি। মোটকথা; ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে এক বিশিষ্ট স্থান ও স্বতন্ত্র মর্যাদা। 'মাকামে ছাহাবা' নামে সেটাই আমি তুলে ধরতে চাচ্ছি উম্মতের সামনে।

গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিচারে অবশ্য বহু আগেই হওয়া উচিত ছিলো এ আলোচনা যা বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে এতদিন সম্ভব হয়ে উঠে নি। কিন্তু জীবনের ছিয়াত্তরটি মনজিল অতিক্রম করে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির লাগাতার হামলায় আমি যখন বিপর্যস্ত প্রায়। দেহমনের অবসাদে এবং শক্তি-উদ্যমের প্রবল ভাটায় আমি যখন অক্ষমপ্রায়, ঠিক তখনই দেখা দিল এ বিষয়ে কলম ধরার এক অনিবার্য কারণ। অথচ ইলম ও আমলের যোগ্যতা কতটুকুইবা আর। যা ছিলো তাও এখন রুখসত হওয়ার পথে।

সম্প্রতি উদ্ভূত 'কিছু পরিস্থিতি'ই হচ্ছে সেই 'অনিবার্য কারণ' যা ছিয়াত্তর বছরের এই বুড়োকে করে তুলেছে অস্থির, তার কম্পিত হাতে তুলে দিয়েছে কলম। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ছাহাবা-বিদ্বেষ ও ছাহাবা-সমালোচনার 'পরিচয়-বৈশিষ্ট' নিয়ে উম্মতের একটি গোমরাহ ফেরকা সেই ছাহাবাযুগেই আত্মপ্রকাশ করেছিলো। তবে প্রকাশিত স্বরূপের কারণেই উম্মাহর সাধারণ জামা'আত থেকে এরা ছিলো বিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত নামে পরিচিত জমহুরে উম্মতের সাধারণ পরিচয়-বৈশিষ্টই হলো ছাহাবা-প্রেম ও ছাহাবা-মর্যাদার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। তাদের দৃষ্টিতে ছাহাবা কেরামের আদব-ইহ্‌তেরাম রক্ষা করা যেমন অপরিহার্য তেমনি তাঁদের সুমহান ব্যক্তিত্বের সামান্যতম সমালোচনাও অমার্জনীয়। এ বিষয়ে জমহুরের 'কলম' ও 'কালাম' আশ্চর্য রকম সংযত। অবশ্য বিভিন্ন মাসআলায় ছাহাবাদের মতবিরোধের ক্ষেত্রে বলাইবাহুল্য যে, যুগপৎ দু'টি পরস্পর বিরোধী মত অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সবার প্রতি সমান শ্রদ্ধা রেখে শরীয়তী ইজতিহাদের আলোকে একটি মত

গ্রহণ, আর কোন না কোন অজুহাতে ছাহাবা চরিত্রে কলঙ্কলেপন ও ছিদ্রান্বেষণ এক কথা নয়। প্রথমটি প্রশংসনীয়। দ্বিতীয়টি অমার্জনীয়।

গবেষণা-ব্যাধি

মুক্তবুদ্ধির ছদ্মাবরণে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যে মারাত্মক ব্যাধিটি মুসলিম বিশ্বে আজ অনুপ্রবেশ করেছে তা হলো, যে কোন বিষয়ে লাগামহীন চর্চা-গবেষণা। অবশ্য বিচার পর্যালোচনা ও চিন্তা-গবেষণা নীতিগতভাবে দোষের কিছু নয়। কোরআনুল করীম এ মানসিকতাকে বরং স্বাগত জানিয়েছে। কোরআনের দৃষ্টিতে عِبَادُ الرَّحْمٰنِ এর অন্যতম প্রশংসনীয় গুণ হলো এই—

وَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَ عُمْيَانًا O

আর যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত ও বাণী অন্ধ-বধিরদের ন্যায় বিনানুসন্ধানে যথেচ্ছা আমল শুরু করে না ; বরং পূর্ণ বোধ অর্জনপূর্বক আমলে রত হয়।

তবে বিশ্বাস ও আচরণের সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের রয়েছে নিজস্ব সীমা ও প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ। সেই সীমারেখা ও বিধিনিষেধ অক্ষুণ্ণ রেখে যে কাজ আঞ্জাম পাবে সেটাই হবে গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে তা লংঘিত হলে সেটা ধিকৃত হবে ফাসাদ ও অকল্যাণ বলে।

প্রশংসনীয় গবেষণা

বিচার-গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম নীতি-নির্দেশ হলো ; জাগতিক বা পরকালীন কল্যাণসম্ভাবনা নেই এমন কোন বিষয়ের গবেষণায় সময় ও মেধা ব্যয় করা চলবে না। 'বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাস' হিসাবে নিছক গবেষণার জন্য গবেষণা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষ্ফল কর্ম বৈ কিছুই নয়। তাই রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সযত্নে তা পরিহার করে চলার জোর তাকিদ দিয়ে গেছেন। বিশেষতঃ উম্মতের মাঝে ফিতনা, গোলযোগ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির সুযোগ এনে দেয় যে গবেষণা ও সমালোচনা তার বিন্দুমাত্র অবকাশ ইসলামে নেই। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর গবেষণাপ্রেমিকদের আদর্শ উদাহরণ হলো সেই গুণধর পুত্র যিনি তথ্যানুসন্ধানযোগে জানতে চান, তার পিতৃ-পরিচয়ের বিশুদ্ধতা কতখানি এবং তার গর্ভধারিণীর জীবনে অন্য পুরুষের ছায়াপাত আছে কি না।

মোটকথা, কোন ব্যক্তির জীবন ও চরিত্র পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যন্ত ন্যায়নির্ভর ও প্রজ্ঞাশ্রয়ী যে মূলনীতি ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে

তা লংঘন করে যার সম্পর্কে যেমন ইচ্ছা 'কলম ও জিহ্বা' চালনার অধিকার নেই কারো। হাদীছের সনদ ও সূত্র পর্যালোচনা (الجرح والتعديل) বিষয়ক গ্রন্থে এ সম্পর্কিত আলোচনা দেখা যেতে পারে। এখানে তার অবতারণার অবকাশ নেই।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য অনুসৃত রিসার্চ ও গবেষণার মূলকথাই হলো সংযম ও শ্রদ্ধাবোধ বর্জিত লাগামহীন সমালোচনা। অতিসম্প্রতি এই নব্য সমালোচনা দর্শন দ্বারাই কতিপয় মুসলিম লেখক, গবেষক দুঃখজনকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। বিনা কারণে অতীতের স্মরণীয় বরণীয়দের অসংযত সমালোচনাকেই যেন তারা ভাবছেন উম্মাহর আজীমুশশান বুদ্ধিবৃত্তিক খেদমত কিংবা বৈদগ্ধের স্বীকৃতি লাভের মোক্ষম উপায়।

সালাফে সালেহীন ও আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের বিরুদ্ধে এ অস্ত্রের প্রয়োগ তো বেশ পুরনো। কিন্তু এখন তা গড়িয়েছে ছাহাবা কেরাম পর্যন্ত ; যারা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের জন্য স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্বাচিত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচয়ের দাবীদার এই গবেষকরা ছাহাবা কেরামের সুমহান ব্যক্তিত্বে সমালোচনার শর নিক্ষেপকেই এখন তাদের জ্ঞান, মেধা ও গবেষণার প্রিয় ক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছেন।

এক দিকে হযরত মুআবিয়া (রাযি.) ও পুত্র এজীদের পক্ষ-সমর্থনের নামে শুরু হয়েছে হযরত আলী (রাযি.) ও বনু হাশিম পরিবারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। অন্য দিকে আলী-প্রীতির নামে যারা কলম ধরেছেন তারা মেতে উঠেছেন হযরত মুআবিয়া, উছমান ও তাঁদের অনুসারী ছাহাবাদের চরিত্রহরণের অপচেষ্টায়। ছাহাবা কেরামের নূন্যতম আদব ইহতেরাম দূরের কথা, ইসলামের ন্যায়নির্ভর ও প্রজ্ঞাশ্রয়ী সমালোচনা-নীতিটুকুও অনুসরণের বিন্দুমাত্র গরজ নেই কোন পক্ষের। সকল নীতিবোধ ও বিধিনিষেধই খড়কুটার ন্যায় ভেসে গেছে উন্মত্ত হামলার প্রবল স্রোতের তোড়ে।

ধর্মে অশিক্ষিত ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঝলকমুগ্ধ তরুণ সমাজে এ অভিনব 'গবেষণা-যুদ্ধের' ফল এই হয়েছে যে, ছাহাবা কেরামের শানে অসংযত 'আচরণ' ও 'উচ্চারণের' এক সর্বনাশা প্রবণতা শুরু হয়েছে তাদের মাঝে। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মাহর মাঝে অপরিহার্য যোগ্যসূত্র যে ছাহাবা কেরাম ; তাদের নামিয়ে আনা হয়েছে আজকের রাজনৈতিক নেতাদের কাতারে, যাদের দিনরাতের 'মশগলা' হলো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তি স্বার্থরক্ষা।

শুরু থেকেই ছাহাবা বিদ্বেষের পরিচয় বহনকারী গোমরাহ ফেরকাগুলো দ্বারা উম্মাহর তেমন কোন ক্ষতির আশংকা নেই। কেননা ভ্রষ্ট দল হিসাবেই

সর্বত্র তারা চিহ্নিত ও ঘৃণিত। কিন্তু পরিস্থিতি এখন চরম সর্বনাশা মোড় নিয়েছে। কেননা খোদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচয়ের দাবীদার মুসলমানদের মাঝেই ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

আল্লাহ্ না করুন, ছাহাবা কেরামের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাই যদি মুসলিম উম্মাহ হারিয়ে ফেলে, তাহলে কোরআন সুন্নাহর আস্থাযোগ্যতা এবং দ্বীন ও শরীয়তের স্বীকৃত মৌলবিশ্বাসগুলোর প্রামাণ্যতা মুহূর্তে ধুলায় মিশে যাবে। তখন চরম ধর্মীয় নৈরাজ্য ছাড়া এর পরিণতি বলুন আর কী হতে পারে।

এ অনিবার্য কারণই বয়স, স্বাস্থ্য ও সময়ের সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে আলোচ্য বিষয়ে কলম ধরতে আমাকে বাধ্য করেছে। তুমি সাক্ষী হে আল্লাহ্! মুসলিম উম্মাহ্র হিতাকাংখা ও কল্যাণ কামনাই শুধু এ অধমের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ হাফেয! আল্লাহ্ ভরসা!

বিভ্রান্তির মূল উৎস

বর্তমানে সারা দুনিয়া যখন ইসলামী শা'আঈর ও প্রতীকসমূহের প্রকাশ্য অবমাননা চলছে, নগ্নতা ও বেহায়াপনার মহা সয়লাব যাবতীয় ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংস করে চলেছে, খুনখারাবী ও গৃহবিবাদের তাণ্ডবতায় গোটা মুসলিম বিশ্ব বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তদুপরি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র 'বর্ণচেনা' ও 'বর্ণচোরা' শত্রুরা ক্ষুধার্ত হায়েনার হিংস্রতা নিয়ে দিকে দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এক কথায় অস্তিত্ব ও বাঁচামরার প্রশ্নে মুসলিম উম্মাহ যখন লড়ছে, সেই নাযুক মুহূর্তে গবেষক ও সমালোচক বন্ধুরা কেন কবর খুড়ে 'মড়া' বের করছেন। কেনইবা ঘুমন্ত ফেতনা জাগিয়ে তোলার আত্মঘাতী তৎপরতায় মেতেছেন। আপাতত সে প্রশ্ন আমি তুলব না। এখানে আমি শুধু গবেষক-সমালোচক বন্ধুদের ভ্রান্তির মূল উৎস সবার সামনে তুলে ধরতে চাই, যা তাদের ও তাদের অনুসারীদেরকে বিভিন্ন ধর্মীয় বিভ্রান্তির চোরাবালিতে নিক্ষেপ করেছে।

তথাকথিত সমালোচক গবেষক বন্ধুদের মূল গলদ এই যে, সাধারণ মানুষের ন্যায় ছাহাবা কেরামের সুমহান ব্যক্তিত্বকেও শুধু ইতিহাসের আয়নায় তারা দেখতে চেয়েছেন এবং সত্যমিথ্যা যাবতীয় বর্ণনার সমাবেশ থেকে আহরিত সিদ্ধান্তকেই তারা ছাহাবা চরিত্রে আরোপ করেছেন এবং সে আলোকেই তাদের জীবন ও কর্মকে যাচাই করেছেন। কোরআন ও সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট ভাষণ এবং সেই সূত্রে উম্মাহ্র সার্বজনীন বিশ্বাস ছাহাবা কেরামকে যে বৈশিষ্টপূর্ণ স্থান ও মর্যাদা দান করেছে তা তাদের নজর এড়িয়ে গেছে। আল-কোরআন তাদের জন্য আল্লাহ্র রেযা ও সন্তুষ্টি ঘোষণা করে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ তাদেরকে হেদায়েতের তারকা বলে উম্মাহকে তাদের অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছে, আর তাই জমহুরে-উম্মত তাদের স্থান দিয়েছেন সবরকম সমালোচনার উর্ধ্বে। অবশ্য ছাহাবা কেরামের ইজতিহাদী মতভিন্নতার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন মত গ্রহণ বা বর্জন সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। এটা আদব ও শ্রদ্ধাবোধ বিরোধী নয় এবং বর্জিত মত পোষণকারী ছাহাবীর প্রতি অবমাননাও নয়। মতভিন্নতার ক্ষেত্রে দু'টি যুগপৎ বিপরীত মতের উপর আমল করা সম্ভব নয়। সুতরাং শরীয়তের উপর আমল করার স্বার্থে দু'টি বিপরীত মতের একটিকে যুক্তি ও ইজতিহাদের মাধ্যমে গ্রহণপূর্বক আমল করা অপরিহার্য। অবশ্য বর্জিত মত পোষণকারী ছাহাবীর প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করা চলবে না কিছুতেই। কেননা শরীয়তেরই নির্দেশ মোতাবেক যোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি ইজতিহাদ প্রয়োগ করেছেন মাত্র।

ইতিহাসের ভূমিকা ও গুরুত্ব

উপরোল্লেখিত আলোচনার মূল বক্তব্য এই যে, যেহেতু মহান ছাহাবা কেরাম রাসূল ও তাঁর উম্মতের মাঝে অপরিহার্য যোগসূত্র হিসাবে কোরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে এক অত্যুচ্চ স্থান, অবস্থান ও মর্যাদার অধিকারী, সেহেতু তাদের সুমহান ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন নিছক ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বর্ণনার মাপকাঠিতে হতে পারে না। এমন বিচারকের মর্যাদা ইতিহাসের প্রাপ্য নয়। তবে এর অর্থ কিন্তু ইতিহাসশাস্ত্রের আস্থাযোগ্যতা অস্বীকার করা নয়। ইসলাম বরং বলিষ্ঠ কণ্ঠেই ইতিহাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। তবে আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতার স্তর তারতম্যও এক অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য। ইসলামী শরীয়তে কোরআনুল কারীম ও হাদীছে মুতাওয়াতির* আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতার যে শীর্ষ স্তরের অধিকারী, কোনক্রমেই তা সাধারণ হাদীছের প্রাপ্য নয়। তদ্রূপ হাদীছে রাসূলের যে স্তর, তা ছাহাবা কেরামের বাণী ও বক্তব্যের প্রাপ্য নয়। একইভাবে ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোও কোরআন, হাদীছ ও বিশুদ্ধ সনদে সুপ্রমাণিত ছাহাবা বাণীর সমতুল্য আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতা দাবী করতে পারে না কোন যুক্তিতেই। বরং কোরআনী আয়াতের দৃশ্যতঃ বিপরীত বক্তব্যের সাধারণ হাদীছকে যেমন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সম্ভব না হলে কোরআনের মোকাবেলায় প্রত্যাহার করা আবশ্যক, তদ্রূপ কোরআন-সুন্নাহর সুপ্রমাণিত

* সনদের প্রতিস্তরে নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যাধিক্য হেতু যে হাদীছ সুনিশ্চিতরূপে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সংযুক্ত বলে সুপ্রমাণিত।

বক্তব্যের সাথে ঐতিহাসিক বর্ণনার বিরোধ দেখা দিলে সরাসরি তা বর্জন করা কিংবা সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যাসহ গ্রহণ করা অপরিহার্য। কোন বর্ণনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রামাণ্যতা যত অকাট্যই হোক, কোরআন-সুন্নাহ্‌র মোকাবেলায় তার বিন্দুমাত্র ধর্মীয় মূল্য নেই।

আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতার এই যে স্তরবিন্যাস ও শ্রেণীক্রম-কোনশাস্ত্রের জন্য তা কিন্তু মোটেও মর্যাদাহানিকর নয়। কেননা এটাই যুক্তি, স্বভাব ও ফিতরতের দাবী। অবশ্য ইসলামী শরীয়তের জন্য তা অনন্য মর্যাদার প্রতীক। কেননা সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ-ভিত্তির উপর তা সুপ্রতিষ্ঠিত। এমনকি সেখানেও শ্রেণী পার্থক্যের ভিত্তিতে ইসলামী আকায়েদ ও মৌল বিশ্বাসের সপক্ষে 'সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট' দলিল-প্রমাণ আবশ্যক করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইবাদত জাতীয় আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য-সনদের সাধারণ হাদীছও গৃহিত হয়েছে।

ইতিহাসশাস্ত্রের ইসলামী গুরুত্ব

ইতিহাসশাস্ত্রের ইসলামী গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, অতীতের বিভিন্ন জাতির ঘটনাবলী আল-কোরআনের প্রধান পাঁচটি আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম। তবে অত্যন্ত অভিনব ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত তার বর্ণনা ভংগী ও উপস্থাপন শৈলী। যেমন, ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণের পরিবর্তে বিভিন্ন খণ্ডাংশ বিভিন্ন কোরআনী বক্তব্যের অনুবর্তীরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তদুপরি বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে তা পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

বস্তুতঃ এই অভিনব উপস্থাপন শৈলীর মাধ্যমে আল-কোরআন আমাদেরকে ইতিহাসের আসল গুরুত্ব ও সার্থকতা কী তা বুঝিয়ে দিয়েছে। আল-কোরআন বলতে চায়, ইসলাম ও মানব জাতির কাছে নিছক কাহিনী হিসাবে বিগত জাতির ঘটনাবলীর কোনই আবেদন ও গুরুত্ব নেই। বরং চিন্তার মাধ্যমে পরিণাম ও পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও উপদেশ লাভই হলো ইতিহাসের আসল উদ্দেশ্য ও মূল স্বার্থকতা। বিগত জাতির সৎ কর্মের শুভ পরিণাম দেখে মানুষ অনুপ্রাণিত হবে এবং মন্দের মন্দ পরিণাম দেখে সতর্ক হবে। সেই সাথে যুগের আবতর্ন বিবর্তন ও উত্থান-পতন দেখে মহা প্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতে বিশ্বাসী হবে। তাহলেই সার্থক হবে ইতিহাসের উদ্দেশ্য।

নিছক চিত্তবিনোদন হিসাবে অবশ্য ঘটনা-কাহিনী বর্ণনার প্রচলন ছিলো আদিকাল থেকেই। ইসলামই সর্বপ্রথম ইতিহাস সংকলনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা শিখিয়েছে মানুষকে। সেই সাথে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, ইতিহাস চিত্ত-বিনোদনের খোরাক নয়। ইতিহাস হচ্ছে মানব জাতির শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের

পাঠশালা। অন্যথায় নিছক ইতিহাস হিসাবে ইতিহাসের কোন মূল্য নেই।

আল-ফাউযুল কাবীর গ্রন্থে হযরত শাহ ওলিউল্লাহ্‌ দেহলবী (রহ.) জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী আরিফের বক্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেছেন—

"ইলমুল ক্বিরাত ও তাজবিদে অতিমাত্রায় মনোযোগ দিতে গিয়ে মানুষ এক সময় তাতে এমনই নিমগ্ন হলো যে, উচ্চারণ জটিলতা নিয়েই গলদঘর্ম হতে লাগল। ফলে ছালাত ও তিলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য তথা খুশু-খুযু ও উপদেশ গ্রহণের বিষয়টাই পণ্ড হলো। তদ্রূপ কোন কোন তাফসীর বিশারদ কাহিনী ও ঘটনার সুবিশদ বিবরণ দানে এমনই মেতে উঠলেন যে, গল্প-কাহিনীর নীচে চাপা পড়ে গেল আসল ইলমে তাফসীর।

মোটকথা, ঘটনা ও ইতিহাস হচ্ছে আল-কোরআনের 'পঞ্চজ্ঞানের' অন্যতম একটি। সুতরাং উদ্দেশ্য ও সীমারেখার ভিতরে ইতিহাস চর্চা অবশ্যই এক বিরাট ইবাদত। কোরআন বোঝার ক্ষেত্রেও তা অপরিহার্য বটে। তাছাড়া রাসূলের হাদীছ ও সীরাত তাঁর কথা ও কর্মের ইতিহাস ছাড়া আর কিছু তো নয়।

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যখন জালহাদীছ তৈরীর কারিগর, মতলববাজ ও মিথ্যাচারীদের অনুপ্রবেশ ঘটল, তখন হাদীছে রাসূলের হিফাযতের জন্য সকল বর্ণনাকারীর ইতিহাস ও জীবনবৃত্তান্ত সংরক্ষণ করা জরুরী হয়ে পড়েছিলো। বলাবাহুল্য যে, হাদীছ-শাস্ত্রের ইমামগণ অকল্পনীয় মেহনত ও মোজাহাদার মাধ্যমে সে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন। اسماء الرجال (রিজালশাস্ত্র) নামে এখনও তা ইতিহাসের সেরা বিস্ময় হয়ে আছে।

সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন, জালহাদীছ বর্ণনাকারীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠা মাত্র দুর্লংঘ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে তাদের মুকাবেলায় আমরা ইতিহাস তুলে ধরলাম। হাদীছ বর্ণনাকারীদের জীবন, চরিত্র, ধার্মিকতা ও আস্থাযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাকে হাদীছশাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। اسماء الرجال এই স্বতন্ত্র শিরোনামে মোহাদ্দেসীনরাই এর সংকলন ও গ্রন্থনা করেছেন। সুতরাং ইসলামী শরীয়তে রিজালশাস্ত্র তথা ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা কে অস্বীকার করতে পারে। উম্মাহর কতিপয় বরেণ্য আলেম অবশ্য রাবীদের চরিত-বিশ্লেষণ ও রিজাল চর্চাকে গীবত বলে আপত্তি করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেটা সমালোচনা ও চরিত-বিশ্লেষণের শরীয়তী সীমারেখা লংঘন এবং অকারণ দোষচর্চার ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য। অবশ্য নিয়তের বিশুদ্ধতা সত্ত্বেও সমালোচনার বস্তুনিষ্ঠতা ও ন্যায় নির্ভরতা ক্ষুণ্ন হলে তাও দোষনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশুদ্ধ নিয়তে সনদের বস্তুনিষ্ঠ ও ন্যায়নির্ভর বিশ্লেষণ ও সমালোচনার ক্ষেত্রে গীবতের

আপত্তি উত্থাপনের কোন অবকাশ নেই। কেননা রিজালদের জীবন চরিতের প্রয়োজনীয় বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা-পর্যালোচনা ছাড়া তো হাদীছ সংকলনের নির্ভরযোগ্যতাই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ্‌র কোন নেক বান্দা যখন হাদীছে রাসূলের হিফাযতের নিয়তে প্রয়োজনের সীমারেখায় থেকে কোন রাবীর ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়নির্ভর সমালোচনা করেন, তখন তিনি মূলতঃ হাদীছে রাসূলের হক আদায় করে থাকেন মাত্র।

রিজালশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ইয়াহয়া বিন কাত্তানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সনদ বিশ্লেষণকালে কারো দোষ চর্চা করতে আপনার মনে ভয় জাগে না যে, কেয়ামতের দিন তারা আল্লাহ্‌র দরবারে অভিযোগ দায়ের করবে ? জবাবে তাদের ইয়াহয়া বিন কাত্তান যা বললেন, সেটাই হলো আলোচ্য প্রসঙ্গে চূড়ান্ত কথা। তিনি বললেন, সে পরোয়া আমি করি না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতে যদি আমাকে এই বলে পাকড়াও করে বসেন যে, আমার হাদীছে হস্তক্ষেপকারীদের মুখোশ তুমি উন্মোচন করে দাও নি কেন ? তখন আমি কি কৈফিয়ত দেবো ?

অবশ্য সনদের বিচার বিশ্লেষণ তথা রাবীর জীবনচরিত সমালোচনার ক্ষেত্রে গোটা কর্মকাণ্ডকে শরীয়তের সীমারেখায় সংযত রাখার জন্য মুহাদ্দেসীন প্রয়োজনীয় শর্ত ও বিধিনিষেধও আরোপ করেছেন। আল্লামা হাফেয আব্দুর রহমান সাখারী (রহ.) 'ইতিহাসের যৌক্তিকতা' বিষয়ে রচিত তার অনবদ্য গ্রন্থ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ এ এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রথম শর্ত হলো উদ্দেশ্য ও নিয়তের বিশুদ্ধতা। অর্থাৎ সমালোচিত ব্যক্তির দোষ প্রকাশ ও সুনাম ক্ষুণ্ণ করা নয় ; বরং হাদীছে রাসূলের হিফাযতই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ হাদীছ বর্ণনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্তই সমালোচনার পরিধি সীমাবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় তা গীবত ও দোষচর্চারূপে গণ্য হবে, যা দ্বীনী কাজ হতে পারে না কিছুতেই।

রিজাল শাস্ত্রের বড় ইমাম ইবনুল মাদীনীকে হাদীছ বর্ণনায় তাঁর পিতার স্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এ কথা অন্য কাওকে জিজ্ঞাসা করো। কিন্তু সকলে 'আপনার মতামতই আমরা জানতে চাই' বলে পীড়াপীড়ি শুরু করল। হযরত ইবনুল মাদীনী তখন অবনত মস্তকে কিছু সময় চিন্তার পর বললেন—

هُوَ الدِّيْنُ ، اِنَّه ضَعِيْفٌ (رساله سخاوى ص ٦٦)

দ্বীনী দায়িত্বের খাতিরে আমাকে বলতেই হচ্ছে ; তিনি দুর্বল।

দেখুন, দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের আদব কেমন প্রশংসনীয় ভারসাম্যের সাথে তারা রক্ষা করতেন। প্রথমে তিনি হাদীছ বর্ণনায় পিতার দুর্বলতার কথা নিজের মুখে বলার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু জোর অনুরোধ আসার পর দ্বীনের দাবীকেই অগ্রাধিকার দিয়ে সত্য প্রকাশ করলেন। তবে শব্দ প্রয়োগে এমন প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় দিলেন যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন না।

মোটকথা ; যেহেতু اسماء الرجال বা রিজাল-ইতিহাসের সাথে হাদীছে রাসূলের হিফাযত ও রক্ষার প্রশ্ন জড়িত এবং যেহেতু রাবীদের জীবনচরিত বিশ্লেষণের উপর হাদীছে রাসূলের প্রামাণ্যতা নির্ভরশীল, সেহেতু রিজালশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বের কারণেই ইতিহাসের শাখা হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে اسماء الرجال বা রিজালশাস্ত্র স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করেছে। এখন প্রশ্ন হলো, পরিভাষায় যাকে আমরা সাধারণ ইতিহাস বলি, যার আলোচ্য বিষয় হলো মানব জাতির আবির্ভাব, উত্থান-পতন, যুদ্ধ ও দেশজয়ের কাহিনী, সে সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কী ?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের ঘটনাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ধারা অবশ্য অতি প্রাচীন। দেশ-জাতি-অঞ্চল নির্বিশেষে পৃথিবীর সর্বত্র এ ধরণের ঘটনা ও কাহিনী মানুষের মুখে মুখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে এসেছে। ক্ষেত্রবিশেষে গ্রন্থাকারেও সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামপূর্ব যুগে সাধারণভাবে ইতিহাস সনদ ও সূত্রবিহীন অপরিমার্জিত ও অপ্রামাণ্য গল্প-কাহিনীর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

পৃথিবীর বুকে ইসলামই সর্বপ্রথম কোন বর্ণনার ক্ষেত্রে 'সনদ ও সূত্র' প্রথা প্রবর্তন করেছে এবং পরিমার্জন, তথ্য-বিশ্লেষণ ও প্রামাণ্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। স্বয়ং আল-কোরআন এ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেছে—

اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا

অর্থাৎ অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তির পরিবেশিত সংবাদের তথ্যনির্ভরতা অবশ্যই যাচাই করে নিবে।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, কর্ম ও শিক্ষাবলীর সংরক্ষণ ও গ্রন্থনায় নিয়োজিত আলিমরা সনদ ও সূত্র সন্নিবেশের এই বিশেষ পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে একাধিক শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন। যার বদৌলতে

হাদীছে রাসূল ও সুন্নাহর সুসংরক্ষণের পাশাপাশি সাধারণ ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রেও সনদ ও সূত্রের উল্লেখ একটি প্রয়োজনীয় মূলনীতি রূপে প্রবর্তিত হলো। মুসলিম উলামাদের সংকলিত সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থগুলোতেও যথাসাধ্য যত্নের সাথে উপরোক্ত মূলনীতি অনুসৃত হয়েছে। সুতরাং যদি বলা হয় যে, মুসলমানদের হাতেই ইতিহাস একটি প্রামাণ্য-শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করেছে এবং তারাই মানব জাতিকে পরিমার্জিতরূপে ইতিহস গ্রন্থনার পথ নির্দেশ করেছে, তাহলে তা মোটেই অত্যুক্তি হবে না। রিজাল-ইতিহাসকে হাদীছের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে যে সকল উলামায়ে উম্মত কাসাসুল আম্বিয়া ও হাদীছ বিষয়ক বর্ণনাগুলোর সত্য মিথ্যা যাচাই করে এবং সত্য প্রমাণিত বর্ণনাগুলোর স্তর তারতম্য নির্দেশ করে দ্বীনের বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন ; পরবর্তীতে তারাই আবার পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাস ও ভূগোলশাস্ত্র গ্রন্থনায় মনোনিবেশ করে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন। আল্লামা হাফেয আব্দুর রহমান সাখাবী الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন। এখানে তা উদ্ধৃত করার অবকাশ নেই। তবে গ্রন্থটি অবশ্যই পড়ে দেখার মত অনবদ্য একটি সংকলন।

আমার এ আলোচনার উদ্দেশ্য শুধু এটা প্রমাণ করা যে, উম্মতের স্মরণীয় বরণীয় আলিমগণ হাদীছ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রিজালশাস্ত্রীয় ইতিহাসের গোড়াপত্তন করেই ক্ষান্ত হন নি ; বরং মানব জাতির উত্থান-পতন, সভ্যতার ক্রমবিকাশ, দেশ-শাসক ও জ্ঞানসেবক স্মরণীয় ব্যক্তিদের বিচিত্র জীবনকাহিনী এবং বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশ-মহাদেশের বিবরণ সম্বলিত সাধারণ ইতিহাস ও ভূগোল চর্চার প্রতিও সমান মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগার তাদের সেই অবিস্মরণীয় অবদানের সাক্ষী বহন করছে আজো। উলামায়ে উম্মতের এ ব্যাপক কর্মযজ্ঞ সন্দেহাতীতরূপেই প্রমাণ করে যে, মানব জাতির দ্বীন ও দুনিয়ার বহুমুখী কল্যাণের উৎস হিসাবে ইসলাম ধর্মে এই সাধারণ ইতিহাসেরও স্বতন্ত্র স্থান ও মর্যাদা রয়েছে। হাফেয সাখাবী (রহ.) তাঁর গ্রন্থের প্রথম চল্লিশ পৃষ্ঠায় ইতিহাসের বিভিন্ন কল্যাণ ও উপকারিতা এবং এ সম্পর্কে উলামায়ে উম্মতের বিভিন্ন মন্তব্য ও বক্তব্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

ইসলামে ইতিহাসের স্থান

উলামায়ে উম্মত ইতিহাসশাস্ত্রের যে ক'টি কল্যাণ ও উপকারিতা তুলে ধরেছেন তন্মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ। বিভিন্ন জাতির

উত্থান-পতন, বিভিন্ন সভ্যতার বিকাশ-বিনাশ এবং বিভিন্ন যুগের দুর্যোগ মহাদুর্যোগের যে মর্মস্পর্শী বিবরণ ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে ধরেছে তার শিক্ষা এই যে, পৃথিবী ও তার যাবতীয় জৌলুস খুবই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং সকল চিন্তার উপর যেন থাকে আখেরতের চিন্তা। সকল কর্মের মাঝে যেন থাকে কুদরতের বিশ্বাস এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত আনুগত্যে দেহমন যেন থাকে সর্বদা সমর্পিত। নবী রাসূল ও তাদের অনুসারীদের নূরানী কাহিনী মানুষকে যেমন ঈমান ও সত্যের পথে অনুপ্রাণিত করে তেমনি জালিম কাফিরদের মহা ধ্বংসের কাহিনী ফিরিয়ে রাখে পাপ ও অধর্মের হাতছানী থেকে। তাছাড়া ইতিহাসই আমাদেরকে জোগায় বিগত জাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পাথেয়। কিন্তু ইতিহাস-শাস্ত্রের এই ব্যাপক কল্যাণকরতা ও অবদান স্বীকার করা সত্ত্বেও শরীয়তের আহকাম ও আকায়েদ এবং হালাল-হারাম ও বৈধাবৈধ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক বর্ণনাকে উম্মতের কোন আলিম প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন নি। বরং ইসলামী শরীয়তের প্রথম দিন থেকেই কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস এই প্রমাণ-চতুষ্টয়ই ছিলো আহকাম ও আকায়েদের একমাত্র উৎস। এ ক্ষেত্রে ইতিহাসের কোন তথ্য-বর্ণনাকে বিচারকের ভূমিকায় রেখে কোরআন, সুন্নাহ বা ইজমা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত কোন দ্বীনী বিষয়কে বিতর্কিত করে তোলা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইসলামী ইতিহাস যদিও ইসলামপূর্ব ইতিহাসের ন্যায় সনদ-সূত্রহীন অপ্রমাণ্য কাহিনীর সমষ্টি মাত্র নয় ; বরং 'ইসলামী বর্ণনা রীতি' অনুসরণের মাধ্যমে ইতিহাসশাস্ত্রকে উলামায়ে উম্মত যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য করার প্রয়াস পেয়েছেন। তথাপি ইতিহাস গবেষককে কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। অন্যথায় ইতিহাসশাস্ত্রের অপব্যবহারের ফলে বহু মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হাদীছ ও ইতিহাসশাস্ত্রের ব্যাপক গুণগত পার্থক্য

প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ তথা বাণী ও কর্ম যেসকল ছাহাবী শুনেছেন ও দেখেছেন, তাদের কাছে তা ছিলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অর্পিত এক পবিত্রতম আমানত ; যা উম্মতের কাছে হুবহু পৌঁছে দেয়া ছিলো তাদের সুমহান দায়িত্ব। কেননা, ছাহাবা কেরামের প্রতি নববী নির্দেশ ছিলো—

بَلِّغُوا عَنِّيْ وَ لَوْ ايَةً

একটি মাত্র আয়াত হলেও আমার বাণী ও বক্তব্য উম্মতের কাছে পৌঁছে দিও।

آية এর সাধারণ অর্থ কোরআনী আয়াত হলেও বাক-ধারা এখানে স্পষ্টতঃই হাদীছ প্রচারের অর্থ নির্দেশ করছে। সুতরাং ولو آية এর অর্থ হলো, সংক্ষিপ্ত কোন বাণী হলেও তা পৌঁছে দিও। বিদায় হজ্জের পবিত্র ভাষণে আল্লাহ্র রাসূল আরো পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন—

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

আগতরা অনাগতদের কাছে আমার কথা পৌঁছে দিও। এই নববী নির্দেশ লাভের পর কোন ছাহাবীর পক্ষে কি সম্ভব ছিলো তাঁর প্রিয়তম রাসূলের হাদীছ তথা বাণী ও কর্মের সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য করা ?

তাছাড়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছাহাবা কেরামের সুনিবিড় ও প্রেমময় সম্পর্কের অবস্থা তো এই ছিলো যে, প্রিয় নবীর অযুর পানি পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে দু' হাতে তাঁরা নিয়ে নিতেন। চোখে-মুখে পরম ভক্তির সাথে মাখতেন। এমনকি তাঁর একটি চুল পর্যন্ত প্রাণপ্রিয় সম্পদরূপে রক্ষিত হতো তাঁদের কাছে। আর অমুসলিমরা পর্যন্ত বিস্ময়-বিহ্বলতার সাথে স্বীকার করে থাকে, ছাহাবা কেরামের অশ্রুতপূর্ব এই নবীপ্রেমের কথা। আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে হযরত খোবায়েবের শূলীতে ঝুলন্ত ও তীর-ঝাঁঝরা দেহকে সামনে রেখে কোরাইশ সেনাপতি আবু সুফিয়ান (পরবর্তীতে রাযি.) যে কথা বলেছিলেন, যুগে যুগে দেশে দেশে অমুসলিমদের বিস্ময়াবিভূত কণ্ঠে সে কথাটাই উচ্চারিত হয়ে আসছে বরাবর। তিনি বলেছিলেন—

وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُحِبُّ كَمَا يُحِبُّ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا

আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদের সাথীরা মুহাম্মদকে যেমন ভালোবাসে তেমনভাবে কাউকে ভালোবাসতে আমি দেখি নি।

শূলীতে ঝুলন্ত হযরত খোবায়ব (রাযি.)-র কাছে ওরা জানতে চেয়েছিলো—

أَتُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا مَكَانَكَ وَ أَنْتَ سَلِيْمٌ مُعَافًى فِى أَهْلِكَ

তুমি কি চাইবে যে, মুহাম্মদ তোমার এখানে আসুন আর তুমি নিরাপদে বাড়ী ফিরে যাও।

নির্মম মৃত্যুর মুখ থেকে এই একবার মাত্র গর্জে উঠেছিলেন আশেকে রাসূল হযরত খোবায়ব (রাযি.)—

وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي فِي أَهْلِيْ وَ وَلَدِيْ ، مَعِيْ عَافِيَةُ الدُّنْيَا وَ نَعِيْمُهَا وَ يُصَابُ رَسُوْلُ اللهِ بِشَوْكَةٍ -

আল্লাহ্র কসম! পুত্র-পরিজনের মাঝে দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-সম্পদ আমি ভোগ করবো, আর আল্লাহ্র রাসূলের পায়ে সামান্য একটি কাঁটা ফুটবে তাও আমার বরদাস্ত নয়। এমন প্রেমপাগল ছাহাবারা তাঁদের প্রিয় নবীর বাণী ও শিক্ষার প্রচার ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সামান্যতম অবহেলা করবেন তা কি কল্পনা করাও সম্ভব ?

মোকটথা, হাদীছে রাসূলকে প্রাণপ্রিয় সম্পদরূপে সংরক্ষণ ও প্রচারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ছাহাবা কেরামের অভাবনীয় নবী প্রেমই ছিলো যথেষ্ট। সেই সাথে এখন জারি হলো সুস্পষ্ট নববী-নির্দেশ। সুতরাং পরবর্তী অবস্থা কল্পনা করুন, লক্ষ ছাহাবার ফিরেশতাতুল্য জামা'আত একজন মাত্র 'মানবের' বাণী ও কর্ম সংরক্ষণ ও প্রচারকল্পে কেমন নযীরবিহীন ত্যাগ, সাধনা ও কোরবানী পেশ করেছিলেন!

বলাইবাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কোন মানব সন্তানের জন্য—যত বিশাল প্রতিভা ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারীই তিনি হোন—এমন ব্যবস্থা কল্পনা করাই সম্ভব নয় যে, নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীরা তাঁর প্রতিটি 'আচরণ ও উচ্চারণ' সুগভীর প্রেম ও ভক্তির সাথে গ্রহণ, সংরক্ষণ ও আগামী প্রজন্মের হাতে অর্পণের মহা সাধনায় জানমাল কোরবান করে দেবে। জাতিবর্গের উত্থান পতন, মহামানবদের জীবনচরিত এবং কালের দুর্যোগ মহা-দুর্যোগের ঘটনাবলীতে মানুষের চিত্তাকর্ষণের খোরাক আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কার এত 'গরয' হবে যে, তার সংরক্ষণ ও প্রচার কর্মে জীবন, যৌবন উৎসর্গ করে, সকল স্বপ্নসাধ বিসর্জন দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রেম ও পুণ্যের অনন্ত আকর্ষণ ছাড়া এ অসম্ভব, অকল্পনীয়।

মোটকথা, যেহেতু আল্লাহ্র এটাই মঞ্জুর ছিলো যে, আহকাম ও আকায়েদের ক্ষেত্রে হাদীছে রাসূল হবে শরীয়তের দলীল ও প্রমাণ এবং হাদীছে রাসূলই হবে কোরআনের বাস্তব রূপ, সেহেতু তা সংরক্ষণের প্রথম উপায় হিসাবে ছাহাবা কেরামের অন্তরে তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন নবী-প্রেম ও নবী-আনুগত্যের অকল্পনীয় আবেগ ও জযবা ; যা বলাইবাহুল্য যে, পৃথিবীর অপর কোন ব্যক্তিত্বের প্রতি হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ইতিহাস ও ঐতিহাসিক বর্ণনা কোনক্রমেই হাদীছ বর্ণনার সমতুল্য মর্যাদা ও অবস্থান দাবী করতে পারে না।

পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানব সমাজের সকল স্তরে 'দাওয়াত ও

রিসালাত' পৌঁছে দেয়ার আসমানী নির্দেশ ছিলো আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি। আর এই নির্দেশ পালন সহজ-সম্ভব করে তোলারই একটি কুদরতী ব্যবস্থা ছিলো নবীপ্রেমে মাতোয়ারা ছাহাবা কেরামের মুকাদ্দাস জামা'আত। সেই সাথে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নববী প্রজ্ঞার আলোকে একটি আইনগত ব্যবস্থাও গড়ে তোলেছিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল। অর্থাৎ একদিকে ছাহাবা কেরামের প্রতি বাধ্যতামূলক আদেশ জারী হলো আগামী উম্মতের কাছে প্রতিটি হাদীছে রাসূল অক্ষুণ্ণ অবস্থায় পৌঁছে দেয়ার। অন্য দিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাণী ও বক্তব্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ভেজাল ও মিথ্যার অনুপ্রবেশের যে আশংকা দেখা দেয়, তা রোধ করার জন্য উচ্চারিত হলো কঠিনতম হুঁশিয়ারবাণী।

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَده مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ জেনেশুনে আমার নামে মিথ্যা প্রচার করবে যে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

এ কঠোর হুঁশিয়ারবাণী ছাহাবা কেরাম ও পরবর্তী যুগের হাদীছসেবীদের এমন সতর্ক, সংযমী করে দিলো যে, সূক্ষ্মতম বিচার বিশ্লেষণের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হাদীছ বর্ণনার সময়ও তারা ভয়ে কম্পমান হতেন। পরবর্তী যুগে অধ্যায় ও শিরোনাম ভিত্তিক হাদীছ সংকলনকালে মুহাদ্দিসগণ 'লিপি ও স্মৃতি'তে সংরক্ষিত লক্ষ লক্ষ হাদীছ থেকে মাত্র কয়েক হাজার হাদীছ নিজ নিজ সংকলনে স্থান দিয়েছিলেন। এমনই সুকঠিন ছিলো তাদের বিচার বিশ্লেষণের মানদণ্ড। 'তাদরীবুর রাবী' গ্রন্থে আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) লিখেছেন—

"ইমাম বুখারীর যবানবন্দী মতে, তাঁর স্মৃতিস্থ দুই লক্ষ অশুদ্ধ ও এক লক্ষ বিশুদ্ধ হাদীছ থেকে পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে মাত্র চার হাজার হাদীছ ছহীহুল বুখারীতে স্থান পেয়েছে।"

ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন—

"আমি আমার সংগৃহিত তিন লাখ হাদীছ বাছাই পূর্বক 'ছহীহ' সংকলনটি তৈরী করেছি যার অপুনরাবৃত্ত হাদীছের সংখ্যা চার হাজার।"

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন—

"আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত পাঁচ লাখ হাদীছ সংগ্রহ করে যাচাই বাছাইয়ের পর মাত্র চার হাজার হাদীছের 'সুনন' সংকলনটি তৈরী করেছি।

পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ (রহ.) তার সুবিখ্যাত মুসনাদ সংকলনটি তৈরী করেছেন সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার হাদীছ থেকে বাছাই করে।

এভাবে কুদরতী ব্যবস্থা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ নববী ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় অনন্য সাধারণ সতর্কতায় প্রস্তুত 'হাদীছ সংকলন' আল-কোরআনের পর শরীয়তের দ্বিতীয় হুজ্জত ও 'প্রমাণ-উৎস' এর মর্যাদায় অভিষিক্ত হলো।

পক্ষান্তরে পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে মর্যাদার এ অতুচ্চ আসন কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কেননা, প্রথমতঃ সাধারণ ঘটনাবলী সংরক্ষণ ও প্রচারের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করার মত কোন 'মহা উদ্দীপক' শক্তি বিদ্যমান নেই।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছ সংকলনের সুকঠিন মানদণ্ড ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রেও যদি গ্রহণ করা হতো, তাহলে হাদীছ সংকলনের তিন লাখে চার হাজারের 'অনুপাত' ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রে নির্ঘাত তিন লাখে চারশ'তে নেমে আসতো। এভাবে ইতিহাসের শতকরা নিরানব্বই ভাগ বর্ণনাই ধুয়েমুছে বিলীন হয়ে যেতো এবং ইতিহাসের পূর্ব বর্ণিত কল্যাণ ও উপকারিতা থেকে মানব জাতি বঞ্চিত হয়ে যেতো।

এজন্যই দেখি ; হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যেসকল রাবী দুর্বল বা মিথ্যাবাদী বলে হাদীছশাস্ত্রের ইমামদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে তারাই আবার তাদের কাছে সাদরে গৃহিত হয়েছেন। হাদীছের ইমামগণ ওয়াকিদী, সাইফ বিন আমর প্রমুখের নাম শুনতে পর্যন্ত রাজি নন। অথচ মাগাযী ও সীরাত বিষয়ক ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা নিঃসংকোচে তাদের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

ইতিহাসের মানদণ্ডে ছাহাবা কেরামের স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ এবং তাদের চরিত্রে কলংক লেপনের ভ্রান্ত নীতি অনুসরণকারী গবেষকরাও হাদীছ ও ইতিহাসশাস্ত্রের এই গুণগত পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন বোধ করি না।

খোলাসাকথা এই যে, ইতিহাস যেহেতু আহকাম ও আকায়েদ জাতীয় শরীয়াতী বিষয় আলোচনার ক্ষেত্র নয়, সেহেতু নির্বিচারে রুগ্ন-দুর্বল ও সুস্থ-সবল সকল বর্ণনা গ্রহণ সেখানে দোষণীয় নয়। একথা সত্য যে, রিজালশাস্ত্রের বরেণ্য ইমামগণ ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রে ইসলামপূর্বযুগের ভিত্তিহীন গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে 'ইসলামী বর্ণনারীতি'র আলোকে 'সনদ ও সূত্র' অনুসরণ করে থাকেন। যার ফলে বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার বিচারে বিশ্ব ইতিহাসের মাঝে ইসলামী ইতিহাস এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তবে এটাও বাস্তব সত্য যে, ইতিহাসের সনদের ক্ষেত্রে তারা হাদীছশাস্ত্রের ন্যায় কঠিন বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেন নি। কেননা আগেই বলে এসেছি যে, এ ধরনের কঠোর বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ইতিহাসের সিংহভাগই মুছে যেতো দুনিয়ার বুক থেকে। এবং ইতিহাস

থেকে শিক্ষা, উপদেশ ও অভিজ্ঞতা আহরণের মূল উদ্দেশ্য থেকেই মানব সভ্যতা বঞ্চিত হতো। তাছাড়া ইসলামী আহকাম ও আকায়েদের কোন সম্পর্ক নেই বিধায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনও ছিলো না এ ক্ষেত্রে। ইতিহাস সংকলনে এসে হাদীছ ও রিজালশাস্ত্রের বরেণ্য ইমামদের ব্যতিকমধর্মী উদারনীতি গ্রহণের এটাই হলো মূল রহস্য। বিষয়টি তারা নিজেরাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরেছেন। উসূলে হাদীছশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ইবনে ছালাহ তার علوم الحديث নামক অমর গ্রন্থে লিখেছেন—

وَ غَالَبَ عَلي الاَخْبَارِيِّيْنَ الكثَارُ وَ التَّخْلِيْطُ فِيْمَا يَرْوُوْنَه

(علوم الحديث ص ٢٦٣)

শুদ্ধাশুদ্ধ সকল প্রকার বর্ণনার মিশ্র সমাবেশ ঘটিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করাই হলো ইতিহাস সংলকদের প্রধান রীতি।

তাদরীবুর রাবী গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতীও একই মন্তব্য করেছেন। ফাতহুল মুগীছ গ্রন্থের বক্তব্যও অভিন্ন।

এখানে আল্লামা ইবনে কাছীরের উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। হাদীছ ও তাফসীরশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ এই ইমাম, রিজাল সমালোচক হিসাবেও সমান খ্যাতির অধিকারী। সনদের বিচার-পর্যালোচনা ও বাছাই-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এত নামডাক সত্ত্বেও জগদ্বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ আল-বেদায়ার সংকলনে তিনি কিন্তু তা ধরে রাখেন নি। আল-বেদায়ার কোন কোন ক্ষেত্রে তার নিজেরই মন্তব্য হলো, এ বর্ণনার বিশুদ্ধতায় আমি সন্দিহান, তবে আমার পূর্বসুরী ইবনে জারীর ও অন্যান্যরা তা গ্রহণ করে আসছেন বলে আমিও গ্রহণ করলাম। তারা যদি এড়িয়ে যেতেন তাহলে আমিও এড়িয়ে যেতাম।

বলাই বাহুল্য যে, হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে কিন্তু 'অমুক পূর্ববর্তী বুজুর্গ গ্রহণ করেছেন বলে সন্দিহান অবস্থায়ও আমাকে গ্রহণ করতে হলো' এ ধরনের উদার নীতি অনুসরণ করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। ইতিহাসের নিজস্ব প্রকৃতি ও স্বভাব-ধারার কারণেই ইবনে কাছীর এমন উদার নীতি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

বহু ক্ষেত্রে আবার আল-বেদায়ার ইবনে কাছীর বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক তাবারীর বর্ণনা নাকচও করে দিয়েছেন। সুতরাং সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, শীর্ষস্থানীয় রিজাল ও সনদ সমালোচকরাও ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা-পর্যালোচনার ভার আগামী বিদগ্ধ গবেষকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে

বিষয় সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বর্ণনার সমগ্র সমাবেশ ঘটানোই সমীচীন মনে করেছেন। এটা কিন্তু 'একজন ইবনে কাছীরের' অজানিত ভুল নয় ; বরং সকলশাস্ত্রীয় ইমামের সচেতন ও সজ্ঞান আচরণ। দোষ বা গুণ যাই বলুন, নির্বিচারে সবল-দুর্বল সকল বর্ণনার অবাধ সংকলন ইতিহাসের অবকাঠামো রক্ষার জন্যই জরুরী ছিলো। ইতিহাসের এটা বিকৃতি নয়, প্রকৃতি।

কেননা তাদের ভাল করেই জানা ছিলো যে, সাধারণ ইতিহাস শরীয়তের আহকাম ও আকায়েদ প্রমাণের জন্য নয়। বরং শিক্ষা, উপদেশ ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। আর সেটা সনদের বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা-পর্যালোচনা ছাড়াই হতে পারে। তবে কেউ যদি আহকাম ও আকায়েদ সম্পর্কিত কোন বিষয়ের অনুকূলে বা প্রতিকূলে ইতিহাসের বর্ণনাকে প্রমাণরূপে ব্যবহার করতে চান, তাহলে নিজ দায়িত্বেই সেখানেও তাকে হাদীছশাস্ত্রের অনুসৃত 'বিচার পদ্ধতি' প্রয়োগ করতে হবে। 'অমুক ইমামুল হাদীছ তার ইতিহাস সংকলনে বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন' শুধু এই যুক্তিতে নিজস্ব বিচার-পর্যালোচনার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই।

উহাদরণ স্বরূপ, ইমাম শাফেয়ীসহ ফেকাহশাস্ত্রের বহু ইমাম চিকিৎসা শাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এমনকি চিকিৎসা বিষয়ক মূল্যবান রচনাকর্মও রয়েছে তাদের কারো কারো। এখন কোন ভদ্রলোক যদি দাবী করে বসেন যে, অমুক ইমামের মতে শরাব বা শুকর-মাংস হালাল। কেননা অমুক চিকিৎসাগ্রন্থে তিনি শরাব ও শুকর-মাংসের বিভিন্ন গুণ ও উপকারিতার কথা আলোচনা করেছেন। অথচ তার 'হুরমত' সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলেন নি। তাহলে ভদ্রলোকের এই অভিনব প্রমাণ-পদ্ধতি সম্পর্কে কি মন্তব্য করা চলে ?

নিছক কাল্পনিক নয় আমাদের এ উদাহরণ। মুসলিম উম্মাহ্র সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম শেখ জালালুদ্দীন সুয়ূতির জ্ঞান-অবদান ইসলামী শরীয়তের সকল শাখাতেই পরিব্যাপ্ত। তদ্রূপ তার তাকওয়া ও ধার্মিকতাও সর্বজন স্বীকৃত। অথচ সুয়ূতির চিকিৎসা গ্রন্থ كتاب الرحمة في الطب والحكمة খুলে দেখুন, বিভিন্ন রোগে তার প্রদত্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাপত্রে বেশ কিছু হারাম বস্তুও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখন এই কিতাবের হাওয়ালায় কেউ যদি দাবী করেন যে, ইমাম সুয়ূতী উক্ত হারাম বস্তুগুলো হালাল মনে করেন ; তাহলে কোন সুস্থ বিবেক কি তা মেনে নিবে ? ফিকাহশাস্ত্রের অন্যান্য ইমামদের চিকিৎসা গ্রন্থেও বিভিন্ন হারাম বস্তুর অষুধিগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি এবং রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রক্ত, পেশাব, পায়খানা ইত্যাদির ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিধায় হারাম-হালাল বা পাক-নাপাক ইত্যাদি ফেকাহশাস্ত্রীয় আলোচনার অবতারণা সেখানে করা হয়

নি। এখন কেউ যদি চিকিৎসা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে হারামকে হালাল প্রমাণ করতে চায় তাহলে এটা তারই মগজের দোষ। চিকিৎসা গ্রন্থে হারাম-হালাল বা পাক-নাপাকের কথা না বলে শুধু গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি আলোচনা করেছেন বলে ইমামদের দোষ দেয়া চলে না। কেননা গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতিই হলো চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। পক্ষান্তরে হারাম-হালাল ও পাক-নাপাকের আলোচনাক্ষেত্র হলো ফেকাহ্শাস্ত্র এবং ইমামগণ যথারীতি সেখানে সে আলোচনা করেছেন। দোষ সেই মগজওয়ালার যিনি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে ফেকাহ্গ্রন্থের পরিবর্তে চিকিৎসাগ্রন্থে হালাল-হারামের 'মাসআলা' খুঁজতে লেগেছেন।

এই দীর্ঘ ভূমিকার পর মূল প্রসঙ্গে ফিরে এসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি বলতে চাই ; ছাহাবাদের পারস্পরিক বিরোধ প্রসঙ্গকে যারা ইতিহাসের আলোকে বিচার করেছেন এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকেই সিদ্ধান্ত আহরণ করেছেন, মূলতঃ গোড়াতেই তারা গলদ করে বসে আছেন। তথ্য-প্রমাণগুলো হাদীছ, তাফসীর ও রিজালশাস্ত্রের সর্বজনমান্য ইমামদের ইতিহাস সংকলন থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে, এই আত্মতৃপ্তির কারণে তাদের ভেবে দেখার সুযোগ হয় নি যে, শরীয়তের আহকাম ও আকায়েদের আলোচনা নয় ; বরং শুধু ইতিহাস সংকলনই ছিলো ইমামদের উদ্দেশ্য। তাই ইতিহাস সংকলনের প্রচলিত রীতি অনুসারে সনদের বিচার বিশ্লেষণে না গিয়ে সবল-দুর্বল সকল বর্ণনার তারা একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু এগুলো দ্বারা আহকাম ও আকায়েদ বিষয়ক কোন মাসআলা প্রমাণ করতে হলে সনদ বিশ্লেষণের রিজালশাস্ত্রীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে।

যেহেতু বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এখানে এসে হোঁচট খেয়েছেন, সেহেতু আবারো বলছি, সকল যুগের উলামায়ে উম্মত অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, শরীয়তের আহকাম ও আকায়েদের ক্ষেত্রে ইতিহাসের কোন বর্ণনাকে হাদীছশাস্ত্রের স্বীকৃত মানদণ্ডে যাচাই না করে সনদ ও প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে না। কেননা ইতিহাস হচ্ছে রুগ্ন-দুর্বল, সুস্থ-সবল ও নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য হর কিসিমের তথ্য-উপাদানের ভাণ্ডার।

সুতরাং এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, 'ছাহাবা-বিরোধ' প্রসঙ্গে গবেষকদের মাঝে এত যে তোলপাড়, সেটা কি সাধারণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু না আহকাম ও আকায়েদের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ছাহাবা ও ছাহাবা-বিরোধ প্রসঙ্গ

ইসলামী উম্মাহর সর্বসম্মত ফয়সালা এই যে, ছাহাবা কেরামের পরিচয় মর্যাদা ও অবস্থান নির্ধারণ এবং ছাহাবা-বিরোধের দুঃখজনক ঘটনার প্রকৃতি নিরূপণ সাধারণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়। الإصابة এর ভূমিকায় হাফেয ইবনে হাজার এবং الإستيعاب এর ভূমিকায় হাফেয ইবনে আব্দুল বার পরিস্কার ভাষায় বলেছেন যে, ছাহাবা কেরামের পরিচয় প্রসঙ্গ ইলমুল হাদীছের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। তদ্রূপ ছাহাবা কেরামের স্থান, অবস্থান ও মর্যাদাগত স্তর-তারতম্য এবং ছাহাবা-বিরোধ প্রসঙ্গকে উলামায়ে উম্মত সর্বসম্মতভাবে আকীদার অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। তাই ইসলামী আকীদার সকল প্রামাণ্য গ্রন্থে স্বতন্ত্র অধ্যায়রূপে তা সংযোজিত হয়ে এসেছে।

বস্তুত ছাহাবা ও ছাহাবা-বিরোধ প্রসঙ্গ এমন এক আকীদা ভিত্তিক মাসআলা, যাকে কেন্দ্র করে বহু ইসলামী ফেরকার উদ্ভব ঘটেছে। সুতরাং বলাইবাহুল্য যে, এ প্রশ্নে মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার অকাট্য প্রমাণ অপরিহার্য। হাদীছ ও রিজালশাস্ত্রীয় মানদণ্ডে যাচাই না করে ইতিহাসাশ্রয়ী কোন বর্ণনা এ প্রশ্নে প্রমাণরূপে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

মোটকথা, আকায়েদের ক্ষেত্রে ইতিহাস-নির্ভরতা চরম আত্মঘাতী ভুল। ইতিহাস যত নির্ভরযোগ্য হাদীছশাস্ত্র বিশারদই লিখুন তাতে তার ইতিহাসধর্মিতা মোটেই বিলুপ্ত হয় না।

এ কারণেই 'ছাহাবা পরিচয়' বিষয়ে ইবনে আব্দুল বার রচিত الإستيعاب في معرفة الأصحاب গ্রন্থটি প্রামাণ্যতা ও তথ্যসমৃদ্ধির কারণে বিপুলভাবে সমাদৃত হলেও ছাহাবা বিরোধ প্রসঙ্গে ইতিহাস-নির্ভরতার কারণেই শুধু সমালোচিত হয়েছে।

হিজরী ছয় শতকের ইমামুল হাদীছ ইবনে ছালাহ বিরচিত علوم الحديث - কে মনে করা হয় উছুলেহাদীছ শাস্ত্রের প্রাণগ্রন্থ। পরবর্তী সকল মুহাদ্দিস মূলতঃ এখান থেকেই তাঁদের রচনা ও গবেষণার মালমশলা গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থটির উনচল্লিশতম অধ্যায়ে الإستيعاب প্রসঙ্গে ইবনে ছালাহ লিখেছেন—

هذَا عِلْمٌ كَبِيْرٌ قَدْ اَلَّفَ النَّاسُ فِيْه كتَبًا كَثِيْرَةً وَ من اَجلهَا وَ اَكثَرِهَا فَوَائِدَ.

كتَابَ الإِسْتِيْعَاب لابْنِ عَبْد الْبَرِّ لَولاَ مَا شَانه به من ايْرَاده كَثِيْرًا ممَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَة وَحكَايَاته عَنْ الأَخْبَارِيِّيْنَ لاَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَ غَالَبَ عَلي الأَخْبَارِيِّيْنَ الاَكْثَارُ وَ التَّخْلِيْطُ فِيْمَا يَرْوُوْنَه(علوم الحديث ص ٢٦٢)

'ছাহাবা পরিচয়' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইলম। এ বিষয়ে অনেকে অনেক লিখেছেন। তবে উপকার ও কার্যকারিতার বিচারে ইবনে আব্দুল বার রচিত 'আল-ইসতি'আব'ই শ্রেষ্ঠ ; যদি না ছাহাবা বিরোধ প্রসঙ্গে কতিপয় অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা গ্রন্থটি কলংকিত হতো। বস্তুত ইবনে আব্দুল বার হাদীছ বিশারদদের কঠোর সমালোচনা রীতির পরিবর্তে ইতিহাস সংকলকদের উদার নীতি অনুসরণ করেছেন, যাদের মূল লক্ষ্যই হলো নির্বিচারে অধিক সংখ্যক বর্ণনার সমাবেশ ঘটানো।

তাদরীবুররাবী গ্রন্থে 'ছাহাবা পরিচয়' শীর্ষক আলোচনায় আল্লামা সুয়ূতীও অভিন্ন কারণে প্রায় অভিন্ন ভাষায় الإستيعاب এর সমালোচনা করেছেন এবং ছাহাবা বিরোধ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বর্ণনা টেনে আনায় আল্লামা ইবনে আব্দুল বারকে কঠোর নিন্দা জানিয়েছেন।

فتح المغيث সহ বিভিন্ন গ্রন্থে অন্যান্য মুহাদ্দিসীনের একই জিজ্ঞাসা, ছাহাবা বিরোধের ন্যায় আকীদা বিষয়ক মাসআলায় ঐতিহাসিক বর্ণনার অনুপ্রবেশ তিনি ঘটালেন কোন্ খেয়ালে ?

ইবনে আব্দুল বারের এমন ব্যাপক সমালোচনার কারণ শুধু এই যে, الإستيعاب সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ নয়। হাদীছশাস্ত্রের 'ছাহাবা বিষয়ক গ্রন্থ' ; যেখানে রিজালশাস্ত্রীয় বিচার-বিশ্লেষণে উত্তীর্ণ বর্ণনারই শুধু প্রবেশাধিকার আছে। পক্ষান্তরে الإستيعاب যদি সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ হতো, তাহলে সেখানে অনির্ভরযোগ্য বর্ণনার জোয়ার বয়ে গেলেও কারো বিশেষ আপত্তি হতো না। যেমনটি হয় নি ইবনে জরীর, ইবনে কাছীর প্রমুখ ইমামুল হাদীছদের রচিত নির্ভেজাল ইতিহাস গ্রন্থগুলোর বেলায়। অথচ الإستيعاب এর বর্ণনাগুলো সেখানেও স্থান পেয়েছে।

ছাহাবা কেরামের কতিপয় বৈশিষ্ট

এটা সুপ্রমাণিত সত্য যে, যে মুকাদ্দাস জামা'আতকে আমরা ছাহাবা কেরামরূপে চিনি তারা উম্মতের সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নন। বরং উম্মত ও রাসূলের মাঝে পবিত্র যোগসূত্র হিসাবে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান ও মর্যাদার অধিকারী। কোরআন ও সুন্নাহর দ্বারা সুনির্ধারিত তাদের এ মর্যাদা এবং এ বিষয়ে রয়েছে গোটা উম্মাহর ইজমা ও সার্বজনীন ঐক্যমত। সুতরাং ইতিহাসের শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণনার স্তুপের নীচে একে চাপা দেয়ার কোন অবকাশ নেই। এমনকি ছাহাবা কেরামের শান ও মর্যাদার প্রতিকুল হলে কোরআন সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের মুকাবেলায় সাধারণ হাদীছও অবশ্য বর্জনীয়। সুতরাং ঐতিহাসিক বর্ণনার বর্জনযোগ্যতা তো বলাই বাহুল্য।

আল-কোরআনের দৃষ্টিতে ছাহাবা কেরাম

এবার আমরা আল-কোরআন ছাহাবাদের কোন্ স্থান ও মর্যাদা দিয়েছে, বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে তা তুলে ধরতে চাই।

নীচের আয়াত দু'টি লক্ষ্য করুন—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

মানব সমাজের কল্যাণ ও সংশোধনের জন্য শ্রেষ্ঠ উম্মতরূপে তোমাদের সৃষ্টি।

وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

(সর্ব দিকে) অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ জাতিরূপে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি, যাতে মানব জাতির বিপক্ষে তোমরা সাক্ষী হতে পার।

হাদীছ ও তাফসীরশাস্ত্রের ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে ছাহাবা কেরামই হলেন আয়াত দু'টির প্রথম ও প্রত্যক্ষ সম্বোধিত। অবশ্য পরবর্তীরা নিজ নিজ আমল হিসাবে এ অভিধার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কিন্তু ছাহাবা কেরামের অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত ও সর্বসম্মত। সুতরাং আলোচ্য আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সকল বিষয়ে সকল দিক থেকে ছাহাবা কেরামই হলেন শ্রেষ্ঠ মানব এবং এটাই জমহুরে উম্মতের আকীদা ও মতবিশ্বাস।*

---

* দেখুন ইবনে আব্দুল বার কৃত الاستيعاب এর ভূমিকা এবং সাফারিনী কৃত شرح عقيدة الدرة المضية

ইবরাহীম সাঈদ জাওহারী (রহ.) বলেন, হযরত আবু উমামাকে একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত মুআবিয়া (রা.) ও হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয, এ দু'জনের মাঝে উত্তম কে ? জবাবে হযরত আবু উমামা বলেন,

لا نعْدلُ بِاَصْحَابِ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحدًا (الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية)

কাওকে আমরা মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আছহাবের সমতুল্য মনে করি না (উত্তমতার প্রশ্ন তো অবান্তর)।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَه اَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَراهمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّن اللهِ وَ رِضْوَانًا . سِيْمَاهُمْ فِى وُجُوْهِم مِنِ أَثَرِ السُّجُوْدِ ○

মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আর তাঁর সঙ্গীরা কাফিরদের মুকাবেলায় যেমন কঠোর, নিজেদের মাঝে তেমনি সদয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তাদের তুমি দেখতে পাবে রুকু ও সিজদায় অবনত। (অধিক) সিজদা 'পরিচয়-চিহ্ন' এঁকে দিয়েছে তাদের মুখমণ্ডলে।

ইমাম কুরতবীসহ সকল মুফাসসির والذين معه অংশটিকে عام বা সর্বব্যাপী বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, বিনা ব্যতিক্রমে সকল ছাহাবার সাধুতা ও ন্যায়পরতার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীন করেছেন।

হযরত আবু 'উরওয়া যোবায়রী (রহ.) বলেন, হযরত ইমাম মালিক (রহ.)-এর মজলিসে একবার কতিপয় ছাহাবীর সমালোচনাকারী এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠল। হযরত ইমাম তখন আলোচ্য আয়াতটি ليغيظ بهم الكفار পর্যন্ত তিলাওয়াত করে বললেন, যার অন্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর প্রতি অসন্তোষ থাকবে সে আলোচ্য আয়াতের নাগালে এসে ঈমানের খাতরায় পড়ে যাবে। কেননা আয়াতে কোন ছাহাবীর প্রতি অসন্তোষকে কাফির হওয়ার পরিচয়বাহী বলা হয়েছে—

يَوْمَ لاَيُخْزِى اللهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَه ○

সেদিন আল্লাহ্‌ তাঁর নবীকে এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে তাঁদের অপদস্থ করবেন না।

বলাবাহুল্য যে, এখানে والذين امنوا معه এর ব্যাপকতায় সকল ছাহাবার পূর্ণ জামা'আত শামিল রয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌ যাদের অপদস্থ না করার সান্ত্বনাবাণী শোনাচ্ছেন, তাঁদের কারো শানে সামান্যতম অপ্রিয় মন্তব্য করার অধিকার আমাদের কিভাবে থাকতে পারে ?

وَالسَّابِقُوْنَ الاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ ○

মুহাজির ও আনছারদের মাঝে যারা (ঈমান গ্রহণে) অগ্রগামী আর যারা তাদের আন্তরিক অনুসারী আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্‌ তাদের জন্য তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এমন উদ্যান তৈরী রেখেছেন।

আলোচ্য আয়াতে ঈমান গ্রহণের সময়ের দিক থেকে ছাহাবা কেরামকে অগ্রবর্তী ও পরবর্তী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে উভয় শ্রেণীকে আল্লাহ্‌ ও বান্দার পারস্পরিক সন্তুষ্টির এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। 'অগ্রবর্তী ও পরবর্তী' এর ব্যাখ্যাগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, 'সকল' সাহাবা এ সুসংবাদ বাণীর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবু মুসা আশ'আরী, সাঈদ বিন মুসাইয়িব, ইবনে সীরীন, হাসান বছরী প্রমুখের মতে অগ্রবর্তী আনছার ও মুহাজির বলে তাদের বোঝানো হয়েছে যারা উভয় কেবলামুখী হয়ে নামায পড়ার সুযোগ পেয়েছেন।—ইবনে কাছীর

কেবলা পরিবর্তনের* ঘটনা ছিলো দ্বিতীয় হিজরীর। সুতরাং এর আগে ইসলাম গ্রহণপূর্বক যারা ছাহাবীত্বের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁরাই হলেন السابقون الاولون বা ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তী দল।

পক্ষান্তরে ইমাম শা'আবীর বর্ণনা মতে ছয় হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধি-পূর্ব বাই'আতে রিযওয়ানে শরীক ছাহাবারাই হলেন السابقون الاولون।

—ইবনে কাছীর, আল ইসতি'আব

হোদায়বিয়ার ঘটনায় গাছের ছায়ায় বসে আল্লাহ্‌র রাসূলের হাতে জীবনবাজি রাখার বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন ছাহাবা কেরামের যে সৌভাগ্যবান জামা'আত, তাদের সম্পর্কে সাধারণ সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়ে আল-কোরআন

* বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বাইতুল্লাহ্‌র দিকে।

ইরশাদ করেছে—

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ○

গাছের নীচে তোমার হাতে বাই'আত গ্রহণের মুহূর্তেই মুমিনদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।

এমনকি এ কারণেই ইতিহাসে তা بيعة الرضوان (সন্তুষ্টি লাভের বাই'আত) নামে পরিচিত হয়েছে। ওদিকে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে—

لَايَدْخُلُ النَّارُ اَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرِ . (ابن عبد البر بسنده في الاستيعاب)

গাছের ছায়ায় বাই'আত গ্রহণকারী একজনও জাহান্নামে যেতে পারে না।

السابقون الأولون এর যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক তাদের পরবর্তীরা والذين اتبعوهم باحسان এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। উভয় দলের জন্যই রয়েছে আল্লাহ্র পূর্ণ সন্তুষ্টি এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাছীরের মন্তব্য*—

يَا وَيْلَ مَنْ اَبْغَضَهُمْ اَوْ سَبَّهُمْ اَوْ سَبَّ بَعْضَهُمْ (الي قوله) فَاَيْنَ هٰؤُلَاءِ مِنَ الاِيْمَانِ بِالْقُرْاٰنِ اِذْ يَسُبُّوْنَ مَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (ابن كثير)

ধ্বংস! চরম ধ্বংস সেই নরাধমদের জন্য যারা সকল ছাহাবার প্রতি বা কোন একজনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, অথবা তাদের মন্দ বলে। আল্লাহ্ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের যারা মন্দ বলে; কোথায় থাকলো তাদের ঈমান বিল কোরআন ?

الإستيعاب এর ভূমিকায় একই আয়াত প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার লিখেছেন—

وَمَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخَطْ عَلَيْهِ اَبَدًا اِنْ شَاءَ اللهُ ـ

আল্লাহ্ একবার যাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন ইনশা'আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি

* যার ইতিহাস সংকলন থেকে ছাহাবা-সমালোচনার তথ্য উপাদান গ্রহণ করা হয়।

কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না।

অর্থাৎ মানুষ যেহেতু বর্তমান পর্যন্ত সীমিত জ্ঞানের অধিকারী সেহেতু কারো প্রতি তার সন্তুষ্টি ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। কিন্তু আদি-অন্ত সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ক্ষণস্থায়ী হতে পারে না। তার সন্তুষ্টি এমন মানুষের প্রতিই হতে পারেন যার আগামী জীবনও শুভ সুন্দর বলে তিনি জানেন। মোটকথা, কারো প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ঘোষণা মূলতঃ এ কথারই জামানত যে, এই শুভ অবস্থার উপরই তার খাতেমা হবে। شرح العقيدة الواسطية গ্রন্থে হাফেয ইবনে তায়মিয়া এবং شرح عقيدة الدرة গ্রন্থে আল্লামা সাফারিনীও এ ব্যাখ্যা দান করেছেন। সুতরাং স্বভাবদুষ্ট লোকদের এ ধরনের বাচালতা প্রকাশের কোন অবকাশ নেই যে, কোরআনের সন্তুষ্টি ঘোষণা ছিলো তাদের সে সময়ের সন্তোষজনক অবস্থার কারণে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের কারো কারো জীবনে মন্দের ছাপ পড়েছিলো বিধায় উক্ত সন্তুষ্টি-সৌভাগ্য থেকেও তারা বিচ্যুত হয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ্) কেননা এর অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, খাতেমা ও শেষ অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সাময়িক অবস্থার উপরই আল্লাহ্ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। পরে অবস্থার পরিবর্তন হেতু হুকুমেরও পরিবর্তন ঘটেছে। (নাউযুবিল্লাহ)

এখানে এসে হয়ত কারো দুর্বল মনে اني فرطكم علي الحوض (হাউযে কাউছারে আমি তোমাদের অগ্রদূত হবো।) হাদীছটির কারণে দ্বিধা সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। কেননা হাদীছ মতে

لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَ يَعْرِفُوْنَنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَاَقُوْلُ اَصْحَابِيْ فَيَقُوْلُ لَا تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ ـ

"আমিও চিনি এবং আমাকেও চেনে" এমন একদল লোক হাউযে কাউছারে আমার সামনে হাজির হবে। কিন্তু আমার ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। (অন্য বর্ণনা মতে) আমি তখন "এরা তো আমার ছাহাবী" বলে অনুনয় করবো। কিন্তু জবাবে আমাকে বলা হবে যে, আপনি তো জানেন না, আপনার পরে এরা কী কীর্তিকলাপ করেছে।

স্থূল দৃষ্টিতে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, কতিপয় আছহাবে রাসূলই হচ্ছেন, আলোচ্য হাদীছের লক্ষ্য। কিন্তু তা কোরআন সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট বহু আয়াত ও হাদীছের সাথে বিরোধপূর্ণ বিধায় শীর্ষস্থানীয় ভাষ্যকারগণ হাদীছটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দান করেছেন।

এক ব্যাখ্যা মতে এখানে পরবর্তী যুগের বিদ'আত সৃষ্টিকারীদের কথা বলা

হয়েছে যাদের সাথে চিহ্ন ও আলামতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় বিনিময় হবে। সুতরাং اصحابي এর অর্থ হবে اتباعي (আমার অনুসারীরা)। এধরণের গ্রহণযোগ্য আরো বহু ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে কোরআন ও হাদীছে ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত অসংখ্য ফাযায়েল ও প্রশংসা-বাণী সামনে রেখে ইমাম নববীর মতামতই আমাদের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধতম মনে হয়। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরতে গিয়ে হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) লিখেছেন—

وَقَالَ النَّوَوِىُّ هُمُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُرْتَدُّوْنَ فَيَجُوْزُ اَن يُحْشَرُوْا بِالْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيْلِ لِكَوْنِهِمْ مِنْ جُمْلَةِ الاُمَّةِ فَيُنَادِيْهِمْ مِنْ اَجْلِ السِّيْمَا الَّتِيْ عَلَيْهِمْ فَيُقَالُ اِنَّهُمْ بَدَّلُوْا بَعْدَكَ اَيْ لَمْ يَمُوْتُوْا عَلي ظَاهِرِ مَا فَارَقْتَهُمْ عَلَيْهِ قَالَ عِيَاضٌ وَ غَيْرُه وَعَلى هذَا فَيُذْهَبُ عَنْهُمُ الْغُرَّةُ وَ التَّحْجِيْلُ وَ يُطْفَأُ نُوْرُهُمْ - (فتح الباري ص ٤٢٣ ج ١١)

(ইমাম) নববীর মতে মুনাফেক ও মুরতাদ শ্রেণীর লোকেরাই হচ্ছে আলোচ্য হাদীছের লক্ষ্য, যারা (নবুওয়তের জামানায় বাহ্যত মুসলমান হলেও অন্তরে তাদের ঈমান ছিলো না) ওফাতে নবীর পর বাহ্যিক ইসলাম থেকেও সরে গিয়েছিলো। যেহেতু এরাও মুসলমানদের সাথে লোক দেখানো অযু নামাজ করতো সেহেতু তাদের হাতে পায়ে ও মুখমণ্ডলে অযুর চিহ্ন জ্বলজ্বল করবে এবং তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে ডাকবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করে বলা হবে যে, যে বাহ্যিক অবস্থার উপর এদের আপনি রেখে এসেছিলেন পরবর্তীতে সেটাও তারা বর্জন করে প্রকাশ্য ধর্ম ত্যাগ করেছিলো। (হযরত ইয়ায ও অন্যান্যরা বলেন) অতঃপর তাদের অঙ্গ থেকে অযুর নূর ও উজ্জ্বল আলো নিভে যাবে।

আমাদের দৃষ্টিতে উপরোক্ত মতামত আল-কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সাথে সংগতিপূর্ণ।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ○ (سورة الحديد)

সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন মুনাফিক নারী পুরুষরা মুসলমানদের

অনুনয় করে বলবে, একটু আমাদের অপেক্ষা কর। তোমাদের নূর থেকে কিঞ্চিত আলো সংগ্রহ করি। তাদের জবাব দেয়া হবে, পিছনে ফিরে গিয়ে আলো খুঁজে দেখ।

আয়াত থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, কেয়ামত দিবসে প্রথম পর্যায়ে মুনাফিক ও মুমিনরা মিলেমিশেই থাকবে। পরবর্তী পর্যায়ে তাদের পৃথক করে দেয়া হবে।

আলোচ্য হাদীছের কোন কোন বর্ণনায় ব্যবহৃত ارتدوا শব্দের মতলব কেউ কেউ এরূপ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর কিছু লোক মুরতাদ হয়েছিলো। (নাউযুবিল্লাহ্)

এসম্পর্কে আমাদের প্রথম কথা তো এই যে, ارتداد মুরতাদ হওয়ার অর্থ এখানে, অন্তরে কুফরী থাকা অবস্থায় ইসলামের যে মৌখিক দাবী তাদের ছিলো তা বর্জন করা। সুতরাং এটা মুনাফিকদেরই ব্যাপার, কোন ছাহাবীর মুরতাদ হওয়ার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে প্রকৃত ارتداد (অর্থাৎ ধর্ম গ্রহণ করে তা বর্জন করা) বোঝানো হলে আমাদের বক্তব্য এই যে, এখানে সেই সকল মুর্খ বেদুঈনদের কথা বলা হয়েছে যারা ইসলামের প্রবল অগ্রযাত্রার মুখে মৌখিক ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, কিন্তু ঈমান দৃঢ়মূল হয় নি। তাদের কথাই কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে—

قَالَتِ الاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ○ (سورة الحجرات)

বেদুঈনরা 'ঈমান এনেছি' বলে। আপনি বলে দিন, তোমরা ঈমান তো আন নি, তবে এরূপ বলতে পারো যে, বিরোধিতা ছেড়ে আমরা অনুগত হয়ে গেছি। কেননা ঈমান এখনো তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নি।

হাফেয খাত্তাবী কত সুন্দর লিখেছেন—

لَمْ يَرْتَدَّ مِنَ الصَّحَابَةِ اَحَدٌ وَ اِنَّمَا ارْتَدَّ قَوْمٌ مِنْ جُفَاةِ الاَعْرَابِ مِمَّنْ لاَ نُصْرَةَ لَه فِى الدِّيْنِ وَ ذلِكَ لاَ يُوْجِبُ قَدْحًا فِىْ الصَّحَابَةِ الْمَشْهُوْرِيْنَ وَيَدُلُّ قَوْلُه اُصَيْحَابِىْ بِالتَّصْغِيْرِ عَلي قِلَّةِ عَدَدِهِمْ - (فتح البارى ص ٣٢٤ ج ١١)

ছাহাবাদের একজনও ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগ করেন নি। গোঁয়ার কিসিমের

কতিপয় বৃদ্দু অবশ্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় মুরতাদ হয়েছিলো, দ্বীনের নুসরত ও সাহায্যে যাদের কোন অবদান ছিলো না। কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছিলো মাত্র। মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। এর দ্বারা প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত ছাহাবা কেরামের কোন মর্যাদাহানী হতে পারে না। খোদ হাদীছে اصحابي এর পরিবর্তে ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও সংখ্যাল্পতা জ্ঞাপক اصيحابى শব্দের ব্যবহারও সেদিকে ইঙ্গিত করছে।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْ اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ـ

আপনি বলে দিন, এটাই হলো আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে, আমরা সকলে অন্তর্দৃষ্টির সাথে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানাই।

আলোচ্য আয়াতেও 'আমাকে যারা অনুসরণ করেছে' বলে শ্রেণী নির্বিশেষে সকল ছাহাবীর প্রশংসা করা হয়েছে।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى (مع قوله تعالى) ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ○ (سورة فاطر)

আপনি বলে দিন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্র নির্বাচিত বান্দাদের সালাম। (অন্য আয়াতে আছে) অতঃপর আমার নির্বাচিত বান্দাদের আমি কিতাবের অধিকারী বানালাম। তাদের মাঝে কতিপয় তো নিজেদের উপর অবিচারকারী। আর কতিপয় হলো মধ্যপন্থী। তবে তাদের মাঝে এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহে পুণ্যের পথে ক্রমেই অগ্রসর হয়ে চলেছে। প্রকৃত পক্ষেই এটা বড় অনুগ্রহ।

আলোচ্য আয়াতে ছাহাবা কেরামকে আল্লাহ্র নির্বাচিত বান্দা ঘোষণা করা হয়েছে। পরবতীতে তাদেরই একাংশকে 'অবিচারকারী' বলে বোঝানো হয়েছে যে, কোন ছাহাবীর জীবনে কোন দুর্ঘটনা বা গুনাহ যদি ঘটেও থাকে তবে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। না হলে 'নির্বাচিত বান্দাদের' ফিরিস্তিতে তাদের নাম উল্লেখ করা হতো না।

আল কোরআনের প্রথম বাহক ছাহাবা কেরাম আল-কোরআনেরই ভাষ্যমতে হলেন আল্লাহ্র নির্বাচিত বান্দা। প্রথম আয়াতে এই নির্বাচিত বান্দাদের উদ্দেশ্যে 'ছালাম' এসেছে স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে।

এভাবে সকল ছাহাবা আল্লাহ্র 'ছালাম-উপহার' লাভে ধন্য হয়েছেন।*

সূরাতুল হাশরে আল্লাহ্ পাক নবুওয়ত ও নবুওয়ত পরবর্তী যুগের সকল মুসলমানের তিনটি শ্রেণী বিভাগ করে প্রথম শ্রেণীতে মুহাজিরদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

اُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ

এরাই হলো সত্যাশ্রয়ী ও সত্যবাদী।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আনছারদের বিভিন্ন ফায়ায়েল ও গুণ আলোচনা পূর্বক ইরশাদ হয়েছে—

اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

এরাই হলো সফলকাম।

তৃতীয় শ্রেণীটি হলো মুহাজির ও আনছারদের পর কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল মুসলমানের। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে—

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ○

আর তাদের পরে এসে যারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপাকল! আমাদের মাগফেরাত করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছেন। আর আমাদের অন্তরে মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ যেন না থাকে।

আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, পরবর্তী মুসলমানদেরকে আনছার-মুহাজির ছাহাবীদের জন্য মাগফিরাত কামনার নির্দেশ দিতে গিয়ে অদুর ভবিষ্যতে তাদের গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কথা আল্লাহ্ পাক অবশ্যই জানতেন। তাই আলোচ্য আয়াতের আলোকে উলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল আছহাবের প্রতি যার শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও শুভ কামনা নেই ইসলাম ধর্মে তার কোন হিস্সা নেই।

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ اُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ

* আল্লামা ছাফারিনী কৃত شرح الدرة المضية

عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ O (سورة الحجرات)

কিন্তু ঈমানকে আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে সুপ্রিয় ও সুশোভিত করে দিয়েছেন। আর কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন ঘৃণিত। আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহে এরাই হলো হেদায়েতপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহা-প্রজ্ঞাময়।

এখানে আল্লাহ্ পাক ঈমানের প্রতি ভালবাসা এবং কুফর ও পাপাচারের প্রতি ঘৃণাকে ছাহাবা কেরামের ব্যতিক্রমহীন বৈশিষ্ট্যরূপে ঘোষণা করেছেন। বস্তুতঃ ছাহাবা কেরামের প্রতি আল্লাহ্ পাকের চির সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতে তাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আল-কোরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা সুপ্রমাণিত এক অকাট্য সত্য। কিন্তু ছাহাবা কেরামের ফাযায়েল ও মর্যাদা বিষয়ক 'আয়াতসমগ্রের' পরিবেষ্টন এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। নমুনা স্বরূপ এই কয়েকটি আয়াতই যথেষ্ট।

তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) যে মহা সত্যের প্রতি নির্দেশ করেছেন তা আমাদের চিন্তায় অবশ্যই জাগরুক রাখতে হবে। অর্থাৎ ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে আল-কোরআনের এসকল বাণী সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যিনি বিশ্ব জগতের জড়-প্রাণী সকল কিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের অতীত ও ভবিষ্যত জীবনের প্রতিটি আচরণ ও কর্ম সম্পর্কে যিনি পূর্ণ অবগত। সুতরাং নববী যুগে এবং পরবর্তীকালে ছাহাবা কেরামের জীবনে সংঘটিত সকল ঘটনা দুর্ঘনার কথা জেনেই আল্লাহ্ পাক তাদের আপন সন্তুষ্টি ও জান্নাতপ্রাপ্তির সুসংবাদ দান করেছেন।

الصارم المسلول গ্রন্থে আল্লামা ইবনে তায়মিয়া বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি এমন বান্দার জন্যই হতে পারে, যার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তুষ্টির যাবতীয় দাবী ও চাহিদা পূর্ণ হতে থাকবে বলে তিনি জানেন। মানুষের জ্ঞান অতীত ও বর্তমান পর্যন্ত সীমিত। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে পরিব্যাপ্ত। তাই কারো প্রতি মানুষের সন্তুষ্টি ক্ষণস্থায়ী হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ক্ষণস্থায়ী হতে পারে না। আল্লাহ্ যার প্রতি একবার সন্তুষ্ট হন তার প্রতি কখনো আর অসন্তুষ্ট হন না।

হাদীছের দৃষ্টিতে ছাহাবা

ছাহাবা কেরামের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত 'হাদীছ-সমগ্র' পেশ করা সহজ নয়। অবশ্য তার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করি না। এখানে আমরা শ্রেণী ও জামা'আত হিসাবে ছাহাবা কেরামের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কিত হাদীছগুলো থেকেই দু'একটি নমুনা শুধু তুলে ধরছি। ব্যক্তি বা গোত্রের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছ এখানে আলোচনায় আসবে না।

বুখারী মুসলিমসহ সকল মৌলিক হাদীছগ্রন্থে হযরত ইমরান বিন হাছীন থেকে নীচের হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ فَلاَ اَدْرِيْ ذَكَرَ قَرْنَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ اِنَّ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلاَيَسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَ يَنْذُرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ (للستة الامالكا جمع الفوائد ص ٤٩٠ ج ٢)

সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ। অতঃপর তাদের সংলগ্ন পরবর্তীরা, অতঃপর তাদের সংলগ্ন পরবর্তীরা (রাবী বলেন,) কথাটা তিনি দু'বার কি তিনবার বলেছেন তা আমার মনে নেই। অতঃপর এমন যুগ আসবে যে, লোকেরা অযাচিতভাবে সাক্ষী দিতে যাবে। আমানত রক্ষার পরিবর্তে খেয়ানত করবে। ওয়াদা রক্ষার পরিবর্তে নির্দ্বিধায় তা ভংগ করবে। এবং (আয়েশের কারণে) তাদের দেহে মেদবাহুল্য দেখা দিবে।

আলোচ্য হাদীছে 'সংলগ্ন পরবর্তী' কথাটি দু'বার হলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ হলো যথাক্রমে ছাহাবা কেরাম ও তাবেয়ীনের যুগ। পক্ষান্তরে তিনবার হলে চতুর্থ যুগের তাবয়ে তাবেয়ীনও তাতে শামিল হবেন।

বুখারী, মুসলিম আবু দাউদ ও তিরমিযি শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَوْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَه (جمع الفوائد)

আমার ছাহাবাদের মন্দ বলো না। কেননা আল্লাহ্‌র পথে কারো অহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান কোন ছাহাবীর এক 'মুদ' বা তার অর্ধেকেরও সমতুল্য হবে না।

আমাদের দেশের প্রচলিত মাপ হিসাবে আরব দেশীয় 'মুদ' হচ্ছে এক সেরের সমান। আলোচ্য হাদীছ এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ ও সাহচর্য এমনই মহামূল্যবান নেয়ামত যে, একজন সাধারণ ছাহাবীর সামান্য আমলও উম্মতের শ্রেষ্ঠ অলী-বুজুর্গের পাহাড় সমান আমলের চেয়েও ওজনদার। সুতরাং সাধারণ উম্মতের আমলের সাথে তাদের আমলের তুলনা করাই অর্থহীন।

হাদীছের لاتسبوا শব্দটির অর্থ সাধারণতঃ 'গালি দিও না' করা হয়। এটা ভুল অনুবাদ। কেননা আমাদের ভাষায় গালি শব্দটি অকথ্য কথনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। অথচ আরবী ভাষায় কষ্টদায়ক ও অবমাননাকর যে কোন কথাকেই سب বলা হয়। গালির সমার্থক আরবী শব্দ হলো شتم।

الصارم المسلول গ্রন্থে হাফেজ ইবনে তায়মিয়াও سب এর এই অর্থব্যাপকতার কথা উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই হাদীছের তরজমায় আমরা 'মন্দ বলো না' লিখেছি।

তিরমিযী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اَللهَ اَللهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللهَ وَمَنْ اٰذَى اللهَ فَيُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَه - (جمع الفوائد)

আল্লাহ্‌কে ভয় করো! আমার ছাহাবাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল বানিও না। তাদের প্রতি ভালবাসা আমারই প্রতি ভালবাসার প্রমাণ এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ আমারই প্রতি বিদ্বেষের প্রমাণ। তাদেরকে যে কষ্ট দিলো সে আমাকেই যেন কষ্ট দিলো। আর আমাকে যে কষ্ট দিলো সে আল্লাহ্‌কেই যেন কষ্ট দিলো। আর আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়ার অর্থ নিশ্চিত আযাবের অপেক্ষায় থাকা।

আলোচ্য হাদীছের 'ভালবাসা ও বিদ্বেষ' সম্পর্কিত অংশটির দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ—ছাহাবাদের প্রতি ভালবাসা আমারই প্রতি ভালবাসার প্রমাণ। অর্থাৎ আমার প্রতি যার ভালবাসা আছে সেই শুধু আমার ছাহাবাদের ভালবাসতে পারে। হাদীছের তরজমায় এ অর্থটাই গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ—আমার ছাহাবাদের যে ভালবাসে আমিও তাকে ভালবাসি। অর্থাৎ কারো অন্তরে ছাহাবাদের ভালবাসা বিদ্যমান থাকা এ কথার প্রমাণ যে, তার প্রতি আমার ভালবাসা রয়েছে। অনুরূপভাবে বিদ্বেষের ক্ষেত্রেও এ দুই অর্থ প্রযুক্ত। অর্থাৎ ছাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ মূলতঃ আমারই প্রতি বিদ্বেষ পোষণের প্রমাণ। কিংবা ছাহাবা-বিদ্বেষীদের প্রতি আমিও বিদ্বেষ পোষণ করি।

অর্থ যাই হোক, ছাহাবা কেরামের অবাধ সমালোচনায় অভ্যস্ত ভদ্র লোকদের প্রতি এ হাদীছ কিন্তু চরম হুঁশিয়ারি সংকেত। উম্মতের হৃদয়ে ছাহাবাদের প্রতি ভুল ধারণা বা অনাস্থা সৃষ্টি হতে পারে, এমন কথা যারা বলে বেড়ায়, কী মর্মান্তিক হতে পারে তাদের পরিণতি তা সহজেই অনুমেয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে তাদের এ আচরণ মূলতঃ রাসূলের প্রতি বিদ্রোহেরই নামান্তর। কেননা রাসূল ও উম্মতের মাঝের সংযোগ-সেতু ভেঙ্গে ফেলার অপচেষ্টায় তারা তৎপর। সুতরাং রাসূলের ক্রোধ ও আল্লাহ্‌র গযব তাদের জন্য অবধারিত।

তিরমিযি শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِىْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللهِ عَلٰى شَرِّكُمْ (جمع الفوائد)

কাউকে আমার ছাহাবাদের মন্দ বলতে দেখ যদি, তবে তাকে বলে দিও, (তুমি ও ছাহাবা) তোমাদের উভয়ের নিকৃষ্টতরের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ।

আপনিই বলুন ; কে হবে নিকৃষ্টতর ?! ছাহাবা না তাদের নিন্দা ও সমালোচনা-কারী ? সুতরাং দ্ব্যর্থহীনভাবেই বলা যায় যে, ছাহাবা-সমালোচকদেরকে আল্লাহ্‌র অভিশাপের যোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে এই হাদীছে। এখানে আবারো আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আরবী ভাষায় سب শব্দটি অশ্লীল গালি ও অকথ্য কথনই বোঝায় না শুধু বরং কষ্টদায়ক ও অবমাননাকর সকল কথাই এর অন্তর্ভুক্ত।

আবু দাউদ ও তিরমিযি শরীফে বর্ণিত আছে, কতিপয় প্রশাসকের উপস্থিতিতে হযরত আলী (রাযি.)-এর সমালোচনা হয় ; এ কথা জানতে পেয়ে হযরত ছাঈদ বিন যায়েদ তাদের বললেন, আফসোস! তোমাদের উপস্থিতিতে নবী

করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবাদের সমালোচনা হয় অথচ তোমরা তাতে বাঁধা দাও না বা তিরস্কার কর না। শোনো! রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে আমার মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই, কেননা, কেয়ামতের দিন তাঁর সাক্ষাতে আমাকে জবাব দিতে হবে। (অতঃপর হাদীছ বর্ণনা করে তিনি বললেন,) নিজের কানে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, আবু বকর জান্নাতী, উছমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যোবায়র জান্নাতী, সা'আদ বিন মালিক জান্নাতী, আবদুর রহমান বিন আউফ জান্নাতী, আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ জান্নাতী। এরা সকলেই জান্নাতী হবেন। নয়জনের পর দশম নামটি উল্লেখ না করে তিনি নিরব থাকলেন। কিন্তু শ্রোতাদের বারংবার অনুরোধে তিনি বললেন, দশমজনক সাঈদ বিন যায়েদ। (অর্থাৎ তিনি নিজে। বিনয় বশতঃ নিজের নাম বলতে তিনি ইতস্তঃ করছিলেন।)

অতঃপর তিনি বললেন—

وَاللهُ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَعَ النَّبِيِّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْبَرُ فِيْهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نُوْحٍ - (جمع الفوائد ص ٤٩٢ ج٢)

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জেহাদের মাঠে কোন ছাহাবীর চেহারা ধুলিমলিন হওয়া তোমাদের সারা জীবনের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। নূহ (আ.)-এর মত সুদীর্ঘ জীবন যদি হয় তবু।

ইমাম আহমদ (রহ.) তাঁর মুসনাদে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাযি.)-এর মহামূল্যবান একটি উপদেশ বর্ণনা করেছেন—

مَنْ كَانَ مُتَأَسِّيًا فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّهُمْ أَبَرُّ هذه الأُمَّةِ قُلُوْبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَأَقْوَمُهَا هَدْيًا وَ أَحْسَنُهَا حَالاً قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللهُ لِصَحْبَةِ نَبِيِّهِ وَ اقَامَةِ دِيْنِهِ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْا أَثَارَهُمْ فَانَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الهُدى المُسْتَقِيْمِ - (شرح عقيدة)

কেউ যদি কারো তরীকা অনুসরণ করতে চায় তাহলে বিগতদের তরীকাই তার অনুসরণ করা উচিত। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফেৎনার সম্ভাবনামুক্ত নয়। তাঁরা হলেন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবা। হৃদয়ের পবিত্রতায়, ইলমের গভীরতায় এবং আড়ম্বরহীনতায় তাঁরা ছিলেন এই উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠ জামা'আত। আল্লাহ্ তাদেরকে আপন নবীর সংগলাভ এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত

মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নাও এবং তাঁদের পথ ও পন্থা অনুসরণ করো। কেননা তাঁরা ছিলেন সরল পথের পথিক।

আবু দাউদ শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাযি.)-র আরেকটি বর্ণনা এরূপ—

انَّ اللهَ نَظَرَ فِيْ قُلُوْبِ الْعِبَادِ فَنَظَرَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِه ثُمَّ نَظَرَ فِيْ قُلُوْبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوْبَ أَصْحَابِه خَيْرَ قُلُوْبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ لِصَحْبَةِ نَبِيِّهِ وَنُصْرَةِ دِيْنِه .. (سفارنى شرح الدرة)

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের 'কলব' অবলোকন করে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলবকে সর্বোত্তম পেলেন, তাই তাঁকে রাসূলরূপে পাঠালেন। অতঃপর অন্যান্যদের কলব অবলোকন করে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবাদের কলবকে সর্বোত্তম পেলেন, তাই তিনি স্বীয় নবীর সাহচর্য এবং দ্বীনের সাহায্যের জন্য তাদের নির্বাচন করলেন।

মুসনাদে বাযযার গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে হযরত জাবের (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

انَّ اللهَ اخْتَارَ أَصْحَابِى عَلَى الْعَالَمِيْنَ سِوى النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَاخْتَارَ لِىْ مِنْ أَصْحَابِى أَرْبَعَةً يَعْنِىْ أَبَابَكْرٍ وَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَ عَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِى وَقَالَ فِىْ أَصْحَابِى كُلُّهُمْ خَيْرٌ -

বিশ্ব জগতে নবী-রাসূলদের পর আল্লাহ্ আমার ছাহাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাদের মাঝে আবু বকর, ওমর, উছমান, আলী এই চারজনকে আমার বিশিষ্ট সংগী করেছেন। অবশ্য কল্যাণ আমার সকল ছাহাবাদের মাঝেই বিদ্যমান।

'আওহাম বিন সাইদাহ (রহ.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

انَّ اللهَ اخْتَارَنِى وَاخْتَارَ لِى أَصْحَابِى فَجَعَلَ مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَخْتَانًا وَأَصْهَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ وَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً - (تفسير قرطبى ، سورة الفاتحة)

রিসালাতের জন্য আল্লাহ্ আমাকে নির্বাচন করেছেন এবং আমার সাহচর্যের জন্য ছাহাবাদের নির্বাচন করেছেন। তাদের মাঝে কতিপয়কে আমার ওজির (পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী) কতিপয়কে জামাতা, ও শ্বশুররূপে নির্বাচন করেছেন। তাদের যারা মন্দ বলবে তাদের উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্তা ও মানবকুলের অভিশাপ নেমে আসবে। তাদের সব আমলই কেয়ামতে আল্লাহ্র দরবারে বাতিল হবে।—তাফসীরুল কুরতবী, সূরাতুল ফাতহি

হযরত 'ইরবায বিন সারিয়া (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

انَّه مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ـ (رواه الإمام أحمد و ابو داؤد و الترمذى و ابن ماجة وقال الترمذى حديث حسن صحيح وقال ابو نعيم حديث جيد صحيح)

(سفارنى ص ٢٨٠)

আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে ব্যাপক মতবিরোধ দেখতে পাবে, তখন আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং নব-উদ্ভাবিত বিদ'আত থেকে অবশ্যই বেঁচে থেকো। কেননা বিদ'আত মাত্রই ভ্রষ্টতা।

আলোচ্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য সুন্নাতে রাসূলের পাশাপাশি সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীনকেও উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয় ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্ন ছাহাবীর নামোল্লেখ পূর্বক উম্মতকে তাঁদের নির্দেশিত পথে চলার উপদেশ দেয়া হয়েছে। হাদীছশাস্ত্রের সকল গ্রন্থেই এ সকল বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে।

কোরআন সুন্নায় বর্ণিত মাকামে ছাহাবার সারসংক্ষেপ

কোরআন সুন্নাহর উপরোল্লেখিত আয়াত ও রেওয়ায়াতগুলোতে ছাহাবা কেরামের প্রশংসা ও ফযীলত এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদের পাশাপাশি উম্মতকে তাঁদের অনুসৃত পথে চলার জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে।

সেই সাথে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে কোন ছাহাবীর সমালোচনার কঠিন পরিণতি সম্পর্কেও। সর্বোপরি ছাহাবা কেরামের প্রতি ভালবাসাকে আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি ভালবাসার এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষকে তাঁর প্রতি বিদ্বেষের পরিচায়ক ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামী শরীয়তে ছাহাবা কেরামের এই অনন্য মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানকেই এখানে আমরা 'মাকামে ছাহাবা' নামে তুলে ধরেছি।

উম্মাহর ইজমা

কোরআন সুন্নাহ্র আলোকে ছাহাবা কেরামের জন্য নির্ধারিত এই মাকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে সর্বযুগের উম্মতে মুহাম্মদী ঐক্যমত পোষণ করে এসেছে। দু' একটি ভ্রষ্ট দল অবশ্য ব্যতিক্রম ছিলো।

ছাহাবা-যুগের পর তাবেয়ী-যুগ হলো হাদীছ-বর্ণিত দ্বিতীয় কল্যাণযুগ। এই কল্যাণযুগের তাবেঈদের মাঝে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হলেন হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয। এবার শুনুন, আবু দাউদ শরীফে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত তাঁর উপদেশ। কোরআন সুন্নাহ্র আলোকে ছাহাবা কেরামের মাকাম ও মর্যাদা ব্যাখ্যা করে যে ফরমান তিনি জারী করেছিলেন তার প্রয়োজনীয় অংশটুকু নীচে তুলে ধরা হলো—

فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِىَ بِه الْقَوْمُ لاَنْفُسِهِمْ فَاِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوْا وَ بِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوْا وَهُمْ عَلَى كَشْفِ الاُمُوْرِ كَانُوْا اَقْوى و بِفَضْلٍ مَا كَانُوْا فِيْهِ اَوْلَى فَاِنْ كَانَ الْهُدَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ فَقَدْ سَبَقْتُمُوْهُمْ اِلَيْه وَلَئِنْ قُلْتُمْ اِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَا اَحْدَثَه الاَّ مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِه عَنْهُمْ فَاِنَّهُمُ السَّابِقُوْنَ فَقَدْ تَكَلَّمُوْا فِيْهِ بِمَا يَكْفِىْ وَ وَصَفُوْا مِنْهُ مَا يَشْفِىْ فَمَا دُوْنَهُمْ مِنْ مُقَصِّرٍ وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مُحَسِّرٍ وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُوْنَهُمْ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمْ اَقْوَامٌ فَغَلَوْا وَاِنَّهُمْ بَيْنَ ذلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيْمٍ ـ الخ

ছাহাবা কেরামের অনুসৃত পথ গ্রহণ করাই তোমার কর্তব্য। কেননা তাঁরা যে সীমারেখায় থেমেছেন, জ্ঞান ও ইলমের ভিত্তিতেই থেমেছেন এবং মানুষকে যা থেকে বিরত রেখেছেন সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির কারণেই রেখেছেন। জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের সমাধানে নিঃসন্দেহে তাঁরাই ছিলেন সক্ষম এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁরাই হলেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিক হকদার। তোমাদের পথই হিদায়াতের পথ, এ দাবী যদি

মেনে নেয়া হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় যে, ফযীলত ও মর্যাদায় তোমরা তাঁদের ছাড়িয়ে গেছ (যা একেবারেই অসম্ভব)। আর যদি বলো যে, এ বিষয়গুলো পরবর্তীতে উদ্ভূত, বিধায় এ ক্ষেত্রে তাঁদের কোন ভূমিকা ও দিকনির্দেশ নেই। তাহলে মনে রেখো, এসবের উদ্ভাবকরা নিঃসন্দেহে ছাহাবাদের পথ ও পন্থা থেকে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন। কেননা, দ্বীনের পথে তারাই হলে অগ্রবর্তী এবং সকল ক্ষেত্রে রয়েছে তাদের পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা। তাঁদের দেয়া ব্যবস্থাপত্র থেকেই সকল ব্যাধির উপশম লাভ সম্ভব। সুতরাং তাঁদের অনুসৃত পথ ও পন্থায় সংযোজন বা বিয়োজন কোনটাই সম্ভব নয়। একদল তাতে সংযোজন করতে গিয়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। আরেক দল তাতে বিয়োজন করতে গিয়ে মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে পড়েছে। কিন্তু ছাহাবা কেরাম ছিলেন উভয় প্রান্তিকতার মধ্যবর্তী সহজ সরল পথের অনুসারী।

ইসলামী শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে খেলাফতে রাশেদার অনুসারী আদর্শ খলীফা ও শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) ছাহাবা কেরামের মাকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়ে গেছেন সর্ব যুগের উম্মতে মুহাম্মদী সে বিষয়ে ছিলো ঐক্যবদ্ধ। এই আকীদা-বিশ্বাসের উপর সকলের ছিলো পূর্ণাঙ্গ ইজমা। হাদীছ ও আকায়েদগ্রন্থে সাধারণতঃ যার শিরোনা হলো الصحابة كلهم عدول। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে ছাহাবা কেরামের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে এপর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে, আলোচ্য শিরোনামের মর্মার্থও তাই।

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ এর মর্মার্থ

عدول শব্দটি عدل এর বহুবচন। عدل শব্দটি মূলতঃ ক্রিয়ামূল, অর্থ- সমান ভাগ করা। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে عدل অর্থ- সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পর ব্যক্তি। কোরআন সুন্নায় বহুল ব্যবহৃত এ শব্দটি শরীয়তের পরিভাষায় কি অর্থ বহন করে তা নির্ধারণ করা হয়েছে হাদীছ, তাফসীর ও ফিকাহ বিষয়ক উছূলশাস্ত্রে। আল্লামা ইবনে ছালাহ লিখেছেন—

تَفْصِيْلُه اَن يَكُوْنَ مُسْلِمًا بَالِغًا ، عَاقِلاً ، سَالِمًا من اَسْبَابِ الْفِسْقِ وَ خَوَارِمَ الْمُرُوءَة ـ (علوم الحديث)

শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা হলো, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী মুসলমান হওয়া এবং যাবতীয় পাপ ও মহত্ত্ববিরোধী আচরণ থেকে মুক্ত থাকবে।

তাকরীব গ্রন্থে শেখুল ইসলাম আল্লামা নববী (রহ.) এবং তাদরীব গ্রন্থে

আল্লামা সুয়ূতীও ইবনে ছালেহের অনুরূপ ভাষা ও শব্দ গ্রহণ করেছেন। নববীর ভাষায়—

عَدْلاً ضَابِطًا بِاَن يَكُوْنَ مُسْلِمًا ، بَالِغًا ، عَاقِلاً ، سَلِيْمًا مِنْ اَسْبَابِ الْفِسْقِ وَ خَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ ـ

সুয়ূতীর ভাষায়—

فَسَّرَ الْعَدْلَ بِاَنْ يَكُوْنَ مُسْلِمًا ، بَالِغًا ، عَاقِلاً ، الى قَوْله سَلِيْمًا مِنْ اَسْبَابِ الْفِسْقِ وَ خَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ ـ

شرح نخبة الفكر এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার 'আসকালানী লিখেছেন—

اَلْمُرَادُ بِالْعَدْلِ مَنْ لَه مَلَكَةٌ تَحْمِلُه عَلى مُلاَزَمَةِ التَّقْوى وَالْمُرُوْءَة
وَالْمُرَادُ بِالتَّقْوى اِجْتِنَابَ الاَعْمَالِ السَّيِّئَةِ مِنْ شِرْكَةٍ اَوْ فِسْقٍ اَوْ بِدْعَةٍ ـ

তিনিই عدل যিনি সার্বক্ষণিক তাকওয়া ও মহত্ত্বে উদ্বুদ্ধকারী নৈতিক শক্তির অধিকারী। আর তাকওয়া অর্থ শিরক, পাপ ও বিদ'আত জাতীয় যাবতীয় বিশ্বাস ও আচরণ থেকে সর্বোতভাবে বিরত থাকা। عدل এর অধিকতর বিশদ ব্যাখ্যা দিতে الدر المختار গ্রন্থের كتاب الشهادة অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

وَمَنِ ارْتَكَبَ صَغِيْرَةً بِلاَ اِصْرَارٍ اِنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ كُلَّهَا وَ غَلَبَ صَوَابُه عَلى صَغَائِرِهَا (درر وغيرها) قَالَ وَهُوَ مَعْنَى العَدَالَة قَالَ وَ مَتى ارْتَكَبَ كَبِيْرَةً سَقَطَتْ عَدَالَتُه ـ

যাবতীয় কবীরা গোনাহ থেকে মুক্ত থাকার পর বাংরবারতা ছাড়া কোন ছগীরা গোনাহ যদি হয়ে যায় এবং ছগীরাসমূহের উপর পুণ্য অধিকতর প্রবল হয় তবে তিনিও عادل বা ন্যায়পর বিবেচিত হবেন। তবে কোন কবীরাতে লিপ্ত হলে তার আদালত ও ন্যায়পরতা রহিত হয়ে যায়।

الدر المختار এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে আল্লামা ইবনে আবেদীন লিখেছেন—

فِىْ الْفَتَاوى الصُّغْرى حَيْثُ قَالَ الْعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ كُلَّهَا حَتى لَوِ ارْتَكَبَ كَبِيْرَةً تَسْقُطُ عَدَالَتُه وَفِى الصَّغَائِرِ الْعِبْرَةُ بِالْغَلَبَةِ اَوِ الاِصْرَارِ

عَلَى الصَّغِيْرَةِ فَتَصِيْرُ كَبِيْرَةً وَلِذَا قَالَ غَلَبَ صَوَابُه ، قَوْلُه (سَقَطَتْ عَدَالَتُه) وَتَعُوْدُ اذا تَابَ ـ الخ (رد المحتار ابن عابدين شامى ص ٥٢٢)

ফাতাওয়া ছুগরাতে বলা হয়েছে عدل বা ন্যায়পর এমন ব্যক্তি যিনি যাবতীয় কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকেন। এমনকি একটি মাত্র কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলেও عدالة ও ন্যায়পরতা রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ছগীরা গুনাহের ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যের দিকটি বিবেচ্য। তবে কোন একটি ছগীরার বারংবারতা কবীরা হিসাবে গণ্য হবে। এজন্যই الدر المختار গ্রন্থকার غلب صوابه বলে পূণ্যকর্ম প্রবল হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। তবে عدالة ও ন্যায়পরতা রহিত হওয়ার পর তাওবার মাধ্যমে তা পনুঃবহাল হতে পারে।

হাদীছ ও ফেকাহশাস্ত্র বিশারদদের উপরোল্লেখিত সব ক'টি ভাষ্যের মর্মার্থ মোটামুটি অভিন্ন। তাদের মতে এর শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

১। মুসলমান হওয়া। ২। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। ৩। সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। ৪। কোন একটি ছগীরা গোনাহ বারংবার না হওয়া। ৫। ছগীরা গোনাহ বেশী মাত্রায় না হওয়া। ৬। যাবতীয় কবীরা গোনাহ্ থেকে মুক্ত-পবিত্র থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় এই হলো তাকওয়ার মর্মার্থ। আল্লামা ইবনে আবেদীনও সেটাই তুলে ধরেছেন। তাকওয়ার বিপরীত অবস্থার নাম হলো فسق বা অধার্মিকতা। সুতরাং কারো عدالة ও ন্যায়পরতা রহিত হলে শরীয়তের পরিভাষায় সে فاسق বা অধার্মিক হবে। ছাহাবা কেরামের عدالة বা ন্যায়পরতার সপক্ষে যেসকল বরেণ্য আলিম উম্মতের পূর্ণাঙ্গ ইজমা ঘোষণা করেছেন তাদের ভাষ্য থেকেও عدالة ও ন্যায়পরতার উপরোক্ত ব্যাখ্যাই পরিস্ফুট হয়।

একটি সন্দেহের নিরসন

এখানে একটি প্রশ্নের অবকাশ আছে যে, একদিকে তো উম্মতের আকীদা হলো ; মানুষ হিসাবে ছাহাবা কেরাম নিষ্পাপ নন। সুতরাং ছগীরা বা কবীরা গোনাহ্ ঘটা তাদের পক্ষে সম্ভব এবং বাস্তবেও তা ঘটেছে। অন্যদিকে সকল ছাহাবার 'আদালত ও ন্যায়পরতার আকীদাও পোষণ করা হচ্ছে, যার সর্বসম্মত পারিভাষিক অর্থ হলো, যাবতীয় কবীরা গোনাহ থেকে মুক্ত থাকা এবং ছগীরা গুনা হয় অভ্যস্ত না হওয়া। সুতরাং কবীরা গোনাহে লিপ্ত বা ছগীরা গোনাহে অভ্যস্ত ব্যক্তির 'আদালত ও ন্যায়পরতা অবশ্যই রহিত হবে এবং শরীয়তের পরিভাষায় সে ফাসিক আখ্যা লাভ করবে। তাই স্বীকার করতে হবে যে, নিষ্পাপ না হওয়া এবং আদিল ও ন্যায়পর হওয়ার আকীদা দু'টি সুস্পষ্টরূপে পরস্পর বিরোধী।

এ সংশয় নিরসনে জমহুরে উলামার খোলাসা জবাব হলো, এটা সত্য যে, ছাহাবা কেরাম নিষ্পাপ নন, ছগীরা বা কবীরা গোনাহ ঘটা তাঁদের জীবনেও সম্ভব এবং ঘটেছেও দু' একবার। তবে তাঁদের ও সাধারণ উম্মতের মাঝে বিরাট পার্থক্য এই যে, তাঁদের সারা জীবনে ছগীরা বা কবীরার অস্তিত্ব সমুদ্রের তুলনায় বিন্দুর চেয়েও কম।

দ্বিতীয় কথা এই যে, গোনাহের কারণে কারো عدالة ও ন্যায়পরতা রহিত হলে প্রতিকারের একমাত্র পথ হলো তাওবা। সুতরাং যার সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে জানা গেছে যে, তিনি তাওবা করেছেন কিংবা নেক ও পূণ্যের বিপুলতার কারণে আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফিরাত লাভ করেছেন। তার 'আদালত ও ন্যায়পরতা অবশ্যই বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যে তাওবা করে নি সে 'আদালত বঞ্চিত ফাসিকই থেকে যাবে।

এই তাওবার ক্ষেত্রে ছাহাবা কেরাম ও সাধারণ উম্মতের মাঝে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য এই যে, সাধারণ উম্মতের বেলায় নিশ্চিতরূপে এ কথা বলার উপায় নেই যে, সে তাওবা করেছে বা তার পুণ্য কৃতপাপ মোচন করে দিয়েছে। সুতরাং কোন সূত্রে তার তাওবা কিংবা মাগফিরাত লাভের নিশ্চিত অবগতি না হওয়া পর্যন্ত তাকে ফাসিকই বলা হবে এবং সাক্ষ্যদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে অনির্ভরযোগ্যই বিবেচিত হবে। কিন্তু ছাহাবা কেরামের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। পক্ষান্তরে তাদের জীবনচরিত সম্পর্কে যারা জ্ঞাত তাদের ভাল করেই জানা আছে যে, কী অকল্পনীয় ছিলো তাঁদের আল্লাহ্‌ভীতি এবং পাপ থেকে বাঁচার আকুতি। তাই মানবীয় স্বভাবের স্বাভাবিক প্রকাশহেতু কখনো দুর্ঘটনামূলক কোন বিচ্যুতি ঘটে গেলে যে চরম অস্থিরতা ও ভয়বিহ্বলতা তাঁদের আচ্ছন্ন করে রাখতো, হাদীছের ভাষ্যমতে তা ছিলো গোটা উম্মতের সম্মিলিত তাওবা ও অনুতাপের তুলনায়ও অধিক। তাঁদের একজনের একটি মাত্র গোনাহের তাওবা সমগ্র উম্মতের সকল পাপ মোচনের জন্য ছিলো যথেষ্ট। মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে তাওবা করাই যথেষ্ট ছিলো, কিন্তু আল্লাহ্‌র ভয় তাদের এমনই প্রবল ছিলো যে, কঠিনতম শাস্তির জন্য রাসূলের দরবারে নিজেদের তারা স্বেচ্ছায় পেশ করে দিতেন। মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতেন। আসমান থেকে তাওবা কবুলের সুসংবাদ না আসা পর্যন্ত তাঁদের অস্থিরতা ও ভয়বিহ্বলতার কোন উপশম হতো না। আল্লাহ্‌র রহমতের দরিয়ায় তখন দেখা দিতো মউজ। নাযিল হতো প্রশংসাসহ তাওবা কবুলের আয়াত। এই হলেন ছাহাবা কেরাম। সুতরাং যেসকল ছাহাবা সম্পর্কে তাওবা করার ঘটনা আমাদের জানা নেই, তাঁদের প্রবল আল্লাহ-ভীতির স্বভাব দাবী হিসাবে এ সুধারণাই

আমরা পোষণ করবো যে, তারা তাওবা করেছেন, দ্বিতীয়তঃ জীবনে তাদের নেক ও পুণ্যকর্মের বিস্তৃতি ছিলো এত বিশাল, আল্লাহ্ সন্তুষ্টি লাভের জন্য দ্বীনের পথে তাঁদের ত্যাগ ও কোরবানী ছিলো এমন অপরিসীম যে, সারা জীবনের দুর্ঘটনামূলক দু' একটি গোনাহ্ তাঁদের মাফ হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কেননা আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে—

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

পুণ্যকর্ম যাবতীয় পাপ মোচন করে দেয়।

এই নীতিগত বিশ্বাসটুকু তো কোন দলীল প্রমাণ ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে থাকা উচিত। কেননা আকল, ইনসাফ ও স্বভাব-যুক্তিরই দাবী এটা। কিন্তু সুখের বিষয় যে, ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে আমাদের এই বিশ্বাস নিছক স্বভাব-যুক্তি নির্ভর নয়। বরং কোরআন সুন্নাহ্‌র বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তা পরিপুষ্ট। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছাহাবা কেরামের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ও সার্বজনীন সন্তুষ্টির ঘোষণা বারবার এসেছে আল-কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে।

হোদায়বিয়ার ঘটনায় গাছের ছায়াতে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ছাহাবা কেরামের যে অভূতপূর্ব বাই'আত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ক্ষমা ও সন্তুষ্টির কোরআনী সুসংবাদের কারণেই তা بيعة الرضوان (বা সন্তুষ্টি লাভের বাই'আত) নামে অভিহিত হয়েছে। উক্ত বাই'আতে শরীক প্রায় দেড়হাজার ছাহাবা সম্পর্কে কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো—

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

গাছের ছায়াতে আপনার হাতে বাই'আত করার মুহূর্তেই আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।

এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বাই'আতে রিযওয়ানে যারা শরীক ছিলেন তাদের কাওকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। হাদীছ ও তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে বিশুদ্ধ সনদে বহু হাদীছ এমর্মে বর্ণিত হয়েছে।

অন্যদিকে অগ্রবর্তী ও পরবর্তী সকল ছাহাবা কেরামের প্রতি সাধারণ সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়ে সূরা তাওবায় ইরশাদ হয়েছে—

السَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ

بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

মুহাজির ও আনছারদের মাঝে (ঈমান গ্রহণে) যারা অগ্রবর্তী আর যারা আন্তরিকভাবে তাঁদের অনুসারী তাদের সবার প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয় এমন জান্নাত তৈরী রেখেছেন। চিরকাল তাতে তারা বাস করবে। এটাই তো আসল কামিয়াবী।

সূরাতুল হাদীদে আছহাবে রাসূল সম্পর্কে আরেকটি ঘোষণা—

وَكُلًّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنٰى

আল্লাহ্ তাঁদের প্রত্যেকের জন্য 'হুসনা' এর ওয়াদা করেছেন।

অতঃপর সূরাতুল আম্বিয়ায় 'হুসনা' সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى اُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ○

আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য 'হুসনা' ঘোষিত হয়েছে জাহান্নাম থেকে তাদের দূরেই রাখা হবে।

সুতরাং আয়াত দু'টির পরিস্কার মর্মার্থ এই দাঁড়ালো যে, সকল আছহাবে রাসূলকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখার ফায়সালা জান্নাত জাহান্নামের স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন।

সূরাতুত্তাওবায় আরো ইরশাদ হয়েছে—

لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ، اِنَّهٗ بِهِمْ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

আল্লাহ্, নবী ও আনছার-মুহাজিরদের তাওবা কবুল করেছেন, যারা কঠিন সময়ে নবীর অনুগত থেকেছেন। অবশ্য তাদের একদলের হৃদয় 'বক্র' হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। পরে আল্লাহ্ তাদের মাফ করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তাদের প্রতি তিনি মেহেরবান ও দয়াময়।

আলোচ্য আয়াতে আল-কোরআন এ কথার 'যামানত' পেশ করছেন যে, অগ্রবর্তী বা পরবর্তী ছাহাবাদের কারো জীবনে কোন পাপ-দুর্ঘনা যদি ঘটেও

থাকে তবে কালবিলম্ব না করে অনুতপ্ত হৃদয়ে তিনি তাওবা করে নিবেন। কিংবা নববী ছোহবতের বরকত এবং আল্লাহ্‌র পথে তাদের সারা জীবনের ত্যাগ, কোরবানী ও ইবাদতের বদৌলতে আল্লাহ্ তাঁদের মাফ করে দিবেন এবং পাপের স্পর্শ থেকে মুক্ত পবিত্র হয়েই দুনিয়া থেকে তারা বিদায় নিবেন। সুতরাং কোন পাপ-দুর্ঘটনার কারণে তাদের 'আদালত ও ন্যায়পরতা রহিত হতে পারে না এবং ফাসিকও বলা যেতে পারে না। এটা অবশ্য ঠিক যে, পাপ কর্মের নির্ধারিত শাস্তি-বিধান সাধারণ উম্মতের ন্যায় ছাহাবীর ক্ষেত্রেও সমানভাবেই কার্যকর হবে, তাঁর সেই আমলকে فسق বা পাপাচারই বলা হবে। কিন্তু যেহেতু কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণায় তাঁদের তাওবা ও ক্ষমার নিশ্চয়তা রয়েছে সেহেতু 'আদালত বঞ্চিত ফাসিক তাদের বলা যাবে না কিছুতেই। وان جاءكم فاسق আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসী যে প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন। এতক্ষণ তারই সারনির্যাস পেশ করা হলো।

আয়াতুর রিযওয়ান এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাযী আবু ইয়ালা লিখেছেন—

وَالرِّضَى مِنَ اللهِ صِفَةٌ قَدِيْمَةٌ فَلَا يَرْضَى الاَّ مِنْ عَبْدٍ يَعْلَمُ اَنَّه يُوَفِّيْهِ عَلَى مُوْجِبَاتِ الرِّضَى وَمَنْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخَطْ عَلَيْهِ اَبَدًا (الصارم المسلول لابن تيمية)

বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আল্লাহ্ পাকের একটি অনাদিগুণ। সুতরাং তাঁর সন্তুষ্টি এমন বান্দার প্রতিই হতে পারে যার সম্পর্কে তিনি জানেন যে, সন্তুষ্টির অনুকূল কারণগুলো তার মাঝে জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা আল্লাহ্ কারো প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আর কখনো অসন্তুষ্ট হন না।

মোটকথা, অনিষ্পাপতা সত্ত্বেও সকল ছাহাবার ন্যায়পর হওয়ার মাঝে যে আপাতঃ বৈপরীত্য দেখা যায় তার পরিচ্ছন্ন ও যুক্তিনির্ভর জবাব এটাই যা জমহুরে উলামায়ে কেরাম পেশ করেছেন।

আলোচ্য প্রশ্নের নিরসনকল্পে কতিপয় গবেষক عدالة এর অর্থ সংকোচন করে দাবী করেছেন যে, 'আদালত ও ন্যায়পরতা ছাহাবাদের জীবনের সকল গুণ ও আচরণের ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত নয়। বরং হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সীমিত। অর্থাৎ, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা মিথ্যা বলতে পারেন না। সেক্ষেত্রে ছাহাবা কেরামের عدالة ও ন্যায়পরতা অনস্বীকার্য, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে তা অপরিহার্য নয়।

মূলতঃ عدالة এর এ অভিনব ব্যাখ্যা ভাষা ও শরীয়তের স্বভাব-ধারার বিরুদ্ধে আরোপিত একটি অকারণ ও যুক্তিহীন বাড়াবাড়ি। অবশ্য আলোচ্য

সংশোধনী দ্বারা তারাও এ কথা কিছুতেই বোঝাতে চান না যে, কর্মে ও আচরণে ছাহাবারা অন্যায়পর ও ফাসেক হতে পারেন। অন্ততঃ তাদের অন্যান্য লেখা এ ধারণাকে নাকচ করে দিচ্ছে।

প্রায় অভিন্ন আরেকটি বক্তব্য হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয (রহ.)-র নামে তাঁর ফতোয়া সংকলনের বরাতে চলে আসছে। কিন্তু বক্তব্যের প্রকৃতিগত কারণেই শাহ সাহেবের ন্যায় সর্বজ্ঞান পারদর্শী মহান ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের নামের সাথে সেটির সম্পৃক্তি হৃদয় ও যুক্তি কোন ক্রমেই স্বীকার করে না। সকলেই জানেন যে, ফাতাওয়া আযিযিয়া নামের এ সংকলনটি হযরত শাহ সাহেবের মৃত্যুর বহু বছর পর অন্যের হাতে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বে এর উপাদানগুলো চিঠি ও ফতোয়ার আকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। সুতরাং সংকলনভুক্ত বিতর্কিত বক্তব্যটি অন্য কারো 'প্রক্ষেপন', এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। যদি এটাকে শাহ সাহেবের নিজস্ব বক্তব্য বলেই ধরে নেয়া হয় তাহলে জমহুরে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মোকাবেলায় তা অবশ্যই বর্জনীয়। (প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।)

উছূলে হাদীছ ও 'আকায়েদশাস্ত্রের প্রায় সকল কিতাবেই 'আদালতে ছাহাবা' প্রশ্নে উম্মতের পূর্ণাঙ্গ ইজমা বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু কিছু নমুনা তুলে ধরছি।

হাদীছ ও উসূলে হাদীছশাস্ত্রের ইমাম আল্লামা ইবনে ছালাহ্ علوم الحديث গ্রন্থে লিখেছেন—

للصَّحَابَةِ بِاَسْرِهِمْ خَصِيْصَةٌ وَهِىَ اَنَّه لاَ يَسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ اَحَدٍ مِنْهُمْ بَلْ ذَلِكَ اَمْرٌ مَفْرُوْغٌ عَنْهُ لِكَوْنِهِمْ عَلَى الاِطْلاَقِ مُعَدَّلِيْنَ بِنُصُوْصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِه فِي الاِجْمَاعِ مِنَ الاُمَّةِ قَالَ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، قِيْلَ اتَّفَقَ الْمُفَسِّرُوْنَ ، عَلَى اَنَّه وَرَدَ فِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثُمَّ سَرَدَ بَعْضَ النُّصُوْصِ الْقُرْاٰنِيَّةِ وَالاَحَادِيْثِ كَمَا ذَكَرْنَا سَابِقًا) (علوم الحديث ص ٢٦٤)

ছাহাবা কেরামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট এই যে, তাঁদের কারোই 'আদালত ও ন্যায়পরতা' সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের কোন অবকাশ নেই। কেননা তা কোরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা সুপ্রমাণিত বিষয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, তোমরা মানুষের কল্যাণ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত শ্রেষ্ঠ

উম্মত। কতিপয় আলেমের মতে আলোচ্য আয়াতের 'শানে নুযূল' যে ছাহাবা কেরাম, সে বিষয়ে তাফসীর বিশারদদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই।

আল-ইস্তি'আবের ভূমিকায় আল্লামা ইবনে আব্দুল বার লিখেছেন—

فَهُمْ خَيْرُ الْقُرُوْنِ وَ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ثَبَتَتْ عَدَالَةُ جَمِيْعِهِمْ لِثَنَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ وَ ثَنَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلاَ أَعْدَلُ مِمَّنْ ارْتَضَاهُ اللهُ بِصَحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُصْرَتِهِ وَلاَ تَزْكِيَةَ أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ تَعْدِيْلَ أَكْمَلَ مِنْهَا قَالَ تَعَالَى : مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ـ (الاستيعاب ص ٢ ج ١)

ছাহাবা কেরাম হলেন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ এবং মানব জাতির জন্য প্রেরিত সর্বোত্তম উম্মত। আল্লাহ্ ও রাসূলের বিভিন্ন প্রশংসাবাণী দ্বারা তাঁদের 'আদালত ও ন্যায়পরতা সুপ্রমাণিত। সর্বোপরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য ও সাহায্যের জন্য নির্বাচিত যারা, তাঁদের তুলনায় অধিক ন্যায়পর কে আর হতে পারে? কারো ন্যঅয়পরতা ও নির্ভরযোগ্যতার স্বপক্ষে এর চে' বড় সনদ আর কী হতে পারে।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতামত উল্লেখ করেছেন এভাবে—

لاَيَجُوْزُ لأَحَدٍ أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا مِنْ مَسَاوِيْهِمْ وَلاَ أَنْ يَطْعَنَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِعَيْبٍ وَلاَ نَقْصٍ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ وَجَبَ تَأْدِيْبُهُ وَقَالَ الْمَيْمُوْنِى سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ مَا لَهُمْ وَ لِمُعَاوِيَةَ نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ وَقَالَ لِىْ يَا أَبَا الْحَسَنِ أَذَا رَأَيْتَ أَحَدًا يَذْكُرُ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوْءٍ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الإِسْلاَمِ ـ (ذكره ابن تيميه في الصارم المسلول)

তাদের মন্দ আলোচনা করা, দোষারোপ করা বা খুঁত খুঁজে বের করা কারো জন্যই বৈধ নয়। বরং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হযরত মায়মূনী (রহ.) বলেন, ইমাম আহমদকে আমি আক্ষেপ করে বলতে শুনেছি, 'মানুষের হলো কি যে, তারা হযরত মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমালোচনায় মেতে উঠেছে। এ ভয়াবহ বিপদ থেকে আল্লাহ্ আমাদের নিরাপদ রাখুন। (আমীন!) অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, হে আবুল হাসান! কাউকে যদি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের ছাহাবাদের সমালোচনা করতে দেখ, তাহলে তার ঈমানকে সন্দেহের চোখে দেখবে।

তাকরীব গ্রন্থে ইমাম নববী (রহ.) লিখেছেন—

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُوْلٌ مَنْ لاَبَسَ الْفِتَنَ وَغَيْرُهُمْ بِإِجْمَاعِ مَنْ يَعْتَدُّ بِهِ ـ

যেসকল ছাহাবা মতবিরোধের জটিল গোলযোগে জড়িয়ে পড়েছিলেন তারা এবং অন্যরা, সকলেই 'আদেল বা ন্যায়পর, এ বিষয়ে যাদের মতামত গ্রহণযোগ্য তাদের সকলের ইজমা রয়েছে।

এ মতামতের সমর্থনে কোরআন সুন্নাহর বিভিন্ন আয়াত ও রিওয়ায়াত উল্লেখ করে আল্লামা সুয়ূতি লিখেছেন—

'ছাহাবা কেরাম সমালোচনার ঊর্ধ্বে' এবং 'তাঁদের 'আদালত ও ন্যায়পরতা প্রশ্নাতীত' এ বিশ্বাসের কারণ এই যে, রাসূল ও তাঁর উম্মতের মাঝে ছাহাবা কেরামই হলেন একক যোগসূত্র। দ্বীন ও শরয়ীতের তাঁরাই হলেন প্রথম ধারক ও বাহক। সুতরাং তাঁদের 'আদালত ও ন্যায়পরতা প্রশ্নের সম্মুখীন হলে দ্বীন ও শরীয়তের অস্তিত্বই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। কেননা তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রসার লাভ করার পরিবর্তে মুহাম্মদী শরীয়ত নবুয়তের বরকতময় যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর আলোচ্য বিষয়ে অংশত ভিন্নমত পোষণকারীদের দাবী খণ্ডন করে তিনি লিখেছেন—

وَالْقَوْلُ بِالتَّعْمِيْمِ هُوَ الَّذِىْ صَرَّحَ الْجُمْهُوْرُ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ (تدريب الراوى ص ٤٠٠)

عدالة ও ন্যায়পরতা সকল ছাহাবার মাঝে পরিব্যাপ্ত। এটাই জমহুরের মত এবং গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিনির্ভর মত।

আল্লামা কামাল ইবনে হোমাম তাঁর ইসলামী আকীদা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ المسايرة তে লিখেছেন—

وَاعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ تَزْكِيَةُ جَمِيْعِ الصَّحَابَةِ وُجُوْبًا بِإِثْبَاتِ الْعَدَالَةِ لِكُلِّ مِنْهُمْ وَالْكَفُّ عَنِ الطَّعْنِ فِيْهِمْ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ كَمَا أَثْنَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ (ثُمَّ سَرَدَ الاٰيَاتَ وَالرِّوَايَاتَ الَّتِىْ مَرَّتْ) (مسايرة ص ١٣٢)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা মতে সকল ছাহাবার সাধুতা ও ন্যায়পরতা বিশ্বাস করা, তাঁদের সমালোচনা সর্বোতভাবে পরিহার করা এবং

আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুরূপ তাঁদের প্রশংসা করা অবশ্যকর্তব্য। অতঃপর এ বক্তব্যের সমর্থনে আল্লামা ইবনুল হোমাম বিভিন্ন আয়াত ও রেওয়ায়াত পেশ করেছেন।

شرح العقيدة الواسطية গ্রন্থে আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (রহ.) লিখেছেন—

وَمِنْ أُصُوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُوْبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَصَفَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِى قَوْلِهِ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ الآيَة (شرح العقيدة ص ٤٠٢)

ছাহাবা কেরামের বিষয়ে 'কলব ও যবান' পাক রাখা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের মৌল পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন—

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ ....

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরও যারা ঈমান গ্রহণে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছেন এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন বিদ্বেষ না থাকে।

আল্লামা ছাফারেনী (রহ.) লিখেছেন—

وَالَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّه يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ تَزْكِيَةُ جَمِيْعِ الصَّحَابَةِ بِإِثْبَاتِ الْعَدَالَةِ لَهُمْ وَ الْكَفِّ عَنِ الطَّعْنِ فِيْهِمْ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَثْنَى اللهُ سُبْحَانَه عَلَيْهِمْ فِى عِدَّةِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيْزِ عَلَى أَنَّه لَوْ لَمْ يَرِدْ عَنِ اللهِ وَلَا عَنْ رَسُوْلِه فِيْهِمْ شَيْءٌ لَأَوْجَبَتِ الْحَالُ الَّتِى كَانُوْا عَلَيْهَا مِنَ الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ وَنُصْرَةِ الدِّيْنِ وَبَذْلِ الْمُهَجِ وَالْأَمْوَالِ وَقَتْلِ الْآبَاءِ وَالْأَوْلَادِ وَالْمُنَاصَحَةِ فِى الدِّيْنِ وَقُوَّةِ الْاِيْمَانِ وَالْيَقِيْنِ الْقَطْعَ بِتَعْدِيْلِهِمْ وَالْاِعْتِقَادِ لِنَزَاهَتِهِمْ وَ أَنَّهُمْ أَفْضَلُ جَمِيْعِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ هٰذَا مَذْهَبُ كَافَّةِ الْأُمَّةِ وَمَنْ عَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ـ(عقيدةسفارنى ص ٣٢٨)

আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, সকল ছাহাবাকে পাপ ও দোষমুক্ত মনে করা, তাঁদের 'আদালত ও ন্যায়পরতা স্বীকার করা, সমালোচনা পরিহার করা এবং আন্তরিক প্রশংসা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। কেননা আল-কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্ তাদের প্রশংসা করেছেন। এমনকি তাঁদের শানে আল্লাহ্ ও রাসূলের কোন প্রশংসাবাণী উচ্চারিত নাও যদি হতো তবু তাঁদের হিজরত-নুসরত ও জিহাদ, আল্লাহ্র পথে জানমাল ও পিতা-পুত্রদের কোরবানী, দ্বীনের কারণে পরস্পরের কল্যাণ কামনা এবং ঈমান ও ইয়াকীনের সর্বোচ্চ শক্তি ও মর্যাদা ইত্যাদি গুণাবলীর কারণে উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামা'আতরূপে তাঁদের ন্যায়পরতা ও পবিত্রতায় বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য কর্তব্য হতো। সর্বজন মান্য ইমামদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের আলোকে এটাই হলো উম্মতের সার্বজনীন আকীদা ও বিশ্বাস।

উম্মতের সামনে আমাদের পূর্বসূরী আকাবিরে দ্বীন ও ছালাফ ছালেহীনের সর্বসম্মত আকীদা বিশ্বাস তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আল্লামা ছাফারেনী (রহ.) প্রথমে الدرة المضية ও পরে এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে لوامع الانوار البهية شرح الدرة المضية রচনা করেছেন। তাতে তিনি ইমাম মুসলিম (রহ.)-র বিশিষ্ট উস্তাদ ইমাম আবু যর'আর নিম্নোক্ত মন্তব্য উল্লেখ করেছেন—

اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمْ أَنَّه زِنْدِيْقٌ وَ ذٰلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ وَ الرَّسُوْلُ حَقٌّ وَمَا جَاءَ بِه حَقٌّ وَمَا أَدَّى اِلَيْنَا ذٰلِكَ كُلَّه اِلَّا الصَّحَابَةُ فَمَنْ جَرَحَهُمْ اِنَّمَا أَرَادَ اِبْطَالَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَيَكُوْنُ الْجَرْحُ بِه أَلْيَقَ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالزَّنْدَقَةِ وَالضَّلَالِ أَقْوَمَ وَأَحَقَّ ـ

কাওকে তুমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ছাহাবীর অবমাননা করতে দেখ তাহলে ধরে নিও যে, লোকটি যিন্দিক (ধর্মহীন)। কেননা কোরআন সত্য, রাসূল সত্য, তাঁর আনীত শিক্ষা ও আদর্শ সত্য। কিন্তু ছাহাবা কেরামের মাধ্যম ছাড়া সেগুলো আমাদের হাতে আসা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং ছাহাবা চরিত্রে কলংক লেপন করা কোরআন সুন্নাহকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। তাই নরাধমটার গায়ে কলংক মেখে ভ্রষ্ট ও যিন্দিক আখ্যা দেয়াই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত।

একই কিতাবে আল্লামা ছাফারেনী, হাফেযে হাদীছ ইবনে হাযম উন্দুলুসীর নিম্নোক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন—

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ قَطْعًا قَالَ تَعَالَى لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنٰى ، وَ قَالَ تَعَالَى اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى اُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ـ (ص ٣٨٩)

আল্লামা ইবনে হাযম (রহ.) বলেন, সকল ছাহাবা নিশ্চিতরূপেই জান্নাতী। কেনন আল-কোরআনের ইরশাদ হলো ঃ তোমাদের মাঝে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহ্র পথে জানমাল খরচকারীরা সমতুল্য হতে পারে না। বরং পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের চেয়ে মর্যাদায় মহান। তবে সকলকেই আল্লাহ্ 'উত্তম বস্তু'র ওয়াদা দিয়েছেন। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, যাদের জন্য আমাদের পক্ষ হতে পূর্বেই উত্তম বস্তর ওয়াদা হয়েছে নিঃসন্দেহে তাঁদেরকে জাহান্নাম হতে দূরে রাখা হবে।

আকায়েদশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ পাঠ্যগ্রন্থ العقائد النسفية তে ইমাম নাসাফী লিখেছেন—

وَيَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ اِلَّا بِخَيْرٍ

(ইসলামী উম্মাহ্র আকীদা এই যে,) ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে উত্তম আলোচনাই শুধু করা উচিত।

ইসলামী আকায়েদ বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ شرح المواقف গ্রন্থে সাইয়েদ জুরজানী লিখেছেন—

يَجِبُ تَعْظِيْمُ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ وَالْكَفُّ عَنِ الْقَدْحِ فِيْهِمْ لِاَنَّ اللهَ عَظِيْمٌ وَاَثْنٰى عَلَيْهِمْ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ (ثُمَّ ذَكَرَ الْآيَاتِ الْمُنْزَلَةَ فِى الْبَابِ ثُمَّ قَالَ) وَالرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَحَبَّهُمْ وَاَثْنٰى عَلَيْهِمْ فِى الْاَحَادِيْثِ الْكَثِيْرَةِ ـ

সকল ছাহাবীর তাযীম করা এবং তাঁদের সমালোচনা পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা আল্লাহ্ সুমহান। আর স্বয়ং তিনি তাঁদের প্রশংসা করেছেন, আল-কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে। (অতঃপর সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ উল্লেখপূর্বক তিনি বলেন) আর আল্লাহ্র প্রিয় রাসূলও তাঁদের ভালবেসেছেন, প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, شرح المواقف গ্রন্থকার অন্য স্থানে চরম বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের উল্লেখযোগ্য অংশ সম্পর্কে তিনি দাবী করেছেন যে, তাদের মতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকারীদের পদক্ষেপ ভুল ইজতিহাদ ভিত্তিক ছিলো না, ছিলো অন্যায় ভিত্তিক। কিন্তু জুরজানীর দাবী আমাদের বোধগম্য নয়। কেননা আহলে সুন্নতপন্থী কোন আলিম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের কারণে হযরত আয়েশা (রাযি.) বা হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-কে দোষারোপ করেছেন বলে আমাদের অন্তত জানা নেই। (নাউজুবিল্লাহ্) তাই মাকতুবাত গ্রন্থে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) অত্যন্ত জোরালো ভাষায় জুরজানির মন্তব্য খণ্ডন করেছেন।*

وانچہ شارح مواقف گفتہ کہ بسیارے از اصحاب ما برآں اند کہ آں منازعت از وے اجتہاد نبود [illegible] از اصحاب کدام گروہ را داشتہ باشد، اہل سنت برخلاف آں حاکم اند چنانکہ گزشتہ وکتب القوم، مشحونة بالخطاء الاجتهادى كما صرح به الامام الغزالى والقاضى ابوبكر وغيرهما پس تفسیق وتفصیل درحق محاربان حضرت امیر جائز نباشد قال القاضى فى الشفاء

قَالَ مَالِكٌ مَنْ شَتَمَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ اَوْ عُمَرَ اَوْعُثْمَانَ اَوْمُعَاوِيَةَ اَوْ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ فَاِنْ قَالَ كَانُوْا عَلٰى ضَلَالٍ اَوْ كُفْرٍ قُتِلَ وَ اِنْ شَتَمَ بِغَيْرِ هٰذَا مِنْ مُشَاتَمَةِ النَّاسِ نُكِّلَ نَكَالًا شَدِيْدًا ، فَلَا يَكُوْنُ مُحَارِبُوا عَلِىٍّ كَفَرَةً كَمَا زَعَمَ الْغُلَاةُ مِنَ الرَّافِضَة وَلَا فَسَقَةً كَمَا زَعَمَ الْبَعْضُ وَ نَسَبَه شَارِحُ الْمَوَاقِفِ اِلٰى كَثِيْرٍ مِنْ اَصْحَابِه

وانچہ درعبارات بعضے از فقہاء لفظ جور درحق معاویہ واقع شدہ است وگفتہ کان معاوية اماما جائرا مراد از جور عدم حقیقت خلافت او درزمان خلافت حضرت امیر خواہد بود نہ جورے کہ مآلش فسق وضلالت است تابہ اقوال اہل سنت موافق باشد، مع ذلک ارباب استقامت از اتیان الفاظ موہمہ خلاف

---

* আমাদের ধারণায় এ অংশটি জুরজানীর নিজস্ব মন্তব্য নয়, বরং অন্যের প্রক্ষেপন। কেননা এটা তার পূর্বোল্লেখিত মন্তব্যের সাথে স্ববিরোধপূর্ণ।—অনুবাদক

مقصود اجتناب می نمایند و زیادہ برخطا تجویز نمی کند۔ (مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصہ چہارم مکتوب ۲۵۱ ص ۷۶ تا ۷۹ جلد دوم)

জানি না شـرح المواقـف গ্রন্থকার 'আমাদের স্বপক্ষীয় বহু আলিম' বলে কাদের বোঝাতে চেয়েছেন ? আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদা তো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইমাম গাজ্জালী ও কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবীসহ যে কোন আহলে সুন্নতপন্থী আলিমের রচনায় 'ভুল ইজতিহাদ' কথাটি সহজেই নজরে পড়ে। অর্থাৎ হযরত আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকে তাঁরা ভুল ইজতিহাদ মনে করেন। সুতরাং হযরত আলীর প্রতিপক্ষকে ফাসিক বলার কোন বৈধতাই থাকতে পারে না। হযরত ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন, হযরত আবু বকর, উমর, উছমান, আলী, মু'আবিয়া, আমর বিন আছ রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ যে কোন ছাহাবীর সমালোচনাকারীকে সমালোচনার মাত্রা হিসাবে কঠিন সাজা দেয়া কর্তব্য। কোন ছাহাবী সম্পর্কে কুফরি ও ভ্রষ্টতা জাতীয় শব্দ ব্যবহারের শাস্তি হলো কতল। পক্ষান্তরে প্রচলিত গালি বা কটু মন্তব্যের অপরাধে যে কোন দৃষ্টান্তমূলক সাজা হতে পারে। সুতরাং মালেকী ফতোয়া থেকেও পরিস্কার হলো যে, আমরা আহলে সুন্নতপন্থীরা হযরত আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকারীদেরকে উগ্র রাফেযীদের ন্যায় কাফির যেমন বলি না তেমনি নমনীয় রাফেযীদের ন্যায় ফাসেকও বলি না। বলি ভুল ইজতিহাদকারী। কিন্তু شـرح المواقـف গ্রন্থকার নরমপন্থী রাফেযীদের মতামতকেই 'স্বপক্ষীয়' আলিমদের নামে উদ্ধৃত করে বসে আছেন। কতিপয় ফকীহ অবশ্য হযরত মু'আবিয়া (রহ.)-র শানে امـام جـائر শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যার সাধারণ অর্থ হলো 'জালিম শাসক'। কিন্তু আহলে সুন্নতের আকীদা বিশ্বাসের সাথে সংগতি বিধান কল্পে বলতেই হয় যে, 'হযরত আলী (রাযি.)-র জীবদ্দশায় হযরত মু'আবিয়া বিধিসম্মত ইমাম ছিলেন না' এ কথাটাই আসলে তারা বলতে চেয়েছিলেন। ভ্রষ্ট ও পাপাচারীদের জুলুম অনাচারের কথা নিশ্চয় তারা বলতে চান নি। তবু এ কথা বলতেই হবে যে, সত্যের অবিচল অনুসারীরা ছাহাবা কেরামের শানে ভুল ধারণা সৃষ্টির অনুকূল যে কোন শব্দ যত্নের সাথে পরিহার করে থাকেন। বিশেষতঃ হযরত আলী (রাযি.)-র প্রতিপক্ষের শানে 'ভুল ইজতিহাদের' অধিক কোন শব্দ প্রয়োগ তারা বৈধ মনে করেন না।

মুশাজরাতে ছাহাবা (ছাহাবা অন্তর্বিরোধ) ও উম্মতের আকীদা

مشـاجرة শব্দটি شـجر (শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ) ধাতুমূল থেকে নিষ্পন্ন। বাতাসের দোলায় শাখা-প্রশাখার পরস্পর সংঘর্ষ থেকে রূপক অর্থে পারস্পরিক বিরোধ সংঘর্ষকে مشـاجرة বলা হয়। মজলুম খলীফা হযরত উছমান (রাযি.)-র শাহাদাতের স্বাভাবিক পরিণতিতে ছাহাবা কেরামের মাঝে সৃষ্ট মতবিরোধ পরিপবর্তিত পরিস্থিতির প্রবল স্রোত প্রবাহে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করেছিলো। কিন্তু উলামায়ে উম্মত আদবের খাতিরে সে যুদ্ধকে مشـاجرة নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ তারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, শাখা-প্রশাখার পরস্পর সংঘর্ষ যেমন সামগ্রিক বিচারে বৃক্ষের জন্য দোষণীয় নয় ; বরং জীবন ও সজীবতার লক্ষণ, তদ্রূপ জটিল পরিস্থিতিতে বিপরীতমুখী ইজতিহাদের ফল হিসাবে ছাহাবা অন্তর্বিরোধও সামগ্রিক বিচারে দোষের বা কলংকের কিছু নয়, বরং ছাহাবা কেরামের আদর্শবাদিতা ও জানবাজিরই জ্বলন্ত প্রমাণ।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ

কোরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমায়ে উম্মতের আলোকে ছাহাবা কেরামের অবস্থান ও মর্যাদার যে স্বরূপ স্থির হলো ; সে প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক প্রশ্ন এই যে, সকল ছাহাবার 'আদালত ও ন্যায়পরতা, ইখলাছ ও নিঃস্বার্থতা এবং তাকওয়া ও ধার্মিকতা প্রশ্নাতীত। সুতরাং সকলেই তাঁরা সমান শ্রদ্ধার পাত্র, এমতাবস্থায় কোন বিষয়ে তাদের মতবিরোধের ক্ষেত্রে আমাদের নীতি ও অবস্থান কি হবে ? দু'টি বিপরীত মতামতকে যুগপৎ নির্ভুল মনে করা যেহেতু সম্ভব নয়, সেহেতু অবধারিতভাবেই গ্রহণ ও বর্জনের পথে আমাদের এগুতে হবে। কিন্তু এই গ্রহণ বর্জনের মাপকাঠি কি হবে। সর্বোপরি উভয় পক্ষের প্রতি সমান ভক্তি শ্রদ্ধাই বা কিভাবে বজায় রাখা হবে ?

বিরোধ যেখানে সংঘর্ষ ও রক্তপাত পর্যন্ত গড়িয়েছে সেখানে প্রশ্নটি অধিকতর জটিল ও নাযুক হবে সন্দেহ নেই। কেননা সে ক্ষেত্রে এক দিকের অবস্থান নির্ভুল ও সঠিক হলে অবধারিতভাবেই প্রতিপক্ষের অবস্থান হবে ভুল ও

বেঠিক। এই ঠিক-বেঠিকের মীমাংসা আমাদের আমল আকীদার জন্যও বিশেষ জরুরী। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভুল পক্ষের প্রতি অশ্রদ্ধা তো মানব স্বভাবের চিরন্তন দাবী। এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের প্রতি সমান শ্রদ্ধা বজায় রাখা কিভাবে সম্ভব ?

এ প্রশ্নের জবাবে আমাদের বক্তব্য এই যে, যুক্তির বিচারে কোন পক্ষের নীতি ও অবস্থানকে 'ভুল' রূপে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তার প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ মোটেই জরুরী নয়। এ বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরীরা যে বাস্তব আদর্শ রেখে গেছেন তা অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা এ নাযুক সমস্যার কাংখিত সমাধান পেতে পারি। আমাদের পূর্বসূরী আকাবিররা শরীয়ত সম্মত ইজতিহাদের মাধ্যমে এক পক্ষের মতামতকে হয়ত অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী আমল ও আকীদা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাই বলে অপর পক্ষের শানে সামান্যতম অশ্রদ্ধামূলক শব্দ কখনো উচ্চারিত হয় নি তাদের মুখে। বিশেষতঃ মুশাজারাতে ছাহাবার ক্ষেত্রে উলামায়ে উম্মত একদিকে যেমন হযরত আলীর পদক্ষেপকে নির্ভুল এবং প্রতিপক্ষের অবস্থানকে ভুল বলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন, তেমনি অন্যদিকে আলী (রাযি.)-র বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী তালহা, যোবায়র ও মু'আবিয়া (রাযি.)-র প্রতিও সমান আদব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। কেননা তাদের দৃষ্টিতে আলী (রাযি.)-র পদক্ষেপ যেমন নির্ভুল ছিলো তেমনি তাঁর প্রতিপক্ষের ভুল পদক্ষেপও অন্যায় স্বার্থপ্রসূত ছিলো না। ছিলো শরীয়ত সম্মত ইজতিহাদ প্রসূত। আর উসূলশাস্ত্রের সাধারণ ছাত্রও এ কথা জানে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে ভুল ইজতিহাদ কোন অপরাধ নয়। বরং সঠিক সিদ্ধান্ত লাভের শুভ উদ্দেশ্যে-নির্ধারিত মূলনীতি অনুসারে ইজতিহাদ প্রয়োগের পরও ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবশ্যই তিনি পুরস্কারের হকদার হবেন। কেননা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত মুজতাহিদ দু' দফা ছাওয়াবের অধিকারী হবেন। ইজতিহাদ প্রয়োগের ছাওয়াব এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ছাওয়াব। পক্ষান্তরে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত মুজতাহিদ দ্বিতীয় ছাওয়াবটি না পেলেও ইজতিহাদ করার ছাওয়াব অবশ্যই পাবেন।

ছাহাবা কেরামের রাজনৈতিক বিরোধকেও উলামায়ে উম্মত সর্বসম্মতিক্রমে ইজতিহাদ প্রসূত বিরোধ স্বীকার করেছেন। সুতরাং কোন পক্ষেরই ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই।

মোটকথা, 'মুশাজারাতে ছাহাবা'-র ক্ষেত্রে উলামায়ে উম্মত ভুল ও নির্ভুলের ফায়সালা যেমন করেছেন তেমনি সকল ছাহাবার শান ও মান পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখে পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, মুশাজারাতে ছাহাবা বিষয়ে যবান

সংযত রাখাই অধিক নিরাপদ। যুদ্ধকালীন সময়ের ঘটনা বর্ণনা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা মোটেই উচিত নয়।

আকাবিরে দ্বীন ও ছালাফে ছালেহীনের এ সম্পর্কিত মন্তব্য ও মতামত নীচে তুলে ধরা হলো।

وَ اِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুশাজারাতে ছাহাবা প্রসঙ্গ টেনে আল্লামা কুরতবী যে সুদীর্ঘ ও যুক্তি নির্ভর আলোচনা করেছেন তা তাঁর ভাষায় পড়ে দেখুন।

العَاشِرَةُ : لاَ يَجُوْزُ اَنْ يُنْسَبَ الى اَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خَطَاءٌ مَقْطُوْعٌ بِه اِذْ كَانُوا كُلُّهُمْ اجْتَهَدُوْا فِيْمَا فَعَلُوه وَ اَرَادُوْا اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَهُمْ كُلُّهُمْ لَنَا اَئِمَّةٌ وَقَدْ تَعَبَّدْنَا بِالْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، وَ لاَنَذْكُرُهُمْ اِلاَّ بِاَحْسَنِ الذِّكْرِ لِحُرْمَةِ الصُّحْبَةِ وَلِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّهِمْ ، وَ اَنَّ اللهَ غَفَرَ لَهُمْ وَاَخْبَرَ بِالرِّضَاءِ عَنْهُمْ ، هذَا مَعَ مَا قَدْ وَرَدَ مِنَ الاَخْبَارِ مِنْ طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلمَ اَنَّ طَلْحَةَ شَهِيْدٌ يَمْشِى عَلَى وَجْهِ الاَرْضِ ، فَلَوْ كَانَ مَا خَرَجَ اِلَيْه مِنَ الْحَرْبِ عِصْيَانًا لَمْ يَكُنِ الْقَتْلُ فِيْهِ شَهِيْدًا ، وَكَذٰلِكَ لَوْ كَانَ مَا خَرَجَ اِلَيْه خَطَاءً فِى التَّأْوِيْلِ وَتَقْصِيْرًا فِى الْوَاجِبِ عَلَيْه ، لاَنَّ الشَّهَادَةَ لاَ تَكُوْنَ اِلاَّ بِقَتْلٍ فِى طَاعَةٍ ، فَوَجَبَ حَمْلُ اَمْرِهِمْ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذٰلِكَ مَا قَدْ صَحَّ وَانْتَشَرَ مِنْ اَخْبَارِ عَلِيٍّ بِاَنَّ قَاتِلَ الزُّبَيْرِ فِى النَّارِ وَقَوْلُه سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَشِّرْ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ ـ

وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَقَدْ ثَبَتَ اَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ غَيْرُ عَاصِيَيْنِ وَلاَ اٰثِمَيْنِ بِالْقِتَالِ ، لاَنَّ ذٰلِكَ لَوْ كَانَ كَذٰلِكَ لَمْ يَقُلِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى طَلْحَةَ شَهِيْدٌ وَلَمْ يَخْبِرْ اَنَّ قَاتِلَ الزُّبَيْرِ فِى النَّارِ ، وَكَذٰلِكَ مَنْ قَعَدَ غَيْرُ مُخْطِئٍ فِى التَّاوِيْلِ . بَلْ صَوَابٌ اَرَاهُمُ اللهُ بِالاِجْتِهَادِ وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ لَمْ

يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم وابطال فضائلهم وجهادهم وعظيم غنائهم فى الدين رضى الله عنهم وقد سئل بعضهم عن الدماء التى أريقت فيما بينهم فقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون .

وسئل بعضهم عنها أيضا فقال : تلك دماء قد طهر الله منها يدى فلا أخضب بها لسانى يعنى فى التحرز من الوقوع فى خطأ و الحكم على بعضهم بما لا يكون مصيبا فيه قال ابن فورك و من أصحابنا من قال ان سبيل ما جرت بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما جرى بين اخوة يوسف مع يوسف ثم انهم لم يخرجوا بذلك عن حد الولاية والنبوة فكذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة .

وقال المحاسبى : فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم وقد سئل الحسن البصرى عن قتالهم فقال قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلموا وجهلنا و اجتمعوا فاتبعنا ، واختلفوا فوقفنا ، قال المحاسبى : فنحن نقول كما قال الحسن ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا ونتبع ما اجتمعوا عليه ونقف عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأيا منا ونعلم أنهم اجتهدوا و أرادوا الله عزوجل اذ كانوا غير متهمين فى الدين ، ونسأل الله التوفيق .

ছাহাবা কেরাম সকলেই আমাদের মাননীয়। তাঁদের কারো সম্পর্কেই 'নিশ্চিত ভুল করেছেন' বলা বৈধ নয়। কেননা নিজস্ব অবস্থান ও কর্মপন্থা নির্ধারণে তারা ইজতিহাদ করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই ছিলো তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং ছাহাবা অন্তর্বিরোধ প্রসঙ্গে যবানকে সংযত রেখে তাঁদের উত্তম আলোচনা করাই হলো আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ। কেননা ছাহাবীত্বের মর্যাদা সবকিছুর উপরে। তদুপরি তাঁদের মন্দ আলোচনা

করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন যে, আল্লাহ্ তো আগেই তাদের প্রতি মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত তালহা (রাযি.) সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

ان طلحة شهيد يمشى على وجه الأرض

তালহা পৃথিবীর বুকে চলন্ত এক শহীদ।

বিশুদ্ধ সনদে স্বয়ং হযরত আলী (রাযি.) বর্ণিত, অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যোবায়র হত্যাকারীর ঠিকানা হবে জাহান্নাম। হযরত আলী (রাযি.) আরো বলেন—

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, ছুফাইয়ার পুত্রের হত্যাকারীকে জাহান্নামের খোশ খবর দিও।

বলাবাহুল্য যে, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও কর্তব্য নির্ধারণ পূর্বক হযরত আলী (রাযি.)-র বিরুদ্ধে যোবায়ের-তালহার যুদ্ধযাত্রা যদি অন্যায় ও পাপই হতো তাহলে সে যুদ্ধে নিহত হয়ে তালহা যেমন শহীদের মর্যাদা পেতেন না তেমনি যোবায়র হত্যাকারীর ঠিকানাও জাহান্নাম হতো না। কেননা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের পথে জান কোরবান করেই শুধু শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করা যায়। তদ্রূপ জাহান্নামের খোশ খবর সেই শুধু পেতে পারে যার হাত রংগীন হয়েছে হকপন্থী মুজাহিদের খুনে।

সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, হযরত আলীর পদক্ষেপ নির্ভুল হলেও এবং তালহা ও যোবায়ের (রাযি.) ভুল ইজতিহাদের শিকার হলেও তাদের অস্ত্র ধারণ ও যুদ্ধযাত্রা অপরাধ ছিলো না। তাছাড়া এরা দু'জন হলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ হাজার ছাহাবার অন্যতম। এবং তাঁদের জান্নাতী হওয়ার হাদীছ প্রায় 'মুতাওয়াতির' এর স্তরে উন্নীত।

তদ্রূপ যুদ্ধে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনকারী ছাহাবাদের প্রতিও বিচ্যুতির দোষারোপ করা চলে না। বরং শরীয়ত সম্মত ইজতিহাদের মাধ্যমেই নিরপেক্ষ অবস্থানকে তারা সঠিক বিবেচনা করেছিলেন।

মোটকথা, ছাহাবা কেরামের প্রতিটি 'আচরণ ও উচ্চারণ' সম্পর্কে প্রারম্ভে উল্লেখিত আকীদা-বিশ্বাসই আমাদের পোষণ করা উচিত। ফাসেক বলে তাঁদের অভিসম্পাত করা, তাদের গুণ ও মর্যাদা এবং ত্যাগ ও সাধনা অস্বীকার করা এবং তাঁদের সাথে নিঃসম্পর্কতা প্রকাশ করা কোনক্রমেই বৈধ নয়।

ছাহাবা অন্তর্বিরোধের রক্তপাত সম্পর্কে জনৈক শ্রদ্ধেয় আলিমের মতামত

জানতে চাওয়া হলে তিনি শুধু এ আয়াত পড়ে শোনালেন—

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْخَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

সে উম্মত বিগত হয়েছে, তাঁদের কৃতকর্ম তাঁদের, আর তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের। তাঁদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না। একই প্রশ্নের জবাবে অন্য এক আলিম বলেছেন, তাদের রক্তে আল্লাহ্ আমার হাত রঞ্জিত করেন নি, সুতরাং আমার জিহ্বাকে সে রক্তে আর রঞ্জিত করতে চাই না। অর্থাৎ কাওকে নিশ্চিত ভুলকারী সাব্যস্ত করার ভ্রান্তিতে আমি নিপতিত হতে চাই না। হযরত মুহাসেবী (রহ.) বলেন, এ রক্তপাত সম্পর্কে আমাদের কোন মন্তব্য করা খুবই কঠিন। কেননা, তা ঘটেছিলো স্বয়ং ছাহাবা কেরামের মাঝে। এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে হযরত হাছান বছরী (রহ.) বলেছেন—

"এ এমন এক যুদ্ধ যেখানে ছাহাবা কেরাম উপস্থিত ছিলেন, আমরা ছিলাম অনুপস্থিত, পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের অবগতি ছিলো অথচ আমাদের তা নেই। তাঁরা যখন একমত হয়েছেন আমরা তাঁদের অনুগমন করেছি। আর তাঁরা যখন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন আমরা নিরবতা অবলম্বন করেছি।"

হযরত মুহাসেবী বলেন—

"হাছান যা বলেছেন আমরাও তাই বলি। কেননা এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জড়িয়ে পড়া বিষয়ে তাঁরা আমাদের চে' ভাল জানতেন। সুতরাং তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে অনুগমন এবং দ্বিধাবিভক্ত বিষয়ে নিরবতা অবলম্বনই হলো আমাদের অবশ্যকর্তব্য। নিজস্ব তৃতীয় কোন পন্থা উদ্ভাবন আমাদের জন্য কিছুতেই বৈধ নয়। আমাদের নিষ্কম্প বিশ্বাস এই যে, সকলেই তাঁরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইজতিহাদ করেছিলেন। সুতরাং দ্বীনের ক্ষেত্রে সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে তাঁদের অবস্থান।

এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিতে আল্লামা কুরতবী (রহ.) আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ও বিশ্বাসের সর্বোত্তম প্রতিনিধিত্ব করেছেন। উল্লেখিত তালহা-যোবায়র (রাযি.) সম্পর্কিত হাদীছ দু'টি আলোচ্য বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করছে। নাম ধরে ধরে যে দশজন ছাহাবাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে আল্লাহ্র রাসূলের এ দুই প্রাণোৎসর্গী ছাহাবীও শামিল রয়েছেন সেই আশারা মুবাশ্শারার মুবারক জামা'আতে। হযরত উছমানের হত্যাকারীদের কিছাছের দাবীতে হযরত আলীর মুকাবেলায় যুদ্ধে নেমে শহীদ হয়েছিলেন এঁরা উভয়ে। হাদীছ শরীফে তাঁদের শাহাদাতের ভবিষ্যদ্বাণী

করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল। অন্যদিকে হযরত আম্মার বিন ইয়াছির (রাযি.) ছিলেন হযরত আলী (রাযি.)-র জানকবুল যোদ্ধাদের অন্যতম। নব্বই বছরের এই বুড়ো সাহসী যুবকের পূর্ণ বিক্রম নিয়ে লড়েছিলেন হযরত আলীর প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে। তাঁর শাহাদাত সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আল্লাহ্র রাসূল। সঠিকভাবে চিন্তা করলে শাহাদত সম্পর্কিত এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, যুদ্ধের কোন পক্ষই অন্যায় পথে বা সুস্পষ্ট ভুল পথে ছিলো না। বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেই নিজস্ব ইজতিহাদ অনুসরণ করেছেন মাত্র। নতুবা বলাইবাহুল্য যে, এ লড়াই হক ও বাতিলের লড়াই হলে উভয় পক্ষ কিছুতেই শাহাদত সৌভাগ্যের অধিকারী হতো না। অথচ ইরশাদে নববী পরিষ্কার প্রমাণ করছে যে, হযরত তালহা ও যোবায়র (রাযি.) যেমন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন তেমনি হযরত আম্মার বিন য়াসিরের উদ্দেশ্যও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু ছিলো না। সুতরাং তিনিও শহীদ এবং সত্যের পথে নিবেদিত-প্রাণ হওয়ার কারণে তাঁরা সকলেই আমাদের অখণ্ড শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র। আবারও বলছি, দুনিয়ার ক্ষুদ্রস্বার্থ চিন্তা নয়, বরং নিজস্ব ইজতিহাদের আলোকে উম্মাহর কল্যাণ সাধনের শুভ চিন্তাই ছিলো যুদ্ধের উভয় পক্ষের জানমালের এই মহাকুরবানীর পিছনে সক্রিয়। সুতরাং কোন পক্ষেরই মান মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন করার অধিকার নেই আমাদের।

শরহুল মাওয়াকিফ গ্রন্থে আল্লামা সৈয়দ শরীফ জুরজানী (রহ.) লিখেছেন—

وَاَمَّا الْفِتَنِ وَالْحُرُوْبُ الْوَاقِعَةُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَالشَّامِيَةُ اَنْكَرُوْا وُقُوعِهَا وَلَا شَكَّ اَنَّه مُكَابَرَةٌ لِلتَّوَاتُرِ فِى قَتْلِ عُثْمَانَ وَ وَاقِعَةِ الْجَمَلِ وَالصِّفِّيْنِ وَالْمُعْتَرِفُوْنَ بِوُقُوْعِهَا مِنْهُمْ مَنْ سَكَتَ عَنِ الْكَلَامِ فِيْهَا بِتَخْطِيَة اَوْ تَصْوِيْبٍ وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ السُّنَّةِ فَاِنْ اَرَادُوْا اَنَّه اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يَعْنِى فَلَا بَأْسَ بِه اِذْ قَالَ الشَّافِعِىُّ وَغَيْرُه مِنَ السَّلَفِ تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللهُ عَنْهَا اَيْدِيْنَا فَلْنُطَهِّرْ عَنْهَا اَلْسِنَتَنَا الخ (شرح المواقف طبع مصر ص ٣٧٤ ج ٨)

শামিয়া ফেরকা অবশ্য ছাহাবা অন্তর্বিরোধের অস্তিত্বই অস্বীকার করে থাকে। কিন্তু এ হঠকারিতা অর্থহীন। কেননা অসংখ্য বর্ণনা পরম্পরা দ্বারা তা সুপ্রমাণিত। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত ঘটনার সত্যতা অবশ্যই

স্বীকার করে। তবে তাদের একাংশ পূর্ণ নিরবতা অবলম্বনে বিশ্বাসী। কোন পক্ষকেই হক বা নাহক বলতে তারা রাজি নন। অর্থহীন ও নিষ্ফল আলোচনা পরিহার করাই যদি হয় এ নিরবতা পালনের উদ্দেশ্য তাহলে তাদের নীতি যথার্থ সন্দেহ নেই। কেননা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)সহ বহু বরেণ্য আলিম বলেছেন, এ রক্তে আমাদের হাত আল্লাহ্ রঞ্জিত করেন নি। সুতরাং আমাদের জিহ্বাকে তা দ্বারা আর রঞ্জিত করতে চাই না।

আল্লামা শেখ ইবনে হোমাম (রহ.) লিখেছেন—

وَاعْتِقَاد اَهْلِ السُّنَّةِ تَزْكِيَةِ جَمِيْعِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وُجُوْبًا بِاثْبَاتِ الله ذلك لِكُلِّ مِّنْهُمْ وَ الْكَفُّ عَنِ الطَّعْنِ فِيْهِمْ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ كَمَا اَثْنَى اللهُ سُبْحَانَه وَتَعَالى (وَذَكَرَ ايَاتٍ عَدِيْدَةً ثُمَّ قَالَ) وَاَثْنَى عَلَيْهِمُ الرَّسُوْلُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَرَدَ اَحَادِيْثَ الْبَابِ ثُمَّ قَالَ وَمَا جَرى بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَعَلِيٍّ مِنَ الْحُرُوْبِ كَانَ مَبْنِيًا عَلى الاجْتِهَادِ ـ

সকল ছাহাবার সাধুতা ও ন্যায়পরতা বাধ্যতামূলক স্বীকৃতিই হলো আহলে সুন্নতের আকীদা। তদ্রূপ ছাহাবা কেরামের প্রতি কোনরকম দোষারোপ না করা এবং তাদের উদার প্রশংসা করাই হলো আহলে সুন্নতের বৈশিষ্ট। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের সাধুতা ও ন্যায়পরতার সনদ দান করেছেন এবং প্রশংসা করেছেন। (অতঃপর প্রশংসা সম্বলিত কতিপয় আয়াত উল্লেখ করে তিনি বলেন,) আল্লাহ্র রাসূলও তাঁদের প্রশংসা করেছেন। (অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন হাদীছ বর্ণনা করে তিনি বলেন,) হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) এর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ অবশ্যই ইজতিহাদ ভিত্তিক ছিলো।

শরহুল 'আকীদাতিল ওয়াসিতিয়া গ্রন্থে আল্লামা ইবনে তায়মিয়া এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকীদা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

وَيَتَبَرَّؤُوْنَ مِنْ طَرِيْقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِيْنَ يُبْغِضُوْنَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّوْنَهُمْ وَطَرِيْقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ لا عَمَلٍ وَيُمْسِكُوْنَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَيَقُوْلُوْنَ ان هذه الاَثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِى مُسَاوِيْهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبَ ، وَ مِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيْهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ وَجْهه

والصحيحُ مِنهُ ثُمَّ فيه معذُورُونَ اِمَّا مُجتَهِدونَ مُصِيبُونَ وَاِمَّا مُجتَهِدون مُخطِئُونَ وَهُمْ مَعَ ذلكَ لاَ يَعْتَقِدُوْنَ ان كل واحد من الصحابة مَعْصُومٌ مِن كبائِرِ الاِثْمِ وَصغائِرِه بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِم الذُّنوبَ فِى الجُمْلَةِ ، وَ لَهُم مِنَ الفَضَائِلِ وَالسَّوَابِقِ مَا يُوجِبُ مَغفِرة مَا يَصدُرُ مِنْهُم اِن صدر حَتّى اَنَّهم يَغفِرُ لَهُم مِن السَّيِّئَات مَا لاَ يَغفِرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ .

ছাহাবাবিদ্বেষ ও ছাহাবা সমালোচনার কলঙ্ক ধারণকারী রাফেযীদের সাথে এবং (কাজে না হলেও) কথায় আহলে বাইতকে কষ্টদানকারী নাছেবীদের সাথে আহলে সুন্নতের কোন সম্পর্ক নেই। মুশাজারাতে ছাহাবা প্রশ্নে পূর্ণ নিরবতা অবলম্বনকারী আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য এই যে, ছাহাবাদের বিভিন্ন দোষ সম্বলিত বর্ণনাগুলোর কিছু তো নির্জলা মিথ্যা। আর কিছু হলো বিকৃতসত্য। এমনকি বিশুদ্ধ প্রমাণিত বর্ণনাগুলোর ক্ষেত্রেও ছাহাবা কেরাম সম্পূর্ণ নির্দোষ। কেননা উভয় পক্ষই ইজতিহাদ করেছেন। তবে এক পক্ষ সঠিক সিদ্ধান্তে এবং অন্য পক্ষ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাই ইজতিহাদের ছাওয়াব উভয় পক্ষেরই প্রাপ্য। অবশ্য ছাহাবা কেরামকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত কখনই নিষ্পাপ মনে করেন না। বরং সামগ্রিকভাবে তাদের দ্বারাও গুনাহ্ হতে পারে। (এবং হয়েছেও কারো কারো জীবনে) তবে তাদের ফাযায়েল ও মর্যাদা এবং ত্যাগ ও কোরবানী এতই অপরিসীম যে, গুনাহ্ মাগফিরাতের জন্য তা যথেষ্ট। মাগফিরাত লাভের এতসব সুযোগ তাদের রয়েছে যা পরবর্তীদের নেই।

আলোচ্য গ্রন্থে ইমাম ইবনে তায়মিয়া আরো লিখেছেন—

"আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের উপরোল্লেখিত আকীদা ও মৌল বিশ্বাসের খোলাসা কথা এই যে, কোন কোন ছাহাবা সম্পর্কে কথিত দোষ ত্রুটির অধিকাংশই হলো মিথ্যা অপবাদ। আর অবশিষ্টগুলো ছিলো ইজতিহাদের মাধ্যমে শরীয়তের হুকুমরূপে গৃহিত পদক্ষেপ। কিন্তু তাঁদের ইজতিহাদের ভিত্তি ও যুক্তি না জানার কারণে সেগুলো ত্রুটি গণ্য করা হয়েছে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে ইজতিহাদী ভুল দোষের কিছু নয়। এমন কি ইজতিহাদী ভুলের পরিবর্তে ইচ্ছাকৃত অপরাধ বলে স্বীকারও যদি করা হয় তাহলেও মনে রাখতে হবে যে, সেসব অবশ্যই মাফ হয়ে গেছে। হয় তাওবার মাধ্যমে (কেননা বিভিন্ন ঘটনায় তাঁদের অনন্যসাধারণ তাওবার বিবরণ খোদ কোরআন ও সুন্নায় এসেছে।) কিংবা তাদের অসংখ্য ইবাদত ও পুণ্যকর্মের বদৌলতে এমনও হতে পারে যে,

দুনিয়ার বিভিন্ন বিপদ মুছিবত ও কষ্টে নিপতিত করে তাঁদের পাপ মোচন করা হয়েছে। মাগফিরাতের আরো বহু উপায় তাদের ক্ষেত্রে থাকতে পারে। ছাহাবা কেরামের মাগফিরাত সংক্রান্ত আকীদার ভিত্তি এই যে, কোরআন সুন্নাহ্র অকাট্য দলীল দ্বারা সকল ছাহাবার জান্নাতবাসী হওয়া সুপ্রমাণিত। সুতরাং তাদের আমলনামায় জাহান্নামের শাস্তিযোগ্য কোন পাপের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। মোটকথা, এ সত্য সুপ্রমাণিত যে, কোন ছাহাবী জাহান্নামে দাখেল হওয়ার মত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন না। তাই কৃত পাপই হতে পারে জান্নাতের পথে তাদের একমাত্র অন্তরায়। (সুতরাং সেগুলোর মাগফিরাত অবধারিত)।

আশারা মুবাশ্শারা ছাড়া অন্য কোন ছাহাবীকে সুনির্দিষ্টভাবে জান্নাতী বলা সম্ভব নয় বটে। কিন্তু শরীয়তের কোন দলীল ছাড়া 'জান্নাতী নন' বলারও তো অধিকার নেই আমাদের। কেননা কোন সাধারণ মুসলমান সম্পর্কেও নিশ্চিত-ভাবে জাহান্নামী হওয়ার কথা আমরা বলতে পারি না। অথচ তাদের জান্নাতী হওয়ার সাধারণ কোন দলীলও আমাদের হাতে নেই। তাহলে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ জামা'আত ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে এ ধরণের আলোচনা কিভাবে বৈধ হতে পারে ? প্রত্যেক ছাহাবীর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যাবতীয় আচরণ ও ইজতিহাদের বিশদ অবগতি অর্জন আমাদের পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য। আর পরিপূর্ণ ও নির্ভুল অবগতি ছাড়া কারো সম্পর্কে সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য করা সম্পূর্ণ হারাম। তাই মুশাজারাতে ছাহাবা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত প্রদানের পরিবর্তে পূর্ণ নিরবতা অবলম্বনই উত্তম ও নিরাপদ।

অতঃপর আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (রহ.) বিশুদ্ধ সনদে নিম্নোক্ত বর্ণনা পেশ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাযি.) এর মজলিশে হযরত উছমান (রাযি.) এর বিরুদ্ধে এই মর্মে তিনটি অভিযোগ পেশ করা হলো যে, অহুদ যুদ্ধে অন্যান্যদের সাথে তিনিও ময়দান ছেড়ে পালিয়েছিলেন। আর বদর যুদ্ধে ছিলেন অনুপস্থিত। এমনকি বাই'আতে রিযওয়ানেও তিনি শামিল ছিলেন না। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর প্রথম অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে বললেন, কিন্তু আল্লাহ্ তো তাঁর সে ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথচ তোমরা ক্ষমা করতে রাজি নও। আর বদর যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতি তো স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশেই ঘটেছিলো। ফলে বদরী হিসাবে অন্যান্যদের সাথে তিনিও গনীমতের হিস্সা পেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র রাসূলের দূত হিসাবে মক্কায় গিয়ে তাঁর নিহত হওয়ার খবরের কারণেই বাই'আতুর রিযওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। আর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাম হাতকে উছমানের হাত ঘোষণা করে তাঁকে বাই'আতে শরীক রেখেছিলেন। বলো দেখি, উছমান স্বশরীরে

উপস্থিত থেকে বাই'আত হলেও এ অনন্য সৌভাগ্য তিনি কোথায় পেতেন। আল্লাহ্র রাসূলের পবিত্র হাত তো তাঁর হাতের চেয়ে হাজার গুণে উত্তম ছিলো।

ভেবে দেখুন, দু'টি অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে নাকচ করে একটির সত্যতা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু সেই সাথে এ কথাও সাফ বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ ক্ষমা করার পর তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়ে গেছেন। (অতঃপর আল্লামা ইবনে তায়মিয়া বলেন) অন্যান্য ছাহাবার ক্ষেত্রে একই কথা। তাদের নাম জড়িয়ে যত 'দোষ' আলোচিত হয়, দৃশ্যতঃ দোষ হলেও ইজতিহাদের কারণে আসলে সেগুলোও তাঁদের পুণ্য। নতুবা এমন দোষ যা আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন।

الدرالمضية ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে আল্লামা ছাফারেনী (রহ.) যে অনবদ্য আলোচনা পেশ করেছেন তার অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো—

فَانَّه اَىْ التَّخَاصُمُ وَالنِّزَاعُ وَالتَّقَاتُلُ وَالدِّفَاعُ الَّذِىْ جَرٰى بَيْنَهُمْ كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ قَدْ صَدَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ رُؤُوْسِ الْفَرِيْقَيْنِ وَمَقْصَدٌ سَائِغٌ لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ وَ اِنْ كَانَ الْمُصِيبُ فِىْ ذٰلِكَ لِلصَّوَابِ وَاحِدُهُمَا وَهُوَ عَلِى رِضْوَانِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ وَالَاهُ وَالْمُخْطِئُ هُوَ مَنْ نَازَعَه وَعَادَاهُ غَيْرَ اَنَّ لِلْمُخْطِئِ فِى الاجْتِهَادِ اَجْرًا وَ ثَوَابًا خِلَافًا لِاَهْلِ الْجَفَاءِ وَالْعِنَادِ فَكُلُّ مَا صَحَّ مِمَّا جَرٰى بَيْنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ وَجَبَ حَمْلُه عَلٰى وَجْهٍ يَنْفِى عَنْهُمُ الذُّنُوْبَ وَالاٰثَامَ فَمُقَاوَلَةُ عَلِيٍّ مَعَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا لَا تُفْضِى اِلٰى شَيْنٍ وَتَقَاعُدُ عَلِيٍّ عَنْ مُبَايَعَةِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا فِى بَدْءِ الْاَمْرِ كَانَ لِاَحَدِ اَمْرَيْنِ اِمَّا لِعَدَمِ مَشْوَرَتِه كَمَا عَتَبَ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ وَاَمَّا وُقُوْفًا مَعَ خَاطِرِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِ فَاطِمَةَ الْبَتُوْلِ مِمَّا ظَنَّتْ اَنَّه لَهَا وَلَيْسَ الْاَمْرُ كَمَا هُنَالِكَ ثُمَّ اِنَّ عَلِيًّا بَايَعَ الصِّدِّيْقَ رضى الله عنهما عَلٰى رُؤُوْسِ الْاَشْهَادِ فَاتَّحَدَتِ الْكَلِمَةُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَحَصَلَ الْمُرَادُ وَتَوَقُّفُ عَلِيٍّ عَنِ الاقْتِصَاصِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ اِمَّا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْقَتْلِ وَاِمَّا خَشْيَةَ تَزَايُدِ الْفَسَادِ وَالطُّغْيَانِ وَ كَانَتْ عَائِشَةُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَمُعَاوِيَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مَا

بَيْنَ مُجْتَهِدٍ وَمُقَلِّدٍ فِى جَوَازِ مُحَارَبَةِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا أَبِى الْحُسَيْنِ الْاَنْزَعِ الْبَطِيْنِ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ .

وَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ أَنَّ الْمُصِيْبَ فِى تِلْكَ الْحُرُوْبِ وَالتَّنَازُعِ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَلَا تَدَافُعٍ .

وَالْحَقُّ الَّذِى لَيْسَ عَنْهُ نُزُوْلٌ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ عُدُوْلٌ ، لِاَنَّهُمْ مُتَأَوِّلُوْنَ فِىْ تِلْكَ الْمُخَاصَمَاتِ مُجْتَهِدُوْنَ فِى هَاتِيْكَ الْمُقَاتَلَاتِ فَاِنَّهُ وَاِنْ كَانَ الْحَقُّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ وَاحِدًا فَالْمُخْطِئُ مَعَ بَذْلِ الْوُسْعِ وَعَدَمِ التَّقْصِيْرِ مَأْجُوْرٌ لَا مَأْزُوْرٌ .

وَسَبَبُ تِلْكَ الْحُرُوْبِ اشْتِبَاهُ الْقَضَايَا فَلِشِدَّةِ اشْتِبَاهِهَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُهُمْ وَصَارُوْا ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قِسْمٌ أَظْهَرَ لَهُمْ اجْتِهَادُهُمْ أَنَّ الْحَقَّ فِى هٰذَا الطَّرَفِ وَأَنَّ مُخَالِفَهُ بَاغٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ نُصْرَةُ الْمُحِقِّ وَقِتَالُ الْبَاغِىْ عَلَيْهِ فِيْمَا اعْتَقَدُوْهُ فَفَعَلُوْا ذٰلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ هٰذَا صِفَتُهُ ، التَّأَخُّرُ عَنْ مُسَاعَدَةِ الْاِمَامِ الْعَادِلِ فِى قِتَالِ الْبُغَاةِ فِى اعْتِقَادِهِمْ وَقِسْمٌ عَكْسُهُ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَقِسْمٌ ثَالِثٌ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِمُ الْقَضِيَّةُ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ تَرْجِيْحُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَاعْتَزَلُوا الْفَرِيْقَيْنِ وَكَانَ هٰذَا الْاِعْتِزَالُ هُوَ الْوَاجِبَ فِى حَقِّهِمْ لِاَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْاِقْدَامُ عَلٰى قِتَالِ مُسْلِمٍ حَتّٰى يَظْهَرَ مَا يُوْجِبُ ذٰلِكَ وَالْجُمْلَةُ فَكُلُّهُمْ مَعْذُوْرُوْنَ وَمَأْجُوْرُوْنَ لَا مَأْزُوْرُوْنَ وَلِهٰذَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِى الْاِجْمَاعِ عَلٰى قَبُوْلِ شَهَادَتِهِمْ وَرِوَايَاتِهِمْ وَثُبُوْتِ عَدَالَتِهِمْ وَلِهٰذَا كَانَ عُلَمَاؤُنَا كَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَمِنْهُمْ ابْنُ حَمْدَانَ فِى نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِيْنَ يُوْجِبُوْنَ حُبَّ كُلِّ الصَّحَابَةِ وَالْكَفُّ عَمَّا جَرٰى بَيْنَهُمْ كِتَابَةً وَقِرَاءَةً وَاِقْرَاءً وَسَمَاعًا وَتَسْمِيْعًا ، وَيَجِبُ ذِكْرُ مَحَاسِنِهِمْ وَالتَّرَاضِىْ

عَنْهُمْ وَالْمَحَبَّةُ لَهُمْ وَتَرْكُ التَّحَامُلِ عَلَيْهِمْ وَاعْتِقَادُ الْعُذْرِ لَهُمْ وَاَنَّهُمْ اِنَّمَا فَعَلُوْا مَا فَعَلُوا بِاجْتِهَادٍ سَائِغٍ لَا يُوْجِبُ كُفْرًا وَلَا فِسْقًا بَلْ وَرُبَّمَا يُثَابُوْنَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ اجْتِهَادٌ سَائِغٌ قِتَالٌ وَقِيْلَ : وَالْمُصِيْبُ عَلِيٌّ وَمَنْ قَاتَلَهُ فَخَطَاهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَ اِنَّمَا نَهٰى عَنِ الْخَوْضِ فِىْ النَّظْمِ (اَىْ فِى نَظْمِ الْعَقِيْدَةِ عَنْ الْخَوْضِ فِىْ مُشَاجِرَاتِ الصَّحَابَةِ) لِاَنَّ الْاِمَامَ اَحْمَدَ كَانَ يُنْكِرُ عَلٰى مَنْ خَاضَ وَيُسَلِّمُ اَحَادِيْثَ الْفَضَائِلِ وَقَدْ تَبَرَّاَ مِمَّنْ ضَلَّلَهُمْ اَوْ كَفَّرَهُمْ وَقَالَ : السُّكُوْتُ عَمَّا جَرٰى بَيْنَهُمْ ـ (شرح عقائد سفارنى ص ٣٨٦ ج ٢)

ছাহাবা কেরামের অন্তর্বিরোধকে কেন্দ্র করে যত ঘটনাই ঘটেছে উভয় তরফের নেতৃস্থানীয় ছাহাবা কেরামের ইজতিহাদই ছিলো সেগুলোর ভিত্তি এবং সবারই উদ্দেশ্য ছিলো শুভ। তবে একথা অবশ্যই সত্য যে, হযরত আলী (রাযি.) ও তাঁর অনুগামী পক্ষের ইজতিহাদই ছিলো সঠিক ও নির্ভুল। পক্ষান্তরে তার মুকাবেলায় অস্ত্র ধারণকারীরা ছিলেন ভুল ইজতিহাদের স্বীকার। তবে ভুল হলেও মুজতাহিদের প্রাপ্য একটি ছাওয়াব অবশ্যই তাঁরা পেয়ে যাবেন। হঠকারী ও অবাধ্য লোকেরাই শুধু এ পরিচ্ছন্ন আকীদা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। সুতরাং ছাহাবা বিরোধ সম্পর্কিত কোন বর্ণনা বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে অবশ্যই তাঁদের নির্দোষিতা মূলক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পেশ করতে হবে। এ আলোকেই আমরা বলি, হযরত আলী ও আব্বাস (রাযি.) এর বিতর্ক কারো জন্যই দোষের নয়। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাযি.)-র হাতে হযরত আলীর বাই'আত গ্রহণে বিলম্বের কারণ এই হতে পারে যে, পরামর্শে তাকে শরীক না করায় তিনি মনক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। সেই সাথে হযরত ফাতেমা (রাযি.)-র মনোকষ্টও লাঘব করতে চেয়েছিলেন তিনি। কেননা কন্যা হিসাবে নিজেকে তিনি পিতার মিরাছের হকদার ভাবছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযি.)-র কাছে এই মর্মে হাদীছ ছিলো যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পদে উত্তরাধিকারী চলে না। অবশ্য যথা সময়ে হযরত আলী (রাযি.) প্রকাশ্য মজলিসেই বাই'আত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর রহমতে উম্মতের পূর্ণ ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যমেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিলো।

তদ্রূপ উছমান হত্যার কেছাছ গ্রহণে হযরত আলী (রাযি.)-এর দ্বিধার কারণ শরীয়ত সম্মত প্রমাণের অভাব যেমন হতে পারে তেমনি হতে পারে

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের আগে পদক্ষেপ গ্রহণে অধিকতর গোলযোগের আশংকা। পক্ষান্তরে অপরিহার্য দ্বীনী কর্তব্য মনে করে হযরত আলীর বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধারণ করেছিলেন,[১] তাদের একাংশ ছিলেন মুজতাহিদ এবং অপরাংশ ছিলেন ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাদের অনুসারী ও মুকাল্লিদ।

সত্যপন্থী আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নীতি ও অবস্থান গ্রহণের ইজতিহাদে হযরত আলী (রাযি.)-র নির্ভুলতা[২] যেমন অনস্বীকার্য সত্য তেমনি এ সত্যও অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই যে, সকল ছাহাবা কেরাম ছিলেন 'আদিল, বিশ্বস্ত ও ন্যায়পর। কেননা সকলেই তারা ইজতিহাদ অনুসরণ করেছিলেন। আর সত্য লাভের আন্তরিক চেষ্টার পর কারো ইজতিহাদ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও তিনি ছাওয়াব ও পুরস্কার লাভেরই হকদার হবেন। গোনাহ্‌গার হতে পারেন না কিছুতেই।

বস্তুতঃ ঘটনা ও পরিস্থিতির মারাত্মক জটিলতা ও অস্পষ্টতাই ছিলো ছাহাবা কেরামের অন্তর্বিরোধ ও সশস্ত্র সংঘর্ষের মূল কারণ। যার ফলে তাঁদের ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত হয়ে পড়েছিলো ত্রীমুখী। একদলের ইজতিহাদ তাঁদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিলো যে, অমুক বৈধ ইমাম। সুতরাং তার প্রতিপক্ষ বিদ্রোহের অপরাধী আর শরীয়তের বিধান মুতাবিক বৈধ ইমামের আনুগত্য গ্রহণ এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ হলো অপরিহার্য কর্তব্য। বলাবাহুল্য যে, পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও ঈমানী সাহসিকতার সাথেই সে দায়িত্ব তাঁরা আঞ্জাম দিয়েছেন। কেননা হক নাহক পরিস্কার হয়ে যাওয়ার পর ইমামের সাহায্য করা এবং বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জিহাদে বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রদর্শনের কোন অবকাশ ছিলো না। ইজতিহাদকারী দ্বিতীয় পক্ষ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। সংখ্যায় ছাহাবা কেরামের তৃতীয় পক্ষটিও কম বড় ছিলো না। পরিস্থিতি এতই জটিল ও গুরুতর ছিলো যে, তাদের পক্ষে নির্দ্বিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সম্ভবপর হয় নি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হক নাহক তাদের সামনে পরিষ্কার না হওয়ায় শরীয়তের নির্দেশ হিসাবেই পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করতে হয়েছিলো তাদের। কেননা শরীয়তের হক ছাড়া মুসলমানের জন্য কোন মুসলমানের রক্ত হালাল হতে পারে না। মোটকথা, গৃহিত পদক্ষেপের অনুকূলে ইজতিহাদের কৈফিয়ত ছিলো বিধায়

---

[১] হযরত আয়েশা, তালহা, যোবায়ের, মু'আবিয়া (রাযি.) ও তাদের অনুগামী ছাহাবা কেরাম।

[২] মনে রাখতে হবে যে, ঘটনাবলীর পরবর্তী ফলাফল চোখের সামনে ছিলো বলে ভুল-নির্ভুল নির্ধারণ করা পরবর্তীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। পক্ষান্তরে মুজতাহিদ ছাহাবাদের দৃষ্টি পথে ঘটনার পরবর্তী ফলাফল বিদ্যমান ছিলো না। তাই পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইজতিহাদ প্রয়োগ করেই তাদেরকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছিলো।

প্রত্যেকেই তাঁরা আজর ও ছাওয়াবের হকদার। অন্যায়কারী বা গুনাহ্‌গার কেউ নন। একারণেই সকল ছাহাবার 'আদালত ও ন্যায়পরতা অনস্বীকার্য এবং তাদের সাক্ষ্য ও বর্ণনা অবশ্যই গ্রহণীয় বলে উল্লেখযোগ্য সকল হকপন্থী আলেম সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আমাদের দেশের ও অন্যান্য অঞ্চলের আলিমগণ (বিশেষতঃ ইবনে হামদান) বলেছেন, সকল ছাহাবা কেরামের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করা অবশ্যকর্তব্য এবং অন্তর্বিরোধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী নাড়াচাড়া করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং দোষারোপ ও সমালোচনার পরিবর্তে কৃতার্থ চিত্তে তাঁদের প্রশংসা ও গুণালোচনা অতীব জরুরী। সেই সাথে এ আকীদা পোষণ করাও জরুরী যে, তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিলো শরীয়ত স্বীকৃত ইজতিহাদের ভিত্তিতে। সুতরাং তাঁদের কারো ক্ষেত্রে কাফির বা ফাসেক হওয়ার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। বরং ভুল ইজতিহাদকারীও এক দরজা ছাওয়াব পাবেন অবশ্যই।

এমনও বলা হয়েছে যে, হযরত আলী (রাযি.) নির্ভুল ছিলেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকারীদের ভুল ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। 'মুশাজারাতে ছাহাবা' বিষয়ক আলোচনায় নিষেধাজ্ঞার কারণ এই যে, ঈমাম আহমদ (রহ.) তীব্রভাবে তা অপছন্দ করতেন এবং ছাহাবামর্যাদা-বিষয়ক হাদীছের আলোকে তাদের সাথে তিনি নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করতেন, যারা ছাহাবাদের কাফির, ফাসেক বা ভ্রষ্ট মনে করে। তিনি বলতেন, ছাহাবা বিরোধের ক্ষেত্রে নিরবতা অবলম্বনই সর্বাধিক নিরাপদ।

মোটকথা, ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের আকীদা-বিশ্বাস ও মতামতের যে সংক্ষিপ্ত সংকলন পেশ করা হলো তাতে দেখা যায়, সর্বযুগের উলামায়ে উম্মতের ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো ঃ

১। সকল ছাহাবা কেরাম 'আদিল ও ন্যায়পর। তাঁদের 'আদালত ও ন্যায়পরতায় সন্দেহ প্রকাশের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

২। ছাহাবা বিরোধের মর্মান্তিক ঘটনাবলী আলোচনার পরিবর্তে নিরবতা অবলম্বন করাই নিরাপদ। তাঁদের শান ও মান ক্ষুণ্ন করে এমন কোন শব্দ উচ্চারণ করা কোনক্রমেই বৈধ নয়।

নিষ্পাপ নন তবে ক্ষমা ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত

উলামায়ে উম্মত এ বিষয়েও পূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, নবী রাসূলদের মত মাসুম ও নিষ্পাপ ছাহাবা কেরাম ছিলেন না। ভুল-বিচ্যুতির

বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা তাঁদের জীবনেও ঘটতে পারে। ঘটেছেও। হাদীছের বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে তাঁদের কারো কারো উপর ইসলামের শাস্তি বিধানও জারী করেছেন আল্লাহ্‌র রাসূল। তবে কয়েকটি বিশেষ কারণে সাধারণ উম্মতের তুলনায় ছাহাবা কেরাম এ ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সাহচর্যগুণে শরীয়তকে আল্লাহ্ পাক তাঁদের স্বভাবধর্মে পরিণত করেছিলেন। ফলে শরীয়তবিরোধী কোন 'আচরণ' বা 'উচ্চারণ' তাঁদের জীবনে ছিলো অসম্ভব প্রায়। আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টি লাভে দ্বীনের পথে জানমাল ও পুত্র-পরিবার-পরিজন কোরবান করার যে বিস্ময়কর ইতিহাস তারা সৃষ্টি করেছেন তার নযীর অতীতের পৃথিবী যেমন দেখে নি, ভবিষ্যতের পৃথিবীও তেমনি দেখবে না কোনদিন। তাঁদের সারা জীবনের এই ধারাবাহিক পুণ্য ও সাধুতা এবং গুণ ও মর্যাদা সহজেই মুছে দিতে পারে দু' একটি পাপ-দুর্ঘটনা।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্-ভীতি হৃদয়ে তাঁদের এমনই প্রবল ছিলো যে, কোন পাপ-দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া মাত্র অস্থিরচিত্তে তাওবায় মশগুল হতেন তাঁরা। তাতেও অশান্ত মন তাঁদের স্বস্তি পেতো না। দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্ ছাড়া যে দুর্ঘটনার কথা কারোই জানা ছিলো না, দরবারে নববীতে সে কথাই তাঁরা অকপটে স্বীকার করতেন এবং কঠিনতম শাস্তির জন্য নিজেকে পেশ করে দিতেন। আর হাদীছ মতে মাকবুল তাওবার কারণে আমলনামা থেকে পাপ এমনভাবে মুছে যায়, যেন তার অস্তিত্বই ছিলো না কখনো।

তৃতীয়তঃ আল কোরআনের ইরশাদ মুতাবেক নেক আমলও পাপ মোচন করে থাকে। আর ছাহাবা কেরামের জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসই তো ছিলো ইবাদত ও পুণ্যকর্মে পরিপূর্ণ। তদুপরি তাঁদের একেকটি পুণ্য আমাদের সারাজীবনের সকল পুণ্যের চেয়ে দামী ছিলো আল্লাহ্‌র দরবারে। হাদীছ মতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাঁদের সামান্য দান আমাদের অহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দানের চেয়েও দামী।

চতুর্থতঃ আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে চরম দুঃখকষ্ট ও অভাবঅনটন তাঁরা সহ্য করেছেন। বিভিন্ন যুদ্ধে, বিভিন্ন সংকটে যে অভাবনীয় ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের যে অনন্য দৃষ্টান্ত তারা পেশ করেছেন বিশ্বের কোন জাতির ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

পঞ্চমতঃ উম্মত ও রাসূলের মাঝে ছাহাবা কেরামই হলেন একমাত্র যোগসূত্র। কালামুল্লাহ্ ও কালামুররাসূল তাঁদের মাধ্যমেই লাভ করেছে পরবর্তী উম্মত। সুতরাং এ মাধ্যম যদি ত্রুটিপূর্ণ হতো তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের

হিফাযত এবং বিশ্বব্যাপী দাওয়াত সম্ভব হতো না কিছুতেই ; বরং নববী যুগ পর্যন্তই সংকুচিত হতো এর পরিধি। এজন্যই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের ছোহবত ও তারবিয়াতের মাধ্যমে তাঁদের জীবন ও চরিত্রকে শরীয়তের ছাঁচে এমনভাবে ঢেলে দিয়েছিলেন যে, পাপ-বিচ্যুতির দুর্ঘটনা তাঁদের জীবনে ছিলো একান্তই বিরল। সে ক্ষেত্রেও তাৎক্ষণিক তাওবা ইসতিগফারে তাঁরা মশগুল হয়ে যেতেন এবং আল্লাহ্‌র পথে অধিকতর মেহনত মুজাহাদার মাধ্যমে সে ত্রুটির প্রতিকারে লেগে যেতেন। এটাই ছিলো ছাহাবা যুগের সুপরিচিত স্বভাব-বৈশিষ্ট।

ষষ্ঠতঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী ও সেবক এবং আসমানী শরীয়তের ধারক ও বাহক হিসাবে এই বিশেষ সম্মান ও মর্যাদাও আল্লাহ্ তাদের দান করেছেন যে, যাবতীয় পাপ-বিচ্যুতি ক্ষমা পূর্বক তাদের প্রতি সাধারণ সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ নাযিল করেছেন।

সপ্তমতঃ উম্মতকে ছাহাবা-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন যে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ। পক্ষান্তরে তাঁদের অবমাননা ও সমালোচনা ঈমান নষ্টের এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের মনঃকষ্টের কারণ।

এসকল বৈশিষ্টের প্রেক্ষিতেই ছাহাবা কেরামের অনিষ্পাপতা (এবং তাঁদের জীবনে পাপ-বিচ্যুতির দুর্ঘটনার বিরল অস্তিত্ব) সত্ত্বেও উম্মত সর্বসম্মতভাবে এই আকীদা স্থির করেছে যে, তাঁদেরকে পাপী বলার কিংবা বিন্দুমাত্র অবমাননা করার অধিকার নেই পরবর্তীদের। তদ্রূপ অন্তর্বিরোধের মর্মান্তিক ঘটনায় যদিও হযরত আলী নির্ভুল অবস্থানে এবং তাঁর প্রতিপক্ষরা ভুল অবস্থানে ছিলেন কিন্তু উলামায়ে উম্মত এ মর্মেও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, তাঁদের সে ভুলগুলো ছিল ইজতিহাদভিত্তিক। সুতরাং তাঁরা নির্দোষ, নিরপরাধ। এমনকি বিশুদ্ধ হাদীছ মতে ভুল ইজতিহাদের জন্যও রয়েছে এক দফা আজর ও ছাওয়াব। তদুপরি যুদ্ধ ও রক্তপাতের চরম গোলযোগপূর্ণ মুহূর্তে সত্যি সত্যি যদি তাদের কারো দ্বারা কোন অন্যায় ও পদস্খলন ঘটে থাকে তাহলে তাঁদের স্বভাব-চরিত্র এবং কোরআন ও সুন্নাহর ঘোষণার আলোকে আস্থার সাথেই বলা যায় যে, কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অবশ্যই তারা তাওবা করেছিলেন। কেননা, উভয় পক্ষের বহু ছাহাবারই বিভিন্ন অনুতাপ বাক্য আমরা দেখতে পাই ইতিহাসের পাতায়। দু' একটি নমুনা সামনে আসছে।

সর্বোপরি আল-কোরআনে আল্লাহ্ পাক তাঁদের প্রশংসাপূর্বক সাধারণ সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়ে নাযিল করেছেন বিভিন্ন আয়াত। আর বলাইবাহুল্য যে, ক্ষমা ও মাগফিরাতের তুলনায় রিযা ও সন্তুষ্টি হচ্ছে মর্যাদার বহু উচ্চতর স্তর।

সুতরাং যাদের দুর্ঘটনাজনিত গোনাহও মাফ হয়ে গেছে আল্লাহ্র দরবারে, তাঁদের শানে মুখ খুলে বেআদবী করার কি অধিকার আছে আমাদের ? এই পাপ আলোচনা দ্বারা নিজেদের আমলনামা বরবাদ করা এবং ছাহাবা জামা'আতের প্রতি উম্মতের অটুট আস্থায় ফাটল ধরিয়ে দ্বীনের মূলে কুঠারাঘাত করার পরিণতি কাল হাশরে কত ভয়ঙ্কর হবে তা ভেবে দেখা কি আমাদের উচিত নয় ? এ কারণেই আকাবিরে দ্বীন ও ছালাফে ছালেহীন ছাহাবা অন্তর্বিরোধ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে নিরবতা অবলম্বনকেই দ্বীন ও ঈমানের জন্য নিরাপদ বলে রায় দিয়েছেন। ইতিহাসের আপত্তিকর বর্ণনা সম্পর্কে সে ধারণা পোষণ করাই আমাদের কর্তব্য যা العقيدة الواسطية গ্রন্থে আল্লামা ইবনে তায়মিয়া উলামায়ে উম্মতের প্রতিনিধিরূপে পেশ করেছেন। অর্থাৎ—

রাফেযী, খারেজী ও মুনাফিক চক্রের ইতিহাস বর্ণনা সর্বাংশে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তবে বিশুদ্ধ প্রমাণিত কতিপয় অভিযোগ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, শরীয়ত নির্দেশিত ইজতিহাদের আলোকে উম্মতের অপরিহার্য প্রয়োজন মনে করেই নিজ নিজ পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং কারো ইজতিহাদ ভুল হলেও পাপী বা অপরাধী তিনি নন। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ইজতিহাদী ভুলের পরিবর্তে পাপ বা অপরাধ স্বীকার করে নিলেও তাঁদের আখেরাত-চিন্তা ও আল্লাহ্-ভীতির আলোকে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অবশ্যই তাঁরা তাওবা করে নিয়েছেন। কিংবা তাদের সারা জীবনের নেকী ও কোরবানীর বদৌলতে তাওবা ছাড়াই সেগুলো মাফ হয়ে গেছে।

কোন কোন শ্রদ্ধেয় আলেম অবশ্য রাফেযী, খারেজী ও মুনাফিক চক্রকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে 'মুশাজারাতে ছাহাবা' প্রসংগে তথ্যানুসন্ধানমূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং ইতিহাসের সকল জালিয়াতি চিহ্নিত করে বাস্তব সত্য তুলে ধরেছেন। উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে তাঁদের প্রয়াস ধন্যবাদযোগ্য হলেও এ কথা বলতেই হবে যে, ইতিহাসের এ পিচ্ছিল পথের সফর মোটেই নিরাপদ নয়। তাই আকাবিরে উম্মত এ ধরণের অভিযাত্রাকে বিশেষ উৎসাহ যোগান নি কখনো।

ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে আকাবিরেদ্বীন ও ছালাফে ছালেহীনের মতামতের অতি সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ নীচে তুলে ধরা হলো ঃ

১। ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাযি.) বলেছেন—

"তারা ছিলেন পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, স্বভাব ও চরিত্রে সর্বোত্তম এবং আল্লাহ্র নির্বাচিত বান্দা। অবশ্যই তাঁদের কদর সম্মান করা উচিত।

২। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরের সামনে উত্থাপিত তিনটি অভিযোগের একটি সত্য ছিলো। কিন্তু হযরত ইবনে উমর (রাযি.) 'আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন' বলে হযরত উছমানের সমালোচনাকারীকে উল্টা ধমক দিয়েছেন।

৩। তাবেয়ী শ্রেষ্ঠ হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল ছাহাবাকে সিরাতুল মুসতাকীমে অবিচল এবং পরবর্তী উম্মতের আদর্শ বলে অভিহিত করেছেন।

৪। মর্মান্তিক ছাহাবা অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে হযরত হাসান বছরী (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি পরিস্কার জবাব দিয়েছেন, "এ বিরোধের উভয় তরফে মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবাগণ উপস্থিত ছিলেন, অথচ আমরা ছিলাম অনুপস্থিত। (প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে) তাঁদের অবহিতি ছিলো। অথচ আমাদের তা নেই। সুতরাং যে বিষয়ে তাঁরা সর্বসম্মত সে বিষয়ে আমরা তাদের অনুগামী। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে তারা দ্বিধাবিভক্ত সে বিষয়ে আমরা নিরব।

৫। হযরত মুহাসেবী (রহ.) বলেছেন, আমরাও হাছান বছরীর কথাই বলি। অর্থাৎ গৃহিত পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে তাঁরা আমাদের চেয়ে ভালো জানতেন। সুতরাং তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে আমরা অনুগমন করবো। পক্ষান্তরে তাঁদের দ্বিধাবিভক্তির ক্ষেত্রে আমরা পূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করবো। কিছুতেই তৃতীয় পন্থা উদ্ভাবন করবো না। কেননা আমরা নিশ্চিতই জানি যে, ইজতিহাদই ছিলো তাঁদের সকল কর্মের ভিত্তি এবং আল্লাহ্র আদেশ পালনই ছিলো তাঁদের উদ্দেশ্য। সুতরাং দ্বীনের বিষয়ে তাঁরা মোটেই সন্দেহের পাত্র নন।

৬। মুশাজারাতে ছাহাবা প্রসঙ্গ সযত্নে পরিহার করার উপদেশ দিয়ে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন, তাঁদের রক্তে নিজেদের জিহ্বা রঞ্জিত করা আমাদের উচিত নয়।

৭। কতিপয় ছাহাবার সমালোচনাকারী এক ব্যক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে والذين معه থেকে ليغيظ بهم الكفار পর্যন্ত আয়াত তিলাওয়াত করে হযরত ইমাম মালেক বললেন, যার অন্তরে কোন ছাহাবীর প্রতি বিদ্বেষ থাকবে সে উপরোক্ত আয়াতের নাগালে এসে ঈমানের খাতরায় পড়ে যাবে। হযরত ইমাম মালেক আরো বলেছেন, ছাহাবা সমালোচনার অন্তরালে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের সমালোচনা করা। কিন্তু অতটা দুঃসাহস না থাকায় ছাহাবা সমালোচনাকেই মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে। কেননা তাতে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্র রাসূলই মন্দ মানুষ ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ্)। তিনি উত্তম মানুষ হলে তাঁর ছাহাবারাও উত্তম মানুষ হতেন।

৮। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মতে ছাহাবা কেরামের সমালোচনা, অবমাননা ও দোষারোপ কোন মুসলমানের জন্যই বৈধ নয়। এ ধরনের অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান অবশ্য কর্তব্য। তিনি আরো বলেছেন, যে কোন ছাহাবীর সমালোচনাকারীর ঈমান সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ পোষণ করবে।

৯। ইবরাহীম বিন মাইসারা বলেন, হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয সারা জীবনে একবার একজনকেই শুধু দোররা মেরেছেন। ছাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-র সমালোচনা ছিলো তার অপরাধ।

১০। ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম আবু যোর'আ ইরাকী (রহ.) বলেছেন, ছাহাবা-সমালোচনাকারীকে নিঃসন্দেহে যিন্দিক ধরে নিতে পারো। কোরআন-সুন্নাহ্র প্রতি উম্মতের আস্থা বিনষ্ট করাই তার মতলব। সুতরাং তাকে যিন্দিক ও ভ্রষ্টরূপে চিহ্নিত করে রাখাই সমীচীন।

বস্তুতঃ এটাই হলো উম্মতের সর্বসম্মত আকীদা ও মৌল বিশ্বাস। বিভিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্যে ইতিপূর্বে আমরা তা প্রমাণ করে এসেছি। সুতরাং এ আকীদা ও বিশ্বাসের সীমারেখা লঙ্ঘন করা কোন মুসলমানের জন্যই বৈধ নয়।

আবারো বলছি, মর্মান্তিক ছাহাবা অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে ছাহাবা কেরাম, তাবেঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, ছাহাবা কেরাম যে পরিস্থিতি ও ঘটনা প্রবাহের সম্মুখীন হয়েছিলেন, যেহেতু তার বিশদ চিত্র আমাদের সামনে নেই এবং যেহেতু তাঁদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ সেহেতু আমাদের অবশ্যকর্তব্য হলো, তাদের সকলকে মাগফুর মাকবুল* মনে করা এবং তাঁদের 'শান ও মান' ক্ষুণ্ন করে এমন কোন কথা উচ্চারণ না করা। কেননা তাঁদেরকে কষ্ট দেয়ার অর্থ হলো খোদ আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়া। বলাবাহুল্য যে, এমন নাযুক ও সংবেদনশীল ক্ষেত্রে জ্ঞান ও গবেষণার অহংবোধে যারা তাড়িত হয় এবং ছাহাবা সমালোচনার কসরত প্রদর্শন করে তারা সত্যই বড় বদনসীব। বড় দুর্ভাগা।

নাস্তিক ও প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের অভিযোগের জবাব

ছাহাবা অন্তর্বিরোধ প্রসঙ্গে গবেষণায় আত্মনিয়োগকারী মিশরীয় ও পাকভারত উপমহাদেশীয় লেখক গবেষকদের সম্ভবতঃ উদ্দেশ্য ছিলো নাস্তিক ও প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের বিভিন্ন অভিযোগের জবাব পেশ করা।

---

* ক্ষমাপ্রাপ্ত ও প্রিয়।

এ বাস্তব সত্য অনস্বীকার্য যে, পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় শিক্ষার অনুপস্থিতি এবং নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার মুসলিম উম্মাহর এক বিরাট অংশকে ইসলামের আহকাম ও 'আকায়েদ থেকে আজ বহু দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও মুসলিম মন-মানসের মাঝে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছে অপরিচয়ের এক দুর্লংঘ্য প্রাচীর। ছাহাবা কেরামসহ মহান পূর্বসূরীদের আদব শ্রদ্ধা তাঁদের কাছে আজ অর্থহীন শব্দ ছাড়া কিছুই নয়। যাঁদের মাধ্যম ছাড়া, ত্যাগ ও কোরবানী ছাড়া দ্বীন ও শরীয়তের এ মহান উত্তরাধিকার লাভ করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিলো না, তাঁদের লাগামহীন ও অন্ধ সমালোচনারই নাম হয়েছে এখন মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা। বিভিন্নমুখী হামলার মাধ্যমে উম্মাহকে গোমরাহীর অতলান্ধকারে নিক্ষেপ করার অপচেষ্টায় তৎপর প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদরা এই দুর্বলতাকেই সুবর্ণ সুযোগরূপে কাজে লাগাতে শুরু করেছে। ছাহাবা চরিত্রে কলংক লেপনের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি উম্মাহ্র আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বুনিয়াদে ফাটল ধরানোই হলো তাদের উদ্দেশ্য। কেননা ছাহাবা কেরামের প্রতি উম্মাহ্র আস্থাই হলো সকল ধর্মহীনতার পথে একমাত্র অন্তরায়। এই অশুভ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ইসলামী ইতিহাস গবেষণায় তারা হাত দিয়েছে এবং শিয়া, রাফেযী ও খারেজী চক্রের চিহ্নিত বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে ছাহাবা চরিত্রের এক মহাকলঙ্কিত রূপ মানুষের সামনে তারা তুলে ধরেছে যা বর্তমান যুগের ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতাদেরও হার মানায়। এদিকে নিজ ঘরের সম্পদ সম্পর্কে বেখবর এবং ইসলামী আহকাম ও আকায়েদ সম্পর্কে অজ্ঞ আধুনিক শিক্ষিত সমাজ শত্রু পরিবেশিত এই অভিনব তথ্য-চিত্রকে মহাসত্যরূপে গ্রহণ করেছে। ফলে ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে সেই ধারণাই তাদের মাঝে বদ্ধমূল হতে চলেছে, যা শত্রুদের এতদিনের কামনা ছিল।

এই অশুভ চক্রান্তের প্রতিরোধকল্পে কতিপয় মুসলিম লেখক গবেষকও ইসলামী ইতিহাসের জটিল গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন। স্বীকার করতে বাধা নেই যে, নিঃসন্দেহে এটা ইসলামের অতি বড় এক খেদমত যা কালামশাস্ত্রের ইমামগণ প্রাচীনকাল থেকেই অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। কিন্তু দুঃখের সাথেই বলতে হয় যে, এমন নাযুক ও স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে গোড়াতেই তারা মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। ফলে ছাহাবা চরিত্র হননে শত্রুদের যে অপপ্রয়াস এতদিন তেমন সফলতার মুখ দেখে নি, তথাকথিত মুসলিম গবেষকদের হাতে সেটাই ষোলকলায় পূর্ন হয়ে উঠেছে। কেননা সচেতন মুসলিম সমাজ ইসলামের চিহ্নিত শত্রু হিসাবে প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের কথায় কর্ণপাত না করলেও এদের

'মুসলিম' পরিচয় দ্বারা দারুণভাবে প্রতারিত হচ্ছে।

সেই বুনিয়াদী গলদ এই যে, কোন ব্যক্তির জীবন ও চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য ইসলামের নিজস্ব কিছু নীতিমালা রয়েছে, যা শরীয়ত ও যুক্তি উভয় বিচারেই অপরিহার্য। এই ইসলামী মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন অভিযোগ উত্থাপন শরীয়তের দৃষ্টিতে খুবই বড় অপরাধ। এমনকি অতি বড় জালিমের বিরুদ্ধেও বিনা প্রমাণে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আরোপের বৈধতা ইসলামে নেই। কুখ্যাত জালিম হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে অভিযোগ উত্থাপনকারীকে সতর্ক করে জনৈক বুজুর্গ বলেছিলেন, দেখো, জালিম হাজ্জাজ থেকে যেমন লাখো মজলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ্ গ্রহণ করবেন তেমনি হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারী থেকেও আল্লাহ্ হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। রাব্বুল আলামীনের ইনসাফ ও ন্যায়বিচার জালিমের বিরুদ্ধেও যথেচ্ছা অপবাদ আরোপ বরদাশত করে না।

এমনকি কাফেরের ক্ষেত্রেও ইসলাম বিচার পর্যালোচনার স্বীকৃত নীতিমালার বাইরে যেতে রাজি নয়। তাহলে রাসূলের পুণ্য সংস্পর্শে জীবন গড়েছেন যারা, ঈমান ও সত্যের পথে জান কোরবান করেছেন যারা, দুনিয়াতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ লাভে ধন্য হয়েছেন যারা, তাঁদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কতিপয় ঐতিহাসিক বর্ণনার সূত্র ধরে বে-লাগাম সমালোচনা ইসলামের ইনসাফ ও সুবিচার কিভাবে বরদাশ্‌ত করতে পারে ?

ইসলামের চিহ্নিত শত্রু প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদরা আরো জঘন্য কিছু করলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু দুঃখ হয় তথাকথিত মুসলিম 'গবেষকদের' জন্য যারা শত্রুকে প্রতিহত করার অজুহাতে এই রক্ত পিচ্ছিল মাঠে নেমেছিলেন। অথচ ছাহাবা প্রসঙ্গে বিচার পর্যালোচনার ইসলামী নীতিমালা উপেক্ষা করে শত্রুদের সুপরিকল্পিত পথেই তারা অগ্রসর হয়েছেন। অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের মত তারাও বিচার বিশ্লেষণের ইসলামী মানদণ্ডে অনুত্তীর্ণ ভিত্তিহীন ইতিহাস বর্ণনাকে পুঁজি করে ছাহাবা চরিত্রে কলংক লেপনের কলংক ধারণ করেছেন। অথচ ছাহাবা-চরিতের বলতে গেলে সিংহভাগই হল হাদীছে রাসূলের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা বিচার-বিশ্লেষণের সর্বোচ্চ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়ে হাদীছশাস্ত্রে সংকলিত হয়েছে। আল-কোরআনেও উল্লেখিত হয়েছে এক বিরাট অংশ। কেননা, বিভিন্ন ছাহাবার বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। তাছাড়া কোরআনী আহকাম ও বিধান সমগ্র উম্মাহর জন্য সার্বজনীন হলেও ছাহাবা কেরামই হলেন এর প্রথম ও প্রত্যক্ষ সম্বোধন-পাত্র। সুতরাং তাঁদের বহু জীবন-ঘটনাই বিভিন্ন আয়াতের নিহিত বিষয়বস্তু রূপে সংরক্ষিত রয়েছে। মোটকথা,

ছাহাবা কেরামের জীবন-চরিত আহরণের একটি উৎস হলো আল-কোরআন এবং বিচার বিশ্লেষণের সর্বোচ্চ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হাদীছে রাসূল। আরেকটি মাধ্যম হলো ইতিহাসের কাহিনী সম্ভার, আর ইতিহাসশাস্ত্রের ইমামদেরই স্বীকৃতি মতে সনদের বিশুদ্ধতা ও রাবীর নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষার হাদীছশাস্ত্রীয় কঠোর নীতিমালা তাতে অনুসৃত হয় নি। কেননা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সবল-দুর্বল ও সত্যমিথ্যা সকল বর্ণনা বিশ্বস্ততার সাথে পরিবেশন করাই হলো একজন ইতিহাস সংকলকের প্রধান দায়িত্ব। এমনকি নিজস্ব মতাদর্শের অনুকূল বা প্রতিকূল উভয় বর্ণনার ক্ষেত্রেই তাকে হতে হয় সমান আগ্রহী। এখন আমরা জানতে চাই যে, কোন ছাহাবা-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ইতিহাসের এই পাঁচমেশালী* বর্ণনা যদি কোরআন-সুন্নাহর বিপরীত ধারণা ও ভাবমূর্তি পেশ করে তাহলে কোন যুক্তিতে অপ্রমাণ্য ইতিহাস কোরআন-সুন্নাহর অকাট্য সিদ্ধান্তের মুকাবেলায় প্রাধান্য পাবে ? এরই নাম কি ইনসাফ ও যুক্তিপ্রেম ?!

এটা ভক্তি ও ভাবাবেগের তাড়না কিংবা অন্ধ ছাহাবা-প্রেমের অভিপ্রকাশ নয়, বরং ইনসাফ ও যুক্তির দাবী। অমুসলিম প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ও তাদের অনুগামীদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে যদি দু' তরফা তথ্যবর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে একদিকে বর্ণনার সনদ ও সূত্র, এমনকি তার ভাষা ও শব্দ পর্যন্ত পূর্ণরূপে সংরক্ষিত ও অপরিবর্তিত এবং বর্ণনাকারীরা বিচার-বিশ্লেষণের কঠিনতম মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। পক্ষান্তরে অন্যদিকের অধিকাংশ তথ্যবর্ণনাই হলো সনদ ও সূত্রবিহীন কিংবা বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা পর্যালোচনা করা হয় নি এমন। ভাষা ও শব্দের অপরিবর্তিতার প্রতিও যত্ন নেয়া হয় নি তেমন। এমতাবস্থায় কোন ধরণের তথ্য বর্ণনাকে তারা তাদের গবেষণার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করবেন ?

ইনসাফ ও যুক্তি নামে কোন 'পদার্থ' এখনো যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে আসুন এক কাজ করা যাক, অন্তর্বিরোধে জড়িত উভয় পক্ষের নেতৃস্থানীয় ছাহাবা কেরামের জীবন চরিত ও ঘটনাবলী শাস্ত্রীয় বিচার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়ে হাদীছ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আবার ইতিহাস গ্রন্থেও নির্বিচারে কিছু ঘটনা স্থান পেয়েছে। এবার আপনি উভয় বর্ণনা পৃথকভাবে পড়ুন এবং নিজেই বলুন, হাদীছের বর্ণনা সম্ভার উভয় পক্ষের ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে কী ধারণ ও ভাবমূর্তি তুলে ধরছে আর তার বিপরীতে ইতিহাসের বর্ণনা সম্ভারই বা কোন চিত্র পেশ করছে ? আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, ইনসাফপ্রিয় মানুষ মাত্রই স্বীকার করবেন যে,

* অর্থাৎ সবল-দুর্বল, সত্য-মিথ্যা নির্বিশেষে যাবতীয় বর্ণনা।

হাদীছের বর্ণনায় কোন ছাহাবীর কোন 'ত্রুটি' আলোচনায় আসলেও তাতে তাদের শান ও মর্যাদা মোটেও ক্ষুণ্ন হয় না। হৃদয়ের আস্থা ও শ্রদ্ধায়ও কোন ফাটল ধরে না। পক্ষান্তরে ইতিহাসের বর্ণনা থেকে অন্তত এক পক্ষের ছাহাবা কেরামকে অবশ্যই ক্ষমতালিপ্সু, যুদ্ধোন্মাদ ও জালিম মনে হবে যে কোন পাঠকের। আর প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের উদ্দেশ্যও তাই। অর্থাৎ সকল ছাহাবার ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও অন্তত কিছু ছাহাবাকে অনির্ভরযোগ্য ও অনাদর্শ প্রমাণ করে উম্মতের আকীদাগত অটুট ঐক্যকে তছনছ করে দেয়া। এই মতলব সিদ্ধির জন্যই কোরআন সুন্নাহ্‌র আয়াত ও রেওয়ায়াত উপেক্ষা করে অনির্ভরযোগ্য ইতিহাসের সাহায্যে সাহাবা চরিত্রের কলঙ্কিত রূপ তারা তুলে ধরেছে। তাদের কাজ তারা করেছে। সে জন্য আমাদের বিশেষ অভিযোগ নেই। কিন্তু তথাকথিত মুসলিম গবেষগদের আচরণে অবশ্যই আমরা ব্যথিত ও মর্মাহত। কেননা ইসলামের ন্যায়ানুগ সমালোচনারীতি উপেক্ষা করে তারাও ইতিহাসের নির্বিচার আলোচনায় লিপ্ত হয়েছেন এবং সে আলোকে ছাহাবা চরিত্র নিরূপণের অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। অথচ কোরআন সুন্নাহ তাঁদের সাধুতা, ন্যায়পরতা ও আস্থাযোগ্যতার সনদ দান করেছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং এ কথাও প্রমাণ করেছে যে, কোন পাপ-দুর্ঘটনা তাঁদের জীবনে ঘটে থাকলেও তার উপর তারা বহাল থাকেন নি। বরং সাথে সাথে অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ে তাওবা করে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়েছেন। সুতরাং ভিত্তিহীন ইতিহাসের সাহায্যে ছাহাবাদের সমালোচনার পাত্র বানানো ইসলাম বিরোধী যেমন তেমনি ইনছাফ ও যুক্তিরও বিরোধী।

ছাহাবা অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে উম্মতের ইজমা ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে আমরা পেশ করে এসেছি যে, এ বিষয়ে নিরবতাই হলো নিরাপদ। সুতরাং এতদসংক্রান্ত ইতিহাস নিছক ইতিহাস হিসাবেও আলোচনা করা উচিত নয়।

পুনরুক্তি দোষ সত্ত্বেও ব্যথিত হৃদয়ে আবারো বলছি, ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে উম্মতের এ আকীদা-বিশ্বাস নিছক অন্ধভক্তি কিংবা অনুসন্ধান-নিস্পৃহতা প্রসূত নয়। কেননা রাসূল ও তাঁর উম্মতের মাঝে আল্লাহ্‌র নির্বাচিত একমাত্র যোগসূত্র হিসাবে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতেই তারা হলেন অনন্য-সাধারণ মর্যাদার অধিকারী। তদুপরি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবত ও তারবিয়াতগুণে বিশ্বাস, কর্ম, স্বভাব ও চরিত্র এক কথায় তাঁদের 'জীবন সমগ্রে' এমন অভাবিতপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিলো যে, 'অনিষ্পাপতা' সত্ত্বেও পাপের স্পর্শ থেকে মুক্ত ছিলো তাঁদের জীবনের প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস।

আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি তাঁদের প্রাণোৎসর্গিতা এবং দ্বীনের পথে কোরবানী এমনই অকল্পনীয় ছিলো যে, ইসলামের শত্রুরা পর্যন্ত অবাক বিস্ময়ে তা স্বীকার না করে পারে নি। তাঁদের সম্পর্কে আপত্তিযোগ্য যেসকল 'আচরণ ও উচ্চারণ' কথিত আছে তার বেশীর ভাগই হলো বাহাই, রাফেযী ও খারেজী চক্রের কল্পনা প্রসূত। আর কিছু অংশ দৃশ্যতঃ শরীয়ত বিরোধী হলেও মূলতঃ শরীয়তের উপর আমল করারই ভিন্নরূপ মাত্র, যা তাঁরা শরীয়তী ইজতিহাদের মাধ্যমেই নির্ধারণ করেছিলেন। এই ইজতিহাদ প্রয়োগে তাঁদের ভুল হলেও সেটা তাঁদের পাপ বা অপরাধ নয়। বরং হাদীছের পরিষ্কার ঘোষণা মতে ভুল ইজতিহাদের জন্যও তাঁরা এক দফা ছাওয়াব লাভ করবেন।

এমনকি ভুল ইজতিহাদের পরিবর্তে পরিস্কার পাপ বা অন্যায়ও যদি তাঁদের দ্বারা হয়ে থাকে তাহলেও তা এতই বিরল যে, সারা জীবনের নেকী ও কোরবানীর মুকাবেলায় তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ তাদের প্রবল আল্লাহ্‌ভীতি ও অন্তর্জ্যোতির প্রেক্ষিতে বলাইবাহুল্য যে, উক্ত পাপ বা অন্যায়ের উপর নিশ্চয় তারা বহাল থাকেন নি। বরং অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ে তাওবা করে নিয়েছেন। তাতেও যদি কারো আশ্বস্তি না হয় তাহলে আমাদের শেষ কথা এই যে, তাদের ইবাদত ও মুজাহাদা এবং নেকী ও কোরবানীর বরকতে তাওবা ছাড়াই তা মাফ হয়ে গেছে এবং এই সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা আল্লাহ্‌র রিযা ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দানের মাধ্যমেই আল-কোরআনেও এসেছে। এমতাবস্থায় ইনসাফ ও যুক্তির স্বাভাবিক দাবী কি এটাই নয় যে, ইতিহাসের বর্ণনাগুলোর যাবতীয় দোষমুক্ততা স্বীকার করে নিলেও কোরআন সুন্নাহ্‌র আয়াত ও রেওয়ায়াতের মুকাবেলায় তা অবশ্যই বর্জনীয় হবে ?

চরম যুদ্ধমুহূর্তেও ছাহাবা কেরামের সংযম

ছাহাবা কেরাম হচ্ছেন আল্লাহ্‌ভীরু এমন এক মোকাদ্দাস জামা'আত যারা তাদের কৃত বৈধ কর্মগুলোর জন্যই শুধু নয়, বরং ইবাদত ও পুণ্যকর্মগুলোর ব্যাপারেও আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন যে, না জানি কোন্ ত্রুটির কারণে আল্লাহ্‌র দরবারে আমার ইবাদত না মঞ্জুর হয়। তাই যখনই তারা নিজেদের ইজতিহাদী ভুল বুঝতে পারতেন তখনই অনুশোচনার সাথে তা স্বীকার করে নেওয়া এবং ইসতিগফারে লিপ্ত হওয়া ছিলো তাদের স্বভাবজাত। ছাহাবা অন্তর্বিরোধের মর্মান্তিক ঘটনায় যে পক্ষ উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে হকের উপর ছিলেন এবং হকের দাবীতে মজবুত হয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করেছিলেন এবং যুদ্ধে জয়ীও হয়েছিলেন, তাদের মুখেও কখনো বিজয়ের হাসি ফুটে নি,

গর্বের কোন শব্দ উচ্চারিত হয় নি, বরং প্রতিপক্ষকেও তাঁরা আল্লাহ্‌র পথে অবিচল নিস্বার্থ মানুষ মনে করতেন। আর মনে করতেন, আমাদের এ ভাইয়েরা ভুল ইজতিহাদের শিকার। তবে শত আফসোস ও মর্মবেদনা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে আমরা নাচার। তদ্রূপ ছাহাবাদের যে বিরাট জামা'আত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদেরকেও তারা মাযুর মনে করতেন। এমন কি মুসলমানদের রক্তে হাত রঞ্জিত না করে থাকতে পারার কারণে তাঁদের সঈর্ষ প্রশংসা করতেন। নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলোকে আমাদের দাবীর সমর্থনে যথেষ্ট বলে মনে করি।

১। হযরত উছমান (রাযি.)-এর বিরুদ্ধে আরোপিত যে কয়টি অভিযোগকে তিনি বাস্তবানুগ বলে বুঝতে পেরেছিলেন প্রকাশ্য তাওবার মাধ্যমে তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।—শারহুল আকীদাতিল ওয়াসিতিয়া

২। হযরত তালহা (রাযি.) একথা মনে করে সর্বদা অনুতাপ প্রকাশ করতেন যে, হযরত উছমানকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তাঁর ত্রুটি হয়েছে।—প্রাগুক্ত

৩। হযরত যোবায়র (রাযি.) আফসোস করে বলতেন, হায়! সেই সফর যদি কখনো না করতাম যার পরিণতিতে জামাল যুদ্ধের ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিলো।—প্রাগুক্ত

৪। নীতি ও অবস্থানের ক্ষেত্রে হকের উপর থাকা সত্ত্বেও হযরত আলী (রাযি.) ঘটে যাওয়া বহু ঘটনার ব্যাপারে অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন।

হযরত আলী (রাযি.) সম্পর্কে নিজস্ব সনদে হযরত ইসহাক বিন রাহ্‌ওয়ে বর্ণনা করেছেন। জামাল ও সিফফীন যুদ্ধে কাওকে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি-মূলক কথা বলতে শুনলে বাধা দিয়ে তিনি বলতেন, তাদেরকে মন্দ বলো না, কেননা, তারা আমাদেরকে আর আমরা তাদেরকে বিদ্রোহী মনে করার কারণেই পরস্পর লড়াই করছি।

জামাল ও ছিফফীন যুদ্ধে নিহতদের পরিণতি সম্পর্কে হযরত আলী (রাযি.)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি জবাব দিলেন—

لَايَمُوْتَنَّ اَحَدٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ وَقَلْبُهٗ تَقِيٌّ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

উভয় পক্ষের যে কেউ পবিত্র হৃদয় নিয়ে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সিফফীন যুদ্ধকালে রাতের নির্জনতায় বেদনাহত হৃদয়ে বারবার হযরত আলী (রাযি.) বলতেন, যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের নীতি গ্রহণ করে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর ও ছা'আদ বিন মালিক বড় নিরাপদ অবস্থানে আছেন। কেননা,

তাঁদের এ নীতি যদি নির্ভুল ইজতিহাদের মাধ্যমে গৃহিত হয়ে থাকে তাহলে তাদের বিরাট আজর ও বিনিময় প্রাপ্তিতে সন্দেহের অবকাশই নেই। পক্ষান্তরে তাদের ইজতিহাদ ভুল হলেও এবং যুদ্ধ থেকে সরে থাকা গুনাহ হলেও তাদের অপরাধ খুবই লঘু বিবেচিত হবে। কেননা মুসলমানের খুনে তাদের হাত রাংগা হয় নি। হযরত হাসান (রাযি.)-কে লক্ষ্য করে প্রায় তিনি বলতেন,

يَا حَسَنُ يَا حَسَنُ مَا ظَنَّ اَبُوْكَ اَنَّ الاَمْرَ يَبْلُغُ اِلٰى هٰذَا وَدَّ اَبُوْكَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ هٰذَا بِعِشْرِيْنَ سَنَةً ـ

হাসান! হে হাসান! তোমার বাবার কল্পনাতেও ছিলো না যে ব্যাপার এতটা ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে গড়াবে। হায়! এ ধরণের ঘটনার বিশ বছর আগেই যদি তোমার বাবা মরে যেতো।

সিফফীন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর সাথীদের তিনি উপদেশ দিয়ে বলতেন,

اَيُّهَا النَّاسُ لَا تَكْرَهُوْا اِمَارَةَ مُعَاوِيَةَ فَاِنَّكُمْ لَوْ فَقَدْتُمُوْهُ رَاَيْتُمُ الرُّؤُوْسَ تَنْدُرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا كَاَنَّمَا الْحَنْظَلَ ـ

মু'আবিয়ার শাসনকে তোমরা খারাপ নজরে দেখো না। কেননা তিনি যখন দুনিয়ায় থাকবেন না তখন তোমরা দেখতে পাবে, ধরগুলো মুণ্ড থেকে 'হান্‌জাল' ফলের মতই কেটে পড়ে যাচ্ছে।

তাবরানী কৃত মু'জামে কবীর গ্রন্থে তালহা বিন মাছরীফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, জামাল যুদ্ধে হযরত আলী (রাযি.)-এর যোদ্ধাদের হাতে হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ্ শহীদ হলেন। হযরত আলী (রাযি.) তার প্রাণহীন দেহ পড়ে থাকতে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে তাকে তুলে নিলেন এবং মুখমণ্ডল থেকে ধুলো পরিষ্কার করতে করতে আক্ষেপের স্বরে বললেন, হায়! এঘটনার বিশ বছর আগেই যদি আমার মৃত্যু হতো। নিজস্ব সনদে বাইহাকীতে বর্ণিত আছে, জামাল যুদ্ধে বিপক্ষে অস্ত্রধারণকারীদের সম্পর্কে হযরত আলী (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এই লোকেরা কি মুশরিক ? হযরত আলী (রাযি.) জবাবে বললেন, শিরক থেকে বাঁচার জন্যই তো এরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, তবে কি তারা মুনাফিক ? জবাবে তিনি বললেন,

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ـ

মুনাফিকরা তো আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে থাকে। (কিন্তু এদের তো সর্বক্ষণই কাটে আল্লাহ্‌র স্মরণে।)

জিজ্ঞাসা করা হলো, এরা তাহলে কী ? তিনি বললেন, এরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী আপন ভাই। সুনানে বাইহাকীতেই আরেকটি বর্ণনা এসেছে হযরত রাবঈ বিন খারাশের মাধ্যমে, হযরত আলী (রাযি.) বলেছেন—

اِنِّىْ لَاَرْجُوا اَنْ اَكُوْنَ وَطَلْحَةُ والزُّبَيْرُ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ (سنن بيهقى)

আমার আশা যে কেয়ামতের দিন আমি তালহা ও যোবায়ের তাদের দলে হবো যাদের সম্পর্কে আল-কোরআনে বলা হয়েছে—জান্নাতে তাদের হৃদয় থেকে পরস্পরের প্রতি ক্ষোভ বের করে দেয়া হবে।

৬। অন্য দিকে হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি প্রায় বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম! আলী আমার চেয়ে বহুগুণে উত্তম। তাঁর সাথে আমার মতবিরোধ শুধু হযরত উছমানের কিছাছের দাবীতে। তিনি নিজেই যদি হযরত উছমানের কিছাছ গ্রহন করেন তবে সিরিয়ায় সবার আগে আমিই তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করবো।

৭। হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর কাছে হযরত আলী (রাযি.)-এর শাহাদতের খবর পৌঁছা মাত্র তিঁনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। হতবাক স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, জীবদ্দশায় তো তাঁর বিরুদ্ধে লড়ছিলেন, এখন যে কাঁদছেন ? হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) বললেন, তুমি তো জানো না, তাঁর মৃত্যুতে ইলম ও ফিকাহ্‌র কত বড় সম্পদ এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলো।

৮। যাররার ছাদাইকে একবার মু'আবিয়া (রাযি.) বললেন, হযরত আলীর কিছু গুণ বর্ণনা করো। তিঁনি তখন আবেগদীপ্ত ভাষায় হযরত আলী (রাযি.)-এর অসাধারণ গুণ বর্ণনা করলেন। হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) তখন ভাবাপ্লুত স্বরে বললেন, আবুল হাসান (আলী)-কে আল্লাহ্ করুণা করুন। সত্যি তিনি এরূপই ছিলেন।

৯। মুসলিম উম্মাহর গৃহযুদ্ধের সুযোগে রোম সম্রাট ইসলামী খেলাফতের সীমান্তে হামলার পায়তারা শুরু করলো। সংবাদ অবগত হওয়া মাত্র রোম সম্রাটের নামে এই মর্মে তিনি হুঁশিয়ারিপত্র পাঠালেন।

সত্যি সত্যি যদি এমন অশুভ তৎপরতায় তুমি নেমে আসো, তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! এই মুহূর্তে আমি আমার সাথী (হযরত আলীর) সাথে সমঝোতা

করে নেবো। অতঃপর তোমার বিরুদ্ধে তার যে লশ্‌কর রওয়ানা হবে তার অগ্রভাগে শামিল হয়ে কনষ্টান্টিপোলকে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তোমার হুকুমতের শিকড় উপড়ে ফেলব।

১০। কতিপয় ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে সিফফীন ও অন্যান্য যুদ্ধের সময় দিনে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হতো এবং রাতে এক বাহিনীর লোকজন অন্য বাহিনীর শিবিরে গিয়ে নিহতদের দাফন-কাফনে সহায়তা করতো।

মোটকথা, যেসকল ছাহাবা শরীয়তের নির্দেশ মনে করে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং নিজ নিজ ইজতিহাদের ভিত্তিতে নিজেদেরকে হক এবং প্রতিপক্ষকে নাহক মনে করার কারণে লড়াই করতে বাধ্য ছিলেন, তাঁরা চরম যুদ্ধমুহূর্তেও শরীয়তের সীমারেখা কখনো লঙ্ঘন করেন নি। আর ফিতনা ও গোলযোগ স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর তাদের পারস্পরিক আচরণও সৌহার্দপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। এবং একপক্ষের হাতে অন্যপক্ষের জানমালের যে ক্ষতি হয়েছিলো যদিও তা শরীয়তের নির্দেশিত ইজতিহাদের ভিত্তিতেই হয়েছিলো, তবু সেজন্য কোন পক্ষেরই আফসোসের অন্ত ছিলো না।

ইতিহাসের এসকল ঘটনা-দুর্ঘটনাগুলো সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই এই মুকাদ্দাস জামা'আতের হৃদয়ের পবিত্রতা এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি আন্তরিকতা এবং কৃত ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে তাদের অনুতাপ-অনুশোচনার কথা যেহেতু আল্লাহ্ পাক জানতেন সেহেতু আগে থেকেই সকল ছাহাবার প্রতি সাধারণ সন্তুষ্টির এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছিলেন। বলাবাহুল্য যে, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের এ সুসংবাদ এ কথারই সুস্পষ্ট দলীল যে, তাঁদের দ্বারা আসলেও যদি কোন গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে তবে তার উপর তাঁরা বহাল থাকেন নি, বরং অবশ্যই তাওবা করে নিয়েছেন এবং তাঁদের আমলনামা থেকে তা মুছে ফেলা হয়েছে।

কতই না আফসোসের বিষয় যে, ইসলামের খেদমতের দাবীদার কোন কোন লেখক, গবেষক এই পরম সত্যকে উপেক্ষা করে প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের অনুসৃত কন্টকাকীর্ণ ভ্রান্ত পথে চলাকেই পছন্দ করে নিয়েছেন এবং ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা বর্ণনার উপর ভর করে বিভিন্ন অভিযোগ অপবাদ দ্বারা ছাহাবা কেরামের সুমহান ব্যক্তিত্বকে ক্ষতবিক্ষত করার আত্মঘাতী খেলায় মেতে উঠেছেন। পরম সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহ্ যাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এই নির্দয় লোকেরা তাঁদের ক্ষমা করতে রাজি নয়। আল্লাহ্ ও রাসূল যাদের ভালবেসেছেন, তাঁদের এরা ভালবাসতে রাজি নয়।

এ ধরনের আচরণ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তাঁরা এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে

করে যে, যাবতীয় তথ্য বর্ণনা আমরা তো ঐসকল আলিম ও মুহাদ্দিসদের গ্রন্থ থেকেই সংগ্রহ করেছি, যাদের আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে উম্মতের কারোই কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু ভদ্র লোকেরা এ কথাটা ভেবেও দেখলেন না যে, কথিত আলিম ও মুহাদ্দিসরা ইতিহাসশাস্ত্রকে হাদীছশাস্ত্র থেকে পৃথক কেন করেছিলেন ? বলাবাহুল্য যে, হাদীছশাস্ত্রের জন্য বিচার-বিশ্লেষণের যে কঠোর মানদণ্ড তারা নির্ধারণ করেছিলেন ইতিহাসশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সে মানদণ্ড তারা বজায় রাখেন নি। কেননা ইতিহাসে সনদের প্রয়োজনীয়তা যেমন অপরিহার্য নয় তেমনি বর্ণনাকারীদের জীবন চরিত পরীক্ষা করাও জরুরী নয়। কেননা তাঁদের দৃষ্টিতে বর্ণনা সম্ভার এজন্য নয় যে, তা দ্বারা আহকাম ও আকায়েদ প্রমাণ করা হবে কিংবা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবন ও চরিত্র পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মানদণ্ড-রূপে ব্যবহৃত হবে। ছাহাবা কেরামের বিষয় তো অনেক বড়। ইতিহাসের কোন সাধারণ ব্যক্তিত্বকে পর্যন্ত বিচার পর্যালোচনা ছাড়া কোন ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে বিশেষ অভিযোগে অভিযুক্ত করার বা ফাসিক ও অধার্মিক আখ্যা দেয়ার কোন অধিকার নেই। সুতরাং ছাহাবা চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণে কি পরিমাণ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত আশা করি তা আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় যে কথাটা যুক্তি-প্রমাণের আলোকে পরিষ্কার ভাষায় আমরা বলে এসেছি সে কথাটাই পুনরুক্তির দোষ স্বীকার করে নিয়েই সংক্ষেপে আবার বলা জরুরী মনে করছি। ছাহাবা কেরামের জীবন ও চরিত্র বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইতিহাসকে গ্রহণ না করার অর্থ এ নয় যে, জীবন ও জগতের কোন ক্ষেত্রেই ইতিহাস নির্ভরযোগ্য নয়। কিংবা ইসলামের দৃষ্টিতে ইতিহাসের কোন মূল্যই নেই, না তা নয়। ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তাকে ইসলাম বরং গুরুত্বের সাথেই স্বীকার করে থাকে। ইতিহাসকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞান সম্মতশাস্ত্রের মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য উলামায়ে ইসলাম যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন সেটাই ইসলামের দৃষ্টিতে ইতিহাসের মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে প্রতিটি শাস্ত্রেরই নিজস্ব গণ্ডী ও সীমারেখা রয়েছে। তা লঙ্ঘন করার অধিকার নেই কোন শাস্ত্রের। ইতিহাসেরও রয়েছে নিজস্ব গণ্ডী ও সীমারেখা। বলাবাহুল্য যে, কোরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিবরণ উপেক্ষা করে ঐতিহাসিক বর্ণনার মাপকাঠিতে ছাহাবা কেরামের জীবন ও চরিত্রের স্বরূপ নির্ধারণ কিংবা তাঁর উপর শরীয়তের আহকাম ও আকায়েদের বুনিয়াদ স্থাপন ইতিহাসের নির্ধারিত সীমারেখার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ছাড়া আর কিছু নয়। এমন নিরংকুশ ধর্মীয় মর্যাদা ইতিহাসের কিছুতেই প্রাপ্য নয়। মোটকথা, হাদীছ ও ফিকাহশাস্ত্রের ইমামদের রচিত চিকিৎসাগ্রন্থের কোন কথা বা মন্তব্য দ্বারা যেমন কোন বস্তুর

হালাল-হারাম বা পাক-নাপাক নির্ধারণ করা বৈধ নয়, তেমনি তাঁদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থ দ্বারা শরীয়তের কোন আহকাম বা আকায়েদ প্রমাণ করা বৈধ নয়। কেননা তা চিকিৎসা ও ইতিহাসশাস্ত্রের গণ্ডীবহির্ভূত বিষয়।

ইতিহাস ও ছাহাবা অন্তর্বিরোধ

এ বাস্তব সত্যকেও এখানে অস্বীকার করা উচিত নয় যে, বিগত যুগের সাধারণ ঘটনাবলী এবং সাধারণ ব্যক্তিবর্গের আলোচনায় ইতিহাসের উপর যতটা নির্ভর করা সম্ভব, ছাহাবা অন্তর্বিরোধ সংক্রান্ত আলোচনায় এসে ইতিহাসের উপর সেই পরিমাণ নির্ভরতাও বজায় রাখা সম্ভব নয়। কেননা ছাহাবা অন্তর্বিরোধ যেভাবে যুদ্ধ ও রক্তপাত পর্যন্ত গড়িয়েছিলো তাতে মুনাফিক সাবাঈ চক্রের কুটিল চক্রান্তই ছিলো মূলতঃ দায়ী। এই সাবাঈ চক্রান্তের ফলশ্রুতিতে এমনকি ছাহাবা যুগেই রাফেযী ও খারেজী ফেরকা দু'টি আত্মপ্রকাশ করেছিলো। বলাবাহুল্য যে, ছাহাবাবিদ্বেষই ছিলো ফেরকা দু'টির উৎপত্তির বুনিয়াদ। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে মুনাফিকরা যেমন সকল কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে ও সাজ-পোশাকে মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থাকতো, তেমনি ছাহাবাযুগেও ছাহাবা বিদ্বেষী চক্র সাধারণ মুসলমানদের মাঝেই মিলেমিশে থাকতো। বর্তমান যুগে প্রত্যেক ফেরকার যেমন স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে, স্বতন্ত্র হাদীছ ও ফেকাহগ্রন্থ রয়েছে এবং প্রতিটি কর্মে ও পর্বে আহলে সুন্নত ওয়ালা জামা'আতের সাথে দর্শনীয় পার্থক্য রয়েছে, সে যুগে অবস্থা তেমন ছিলো না। মুসলিম উম্মাহ্‌র সকল শ্রেণী ও স্তরে তারা এমনভাবে মিলেমিশে ছিলো যে, তাদের চিহ্নিত করার কোন উপায় ছিলো না। ফলে দৃশ্যতঃ ধার্মিকতা ও আস্থাযোগ্যতার কারণে খুব সহজেই তাদের বর্ণনা সত্য বলে গ্রহন করে নেয়া হতো। লুকিয়ে থাকা মুনাফিকদের মিথ্যাচারে বিশ্বাস করে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত হওয়ার কথা একটি তাফসীর মতে খোদ আল-কোরআনেও উল্লেখিত হয়েছে। এভাবে মুনাফিক, রাফেযী ও খারেজীদের জাল বর্ণনা বহু নির্ভরযোগ্য মুসলমানের মুখেও আস্থা ও নির্ভরতার সাথে আলোচিত হতে শুরু করেছিলো। যেহেতু ব্যাপার হাদীছে রাসূলের ছিলো না সেহেতু কোন বর্ণনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এবং সনদের চূড়ান্ত বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করা হয় নি। ফলে রাফেজী খারেজীদের বহু জাল বর্ণনা ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে এমনভাবে মিশে গেছে যে, সেগুলোকে চিহ্নিত করার এখন আর কোনই উপায় নেই। ফিতনা ও গোলযোগের নৈরাজ্যপূর্ণ সময়ে গুজব ও অপপ্রচার সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে তারা অবশ্যই জানেন যে, কোন শহরে সৃষ্ট গোলযোগ সম্পর্কে খোদ শহরের নির্ভরযোগ্য

লোকদের বর্ণনার উপরও নির্ভর করার উপায় থাকে না। গুজব ও অপপ্রচারের ক্ষমতা তখন এমনই অপ্রতিহত হয়ে উঠে যা কল্পনা করাও কষ্টকর। ফলে এমনও হয় যে কথিত নির্ভরযোগ্য লোকটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না, বরং কোন লোককে নির্ভরযোগ্য মনে করে তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। এভাবে বর্ণনা পরম্পরায় একটি ভিত্তিহীন ঘটনাও মজবুত ভিত্তি পেয়ে যায়। এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মর্যাদা লাভ করে বসে। এটাই হলো যেকোন ফিতনা-গোলযোগের নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতির স্বাভাবিক চিত্র। সুতরাং ছাহাবা অন্তর্বিরোধের নৈরাজ্যপূর্ণ সময় খণ্ডটি উপরোক্ত স্বভাবধারার ব্যতিক্রম কিভাবে হতে পারে! বিশেষতঃ সাবাঈ চক্রের রাফেযী ও খারেজী সদস্যরা যেখানে ছিলো অতিমাত্রায় তৎপর। ছাহাবা যুগের এই ইসলামী ইতিহাস যেসকল নেতৃস্থানীয় ও নির্ভরযোগ্য ওলামা মুহাদ্দেছীন সংকলন করেছেন তারা ইতিহাস সংকলনের স্বীকৃত রীতি মুতাবেক কোন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত সকল বর্ণনাই আনুপূর্বিক লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সুতরাং বুঝে দেখুন ; নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সংকলকের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বলেই ইতিহাসের এই বর্ণনা-সম্ভার কতটা নির্ভরযোগ্যতা দাবী করতে পারে ? পৃথিবীর আর দশটা ক্ষেত্রে কোন সাধারণ ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সংকলিত ইতিহাসের বেলায় সাধারণতঃ এ ধরণের বিকৃতির আশংকা থাকে না বটে। কিন্তু ছাহাবা অন্তর্বিরোধের নৈরাজ্যপূর্ণ সময়ের ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে এ কথা মোটেই খাটে না। সুতরাং ইতিহাস সংকলনকারী আলিমগণ যত নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজনই হোন ছাহাবা অন্তর্বিরোধ সংক্রান্ত ইতিহাসের সেইটুকু নির্ভর-যোগ্যতাও অবশিষ্ট থাকে না যা সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে থাকে। বস্তুতঃ হযরত হাসান বছরী (রহ.) এ সম্পর্কে যা বলেছেন আসলে সেটাই হচ্ছে আলোচ্য প্রসঙ্গে শেষ কথা। দ্বিতীয় কোন কথা বলার বা শোনার এখানে কোন অবকাশ নেই। হযরত হাসান বছরীর মন্তব্য ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। এখানে আবার উল্লেখ করছি। হৃদয়ের সকল বদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে হেদায়েত লাভের আকুতি নিয়ে হাছান বছরীর উপদেশবাণী শুনুন।

وَقَدْ سُئِلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ عَنْ قِتَالِهِمْ فَقَالَ قِتَالٌ شَهِدَه أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغِبْنَا وَعَلِمُوا وَجَهِلْنَا وَاجْتَمَعُوا فَاتَّبَعْنَا وَاخْتَلَفُوا فَوَقَفْنَا ـ

قَالَ الْمُحَاسِبِيُّ فَنَحْنُ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْحَسَنُ وَنَعْلَمُ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوْا أَعْلَمَ بِمَا دَخَلُوا فِيْهِ مِنَّا وَنَتَّبِعُ مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَنَقِفُ عِنْدَمَا اخْتَلَفُوا وَلَا

نَبْتَدِعُ رَأْيًا مِنَّا وَنَعْلَمُ أَنَّهُمْ اجْتَهَدُوْا وَ أَرَادُوْا اللهَ عَزَّوَجَلَّ اِذْ كَانُوْا غَيْرَ مُتَّهَمِيْنَ فِى الدِّيْنِ وَنَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ (تفسير قرطبى ص ٣٢٢ج١٦)

হযরত হাসান বছরী (রহ.)-কে ছাহাবা অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এ বিরোধের উভয় তরফে মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবাগণ হাজির ছিলেন। অথচ আমরা ছিলাম অনুপস্থিত। (পরিবেশ, পরিস্থিতি ও কার্যকারণ সম্পর্কে) তাদের অবহিতি ছিলো, অথচ আমাদের তা নেই। সুতরাং যে ব্যাপারে তাঁরা সর্বসম্মত সে বিষয়ে আমরা তাদের অনুসরণ করি। আর যে বিষয়ে তারা দ্বিধাবিভক্ত সে ব্যাপারে আমরা নিরবতা অবলম্বন করি। হযরত মুহাসেবী (রহ.) বলেন, হযরত হাসান বছরী যা বলেছেন আমরাও তাই বলি। কেননা আমরা নিশ্চিতই জানি যে, যে বিষয়ে তাঁরা হস্তক্ষেপ করেছিলেন সে বিষয়ে তাঁরা আমাদের চেয়ে বেশী জানতেন। সুতরাং যে বিষয়ে তাঁরা সর্বসম্মত সে বিষয়ে আমরা তাদের অনুগামী। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত সে বিষয়ে আমরা নিরব। নিজেদের পক্ষ থেকে তৃতীয় কোন পন্থা আমরা উদ্ভাবন করতে পারি না। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় তাঁরা ইজতিহাদ করেছিলেন। কেননা দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁরা যাবতীয় সংশয় সন্দেহের উর্ধ্বে ছিলেন।

সত্যানুসন্ধান থেকে পলায়ন নয়,
ইনসাফ ও যুক্তির দাবী

গভীরভাবে চিন্তা করে আপনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলুন, ছাহাবা অন্তর্বিরোধের নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে মুনাফেকীন, রাফেযী ও খারেজীদের ব্যাপক অপপ্রচারের ফলে ইতিহাসের যে নযীরবিহীন বিকৃতি ঘটেছে এবং সংশয় সন্দেহের যে মহাধুম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে হযরত হাসান বছরী (রহ.)-র সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য কি সত্যানুসন্ধান থেকে পলায়ন না জ্ঞান ও যুক্তির দাবীপূরণ ? একি অন্ধ ছাহাবাপ্রেম না প্রকৃত ইনছাফ-প্রেম ?

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নেতৃস্থানীয় তাবেয়ী হযরত হাসান বছরী—যিনি ছাহাবা কেরামের নিকট সান্নিধ্য লাভ করেছেন—ছাহাবা কেরামের অন্তর্বিরোধকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বীকার করছেন যে, প্রকৃত অবস্থা আমাদের জানা নেই। সুতরাং তাঁর কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শরীয়তের নীতি ও বিধান মোতাবেক এমন নিশ্চিত জ্ঞান তার ছিলো না যার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির জীবন

ও চরিত্র সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করা যেতে পারে। তাহলে কয়েক শতাব্দী পরে ইতিহাস সংকলনকারী তাবারী, ইবনে আছীর ও ইবনে কাছীর প্রমুখ হাদীছশাস্ত্র বিশারদ যত নির্ভরযোগ্যই হোন, ছাহাবা অন্তর্বিরোধের প্রকৃত অবস্থার নির্ভুল অবগতি কিভাবে সম্ভব হতে পারে তাদের পক্ষে এবং কি ভাবেই বা তাদের সংকলিত ইতিহাসের বর্ণনা সম্ভারের উপর ইসলামী আহ্‌কাম ও আকায়েদের বুনিয়াদ রাখা যেতে পারে। তাঁরা নিজেরাও তো সে দাবী করেন নি। বরং ইতিহাসের প্রচলিত ধারা ও রীতি অনুযায়ী ভুল-শুদ্ধ ও দুর্বল সবল নির্বিচারে সবরকম বর্ণনার একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন মাত্র।

হযরত হাসান বছরী (রহ.)-র এ সিদ্ধান্ত তো এমন যুক্তিনির্ভর ও ইনছাফপূর্ণ যে, দল, মত ও ধর্ম নির্বিশেষে ইনছাফপ্রিয় যে কোন মানুষ এর যথার্থতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে। কেননা ঐতিহাসিক বর্ণনাবলীর ধূম্রাচ্ছন্নতা ও পরস্পর বিরোধের এমন নাযুক অবস্থায় প্রয়োজনীয় ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের নিদারুণ অভাবের প্রেক্ষিতে নিরবতা অবলম্বন ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট বাণী ও বক্তব্যের ভিত্তিতে উলামায়ে উম্মত যে সর্বসম্মত মত প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ কোন ছাহাবীর জীবনে সত্যি যদি কোন পাপ, অন্যায় বা পদস্খলন প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে শেষ পরিণতির বিচারে আল্লাহ্‌র দরবারে অবশ্যই তা মাফ হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্‌র রিযা ও সন্তুষ্টির প্রবল বর্ষণধারায় তা ধুয়েমুছে পরিস্কার হয়ে গেছে—এ বিশ্বাস ও আকীদা অমুসলিম প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদরা অস্বীকার করতে পারেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা তাদের তো কোরআন সুন্নাহ্‌র সত্যতায় বিশ্বাস নেই। কিন্তু তাদের এই 'অবিশ্বাস'কে কবুল করে নিয়ে ঐতিহাসিক বর্ণনার গোলক ধাঁধায় পা রাখা কোন মুসলমানের পক্ষে কিভাবে বৈধ হতে পারে। শিকার ধরার এই ইতিহাস-জাল তো প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদরা এজন্যই পেতেছে যে, কোরআন সুন্নাহ সম্পর্কে বেখবর মুসলমানদেরকে ছাহাবা কেরামের মুকাদ্দাস জামা'আতের প্রতি খুব সহজেই আস্থাহীনতা ও অশ্রদ্ধার শিকার করা যাবে। সুতরাং কোন মুসলিম লেখক, গবেষক যদি দাবী করে যে, ছাহাবা কেরামের পক্ষ সমর্থনে প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলতেই তাঁরা মাঠে নেমেছেন। তাহলে তাদের খিদমতে আরয এই যে, যুদ্ধের আসল 'ফ্রন্ট' সেটা নয় যেখানে প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদরা মুসলমানদের টেনে আনতে চায়! বরং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সুরক্ষিত ক্ষেত্রই হলো সফল প্রতিরোধ ফ্রন্ট। শত্রুকে এখানেই নিয়ে আসতে হবে যেকোন উপায়ে। ছাহাবা সংক্রান্ত আলোচনার আগে যুক্তির

আলোকে কোরআন-সুন্নাহ্‌র সত্যতা স্বীকার করাতে হবে তাঁদেরকে। অতঃপর ছাহাবা কেরামের মুকাদ্দাস জামা'আত সম্পর্কে কোরআন সুন্নাহ্‌র পরিচ্ছন্ন বক্তব্য অস্বীকার করার কোন উপায় থাকবে না তাদের। এই যুক্তিপূর্ণ পথ গ্রহণে শত্রুপক্ষ যদি সম্মত না হয় তখন মুসলমানদের করণীয় কী, তা আল-কোরআনই আমাদের বলে দিয়েছে, আমরা তাদের ছাফ জানিয়ে দিব—

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ

"তোমাদের ধর্ম তোমাদের আমাদের ধর্ম আমাদের।" সুতরাং প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করা উচিত নিজেদের ঈমান ও বিশ্বাসের হিফাজতে ; কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বক্তব্যের প্রতি মুসলিম উম্মাহকে আশ্বস্ত করার পেছনে।

মোটকথা, ঈমানের জন্য বিরাট খাতরা হিসাবে ছাহাবা অন্তর্বিরোধ সংক্রান্ত আলোচনা থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকার যে উপদেশ উলামায়ে উম্মত দিয়েছেন তাঁর কারণ ছাহাবা কেরামের প্রতি তাদের অন্ধভক্তি নয়, বরং ইনছাফ ও সুস্থবিবেকেরই স্বভাব দাবী তা।

যেসকল মুসলিম লেখক গবেষক বর্তমান নাযুক মুহূর্তে পুনরায় ছাহাবা অন্তর্বিরোধকে কেন্দ্র করে আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, আসলেই যদি তাঁদের উদ্দেশ্য হয় অমুসলিম ও নাস্তিক বুদ্ধিজীবীদের অভিযোগ খণ্ডন তাহলে তাদের অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে দু'টি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ, হয় তারা হাছান বছরীর উপদেশ মেনে নিয়ে শত্রুকে সাফ জানিয়ে দেবেন যে, 'আচরণ ও চরিত্রের' বিচারে শত্রু-মিত্র সকলেই যে মুকাদ্দাস জামা'আতকে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সর্বোচ্চ শিখরে স্থান দান করেছে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের ইতিহাস-অস্ত্র একেবারেই অচল। কেননা বিচার-পর্যালোচনার স্বীকৃত মানদণ্ডে অনুত্তীর্ণ, ভিত্তিহীন ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে অভিযুক্ত করার বৈধতা নেই, এ সত্য তোমাদের মেনে নিতেই হবে। কিংবা তাদেরকে পরিস্কার ভাষায় বলে দেয়া উচিত যে, আলহামদুলিল্লাহ্ আমরা মুসলমান। আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রতিটি কথায় আমাদের অটুট ঈমান ও বিশ্বাস। সুতরাং আল্লাহ্ ও রাসূল যাঁদের সাধুতা ও ন্যায়পরতার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁদের বিপক্ষে ইতিহাসের কোন বর্ণনা আমাদের সামনে আসলে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র মোকাবেলায় সেগুলোকে অবশ্যই আমরা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করবো।

هذه سَبِيْلِى اَدْعُوْ اِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ

এটাই হচ্ছে আমার অনুসৃত পথ ও পন্থা। আমি এবং আমার অনুসারীরা অন্তর্দৃষ্টির সাথে আল্লাহ্‌র পানে আহ্বান জানাই।

উপরোক্ত দু'টি পন্থা ছাড়া অমুসলিম কুচক্রীদের হামলা প্রতিরোধের তৃতীয় কোন পথ বা পন্থার অবকাশ ইসলামে নেই।

আল্লাহ্ না করুন যদি এধরণের আলোচনার উদ্দেশ্য অমুসলিম লেখক বুদ্ধিজীবীদের হামলা প্রতিরোধ না হয়ে হয় নিছক গবেষণা-বিলাস পূর্ণ করা। তাহলে বলতে হবে যে, নিজের ঈমানের জন্য এটা যেমন কল্যাণকর নয়, তেমনি মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যও নয় প্রশংসনীয় কোন খেদমত।

দরদপূর্ণ আবেদন

এখন আমি আমার জীবনের শেষ দিনগুলো বিভিন্ন রোগে-শোকে এবং ক্রমবর্ধমান শারীরিক অবসাদে অতিবাহিত করছি এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি আখেরি মনজিলের দিকে। জীবনের কোলাহল থেকে বহু দূরে এবং মৃত্যুর শীতল প্রশান্তির খুব নিকটে এখন আমার অবস্থান। এ এমনই কঠিন সময় যখন ফাসিক-ফাজিরও তাওবার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সারা জীবনের অভ্যস্ত মিথ্যাচারীও সত্যের পথে ফিরে আসে। এমন সময় বলাইবাহুল্য যে, গ্রন্থরচনার আত্ম-চাহিদা পূরণের জন্য আমি কলম ধরি নি। আমার কলম ধরার কারণ এই যে, মুসলিম উম্মাহ্‌র সেই ঘুমন্ত ফিতনা, যা এক সময় হাজারো লাখো মানুষের ঈমান বরবাদ করেছিলো, তাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার সুগভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে নাস্তিক ও প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের পক্ষ থেকে।

এভাবে উম্মাহ্‌র দ্বীন ও দুনিয়া বরবাদকারী অসংখ্য ফিতনার সাথে যোগ হতে চলেছে আরো ভয়াবহ নতুন এক ফিতনা। জ্ঞান ও গবেষণার ধ্বজাধারী নাস্তিক-অমুসলিম পণ্ডিৎদের চক্রান্ত সম্পর্কে সরলপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের এবং আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত তরুণ প্রজন্মের সচেতনতা না থাকতে পারে। কিন্তু জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় প্রবীন ও বিদগ্ধ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের তো তা অজানা থাকার কথা নয়। অথচ আফসোসের বিষয় যে, তারাই আজ সে পথে পা বাড়িয়েছেন পরিণাম-পরিণতির কথা বিবেচনা না করেই। ফলে অমুসলিম লেখক-বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াস-প্রচেষ্টাও এত দিন যে সর্বনাশ করতে পারে নি তা ষোলকলায় পূর্ণ করে দিয়েছে তথাকথিত মুসলিম লেখক-গবেষকদের রচনা-সম্ভার। কেননা আধুনিক শিক্ষিত ও ধর্মপরায়ন মুসলমানরা চিহ্নিত শত্রুদের কথায় তেমন প্রভাবিত না হলেও মুসলিম চিন্তাবিদদের লেখনীকে গ্রহণ করে নিয়েছে পরম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সাথে। ফলে ছাহাবা

কেরামের প্রতি ইসলামী উম্মাহ্‌র এতদিনের ধারাবাহিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার জগতে নেমেছে প্রবল ধ্বস। নব্য শিক্ষিত আধুনিক প্রজন্ম তো ছাহাবা কেরামের বিরুদ্ধে নিন্দা-সমালোচনার এমন ঝড় তুলেছে যা সচরাচর হয়ে থাকে বর্তমান যুগের স্বার্থপূজারী ও ক্ষমতালিপ্সু নেতৃবর্গের বেলায়।

বলাবাহুল্য যে, এটা গোমরাহীর সেই চূড়ান্ত স্তর যেখানে এসে কোরআন, সুন্নাহ্, তাওহীদ, রিসালাত এবং দ্বীন ও শরীয়তের সকল বুনিয়াদই ক্ষতবিক্ষত হতে বাধ্য।

তাই সাধারণ মুসলমানদের, আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত অন্ধ তরুণ সমাজের এবং বিভ্রান্ত মুসলিম লেখক গবেষকদের আন্তরিক হিতাকাংখায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যুক্তির আলোকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বিশ্বাস তুলে ধরার চেষ্টায় কলম হাতে নিয়েছি এবং ঈমানী দায়িত্ব মনে করেই এ ফরয আঞ্জাম দিতে চলেছি। হয়ত আল্লাহ্ পাক এ লেখার মাধ্যমে আমার মনের দরদ-আকুতি অন্যের হৃদয়ে পৌঁছে দেবেন। আসুন, আখিরাতকে সামনে রেখে সকলেই আমরা চিন্তা করি যে, নাজাত ও মুক্তির পথ জমহূরে উম্মতের পথ থেকে আলাদা হতে পারে না। আলোচ্য বিষয়ে উলামায়ে উম্মত সংযম-নিরবতার যে নীতি অবলম্বন করেছেন তা বুদ্ধিবৃত্তিক ভীরুতা কিংবা বিরোধিতার আশংকায় নয় বরং দ্বীন ও শরীয়ত এবং যুক্তি ও ইনছাফের দাবী মনে করেই করেছেন। তাদের যুক্তিপূর্ণ পথ ও পন্থা পরিহার করে গবেষণার বীরত্ব দেখানো ভালো কাজ হতে পারে না। কারো সামনে যদি নিজের ভুল ও বিচ্যুতি পরিষ্কার হয়ে যায় তাহলে ঈমানের দাবী হলো, ভবিষ্যতে নিজেও তা থেকে বেঁচে থাকা এবং মুসলমান ভাইদেরও তা থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা এবং যথাসম্ভব অতীতের ভুলের কাফফারা আদায়ের চেষ্টা করা। কেননা লেখার জৌলুস ও বাকবিতণ্ডার এ চমক শিঘ্রই নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। কর্মের ছাওয়াব বা আযাবই শুধু বাকী থাকবে।

ما عندكم يَنفدُ وما عند الله باقٍ

তোমাদের কাছে যা আছে অচিরেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তাই শুধু অক্ষয় হয়ে থাকবে।

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَه وَاَرِنَا البَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَه . وصلَّى الله تعالى على خَيْرِ خَلْقِه وَ صَفْوَةِ رُسُلِه مُحَمَّدٍ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وسلَّم وعَلى اصْحَابه خِيَارِ الخَلاَئق بَعْدَ الاَنْبِيَاءِ وَنَسْأَلُ الله اَن يَرْزُقَنَا حُبَّهُمْ وَ عَظْمَتهُمْ وَيُعِيْذُنَا مِنَ الوُقُوْعِ فِى شَئٍ يَشِينهُم وَاَن يَحْشرنَا فِى زُمَرَتِهِم .

قَدْ اَخذتُ فِى تَسوِيده لِغَرة ربيع الاول ١٩١٢ هـ فَجاءَ بِعَونِ الله سبحانه وحمده فى احد عشر يوما كما تراه والله سبحانه وتعالى اَسئَلُ اَن يَّتَقَبَّلَه ـ

কারামাতে ছাহাবা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর

দু'আ

بسم الله الرحمن الرحيم

হামদ ও ছালাতের পর আরয এই যে, আলোচ্য কিতাবটি আমি লেখক মৌলভী আহমদ হাসান এর কাছ থেকে অক্ষরে অক্ষরে শুনেছি এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় সংশধনী ও পরামর্শ দিয়েছি ; যা লেখক সানন্দে গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য কিতাবটি দেখে আমার অন্তর আরো বেশী খুশী হয়েছে এজন্য যে, দীর্ঘদিন থেকে এ বিষয়ে নিজেই কিছু লেখার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম, কিন্তু অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার কারণে সময় হয়ে উঠছিলো না। কিন্তু এখন চোখের সামনে এ প্রয়োজনীয় কাজটি পূর্ণ হতে দেখে মনে যত আনন্দই হোক তা বেশী নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে উম্মতের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী করুন। আমীন।

আশরাফ আলী
২৯ জুমাদাল উখরা ১৩৩২ হিজরী।

লেখকের আরয

اَلحَمْدُ لله نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَ مَنْ يُضْلِلِ فَلاَ هَادِىَ لَه وَاَشْهَدُ اَن لاَّ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلى اله وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا كُلَّمَا ذَكَرَه الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِه الغَافِلُوْنَ ـ اَمَّا بَعْدُ

কোরআন ও সুন্নাহ্র অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এ সত্য সুপ্রমাণিত যে, ছাহাবা কেরাম রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন হলেন উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠ জামা'আত এবং সকল বিদগ্ধ আলিমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, আল্লাহ্র কোন অলী যত উচ্চ মরতবাতেই অধিষ্ঠিত হোন না কেন, তিনি একজন আদনা দরজার ছাহাবারও সমপর্যায়ে উপনীত হতে পারেন না। মূলতঃ এটা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সান্নিধ্য ও সাহচর্যেরই বরকত। উম্মতের অলী-বুজুর্গরা সেই মোবারক ছোহবত কোথায় পাবেন, যার দ্বারা তারা ছাহাবা কেরামের সমপর্যায়ের মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন।

ذلك فَضْلُ الله يُؤْتِيْه مَن يَّشَاءُ

এ হলো আল্লাহ্র দান, যা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, বর্তমান যুগের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ পূর্ববর্তী অলী-বুজুর্গদের প্রতি যে পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করেন তার অর্ধেকও ছাহাবা কেরামের প্রতি পোষণ করেন না। বলাবাহুল্য যে, এটা মারাত্মক ভ্রান্তি, যা দূর হওয়া একান্ত জরুরী। কেননা ছাহাবা কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা এবং তাঁদের প্রতি সর্বাধিক ভক্তি ও মুহাব্বত রাখা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকীদারই অন্তর্ভুক্ত। বহু চিন্তা-ভাবনার পর এই অবস্থার কারণ এটাই বুঝে আসে যে, সাধারণ লোক সর্বদা অলী-বুজুর্গদের কারামত ও বুজুর্গির ঘটনাবলীই শুধু শুনে থাকে। ছাহাবা কেরামের কারামাত ও বুজুর্গীর ঘটনাবলী খুব কমই আলোচিত হয়। ফলে সাধারণ লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, কারামাতের ঘটনাবলী শুধু অলী-বুজুর্গদের মধ্যেই বুঝি সীমাবদ্ধ। তাই

সাধারণ মানুষ কার্যত ছাহাবা কেরমকে সেই দরজার ও মরতবার আল্লাহ্ওয়ালা মনে করে না যেই দরজার আল্লাহ্ওয়ালা তাঁরা আসলেই ছিলেন। ফলে স্বাভাবিক-ভাবেই ছাহাবা কেরামের প্রতি সেই পরিমাণ ভক্তি শ্রদ্ধা সাধারণ মানুষের মনে দেখা যায় না। অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানী সূফী সাধকগণ বারবার পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, আসল কামালিয়াত ও বুজুর্গি কাশফ কারামাতের উপর মোটেই নির্ভর করে না। কামালিয়াত ও বুজুর্গী এক জিনিস আর কাশফ কারামাত অন্য জিনিস। আসল কামালিয়াত হলো, الاستقامة على الدين অর্থাৎ দ্বীন ও শরীয়তের উপর অবিচল থাকা। আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধানকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা এবং সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা। আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক পূর্ণরূপে আদায় করতে থাকা। এ ক্ষেত্রে যিনি যত বেশী অগ্রসর হবেন তিনিই তত বড় বুজুর্গী ও কামালিয়াতের অধিকারী বলে বিবেচিত হবেন। তাই বলা হয়ে থাকে—

اَلاِسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكَرَامَةِ ـ

অর্থাৎ ইস্তিকামাত কারামাতের উর্ধ্বের জিনিস। আর জাহেরী শরীয়ত ও বাতেনী তরীকতের সর্বোচ্চ স্তরে ছাহাবা কেরামের অবিচল থাকার অভাবিতপূর্ব ঘটনাবলী কে না-জানে! এ বিষয়টির খুবই বিশদ ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) কারামাতে ইমদাদিয়া গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এখানে আমরা খুবই সংক্ষেপে তা পেশ করছি। কেননা, আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো, ছাহাবা কেরামের বিভিন্ন কারামাতের ঘটনা উল্লেখ করা, যাতে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে ছাহাবা কেরামের যথাযোগ্য ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আযমত পয়দা হতে পারে।

ইস্তিকামাত অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীন ও শরীয়তের উপর পূর্ণমাত্রায় অবিচল থাকাই হলো প্রকৃত কারামাত। হযরত জোনায়দ বোগদাদী (রহ.)-র খেদমতে জনৈক ব্যক্তি দশ বছর কাটিয়ে দেয়ার পর একদিন আরয করল, হযরত! এত দীর্ঘকাল আপনার খেদমতে থাকলাম, অথচ আপনার কোন কারামত প্রকাশ পেতে দেখলাম না। হযরত জোনায়দ বোগদাদী (রহ.) তখন জোশের সাথে বলে উঠলেন, এই দীর্ঘ সময়ে তুমি আমার দ্বারা কোন গুনাহের কাজ হতে দেখেছো কি ? সে জবাবে আরয করল। জি-না, তা অবশ্য দেখি নি। তখন হযরত জোনায়দ বোগদাদী বললেন, এর চে' বড় কারামত আর কি হতে পারে! আর কি কারামত তুমি দেখতে চাও! আল্লাহ্ওয়ালাগণ সাধারণতঃ নিজেদের কারামাত ও বুজুর্গীর কথা প্রকাশ করেন না। কিন্তু জোনায়দ বোগদাদী (রহ.)

খাদেমকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই শুধু প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছিলেন। এই ছিলো তত্ত্বজ্ঞানী প্রকৃত ছূফী-বুজুর্গদের অবস্থা। কোরআন মজীদেও আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন—

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ

নিঃসন্দেহে তোমাদের মাঝে অধিক মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তিই আল্লাহ্র কাছে অধিক মর্যাদা ও কারামতওয়ালা। সুতরাং পরিস্কার প্রমাণ হয়ে গেলো যে, আল্লাহ্র নৈকট্য ও বুজুর্গি লাভের আসল মাপকাঠি হলো তাকওয়া ও ধার্মিকতা তথা দ্বীন ও শরীয়তের উপর পূর্ণমাত্রায় অবিচল থাকা। অন্য কিছু নয়।

দ্বিতীয়তঃ এই কারামাত বা অলৌকিক ঘটনাবলী মূলতঃ কঠোর সাধনা ও রিয়াযতের ফল। এর মাধ্যমে যাবতীয় ঋপু অবদমিত হয় এবং আত্মার শক্তির স্ফূরণ ঘটে। সেই সাথে অলৌকিক ঘটনাবলী বা কারামাতের প্রকাশ ঘটে। পক্ষান্তরে ছাহাবা কেরামের স্বভাবযোগ্যতা এবং আত্মশক্তি এত প্রবল ও পূর্ণমাত্রায় ছিলো এবং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সান্নিধ্য ও ছোহবতের বরকতে আধ্যাত্মিকতার জগতে তাদের এমন স্বতঃস্ফূর্ত উন্নতি ঘটেছিলো যে, পৃথকভাবে আধ্যাত্মিক সাধনা ও রিয়াযতের তাদের বিশেষ প্রয়োজন হয় নি। তাই অলী-বুজুর্গদের দ্বারা অতিমাত্রায় কারামাত প্রকাশ পাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।

তৃতীয়তঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে কারামাতের প্রকাশ ঘটানো হয় মূলতঃ সমসাময়িক সাধারণ মানুষের ঈমান মজবুত করার উদ্দেশ্যে, যাতে অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রকাশ দেখে মানুষ অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব চাক্ষুষ অনুভব করতে পারে এবং ঈমান বিল গায়বে উদ্বুদ্ধ হয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সময় নৈকট্যের কারণে প্রথম কল্যাণ শতাব্দীগুলোতে মানুষের ঈমান, একীন সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত ছিলো, সেহেতু ঈমান, একীনের মজবুতি ও দৃঢ়তার জন্য তাদের পৃথক কোন অলৌকিক নিদর্শনের প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতপূর্ণ যামানার সাথে পরবর্তী লোকদের সময়-দূরত্ব যতই বাড়তে লাগলো মানুষের ঈমান একীনের মাঝেও সেই পরিমাণ দুর্বলতা দেখা দিতে লাগলো। ফলে যামানার লোকদের একীন ও ঈমান বিল-গায়বের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য যামানার অলি-বুজুর্গদের হাতে কারামাত বা অলৌকিক নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল যে, কারামাতের প্রকাশ অলী-বুজুর্গদের রুহানী মরতবা ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা প্রকাশের জন্য নয়। বরং যামানার লোকদের ঈমান, একীন মজবুত করার উদ্দেশ্যে। এটাও প্রমাণিত হলো যে,

ছাহাবা কেরামের হালাত বা অবস্থাটাই সুন্নতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। আর তাঁদের ঈমান একীনে কোন দুর্বলতাই ছিলো না, যার জন্য কারামাতের প্রকাশ ঘটনানো প্রয়োজন হতে পারে।

চতুর্থতঃ ছাহাবা কেরামের ঘটনাবলী বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ বর্ণনার বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য বহু কঠোর শর্ত আরোপ করেছেন এবং সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, যাতে যথা সম্ভব বিশুদ্ধ প্রমাণিত বর্ণনাই শুধু সংকলিত হয়। দুর্বল সূত্রের যাবতীয় বর্ণনা তারা সর্বোতভাবে পরিহার করেছেন। পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগের অলী-বুজুর্গদের ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে তার দশমাংশ সতর্কতা ও কঠোরতাও আরোপ করা হয় নি। আর বলাইবাহুল্য যে, শর্তের কঠোরতার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো বর্ণিত ঘটনাবলীর সল্পতা। পক্ষান্তরে শর্তের শিথিলতার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো বর্ণিত ঘটনাবলীর সংখ্যাধিক্য। তাছাড়া যেহেতু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীন ও শরীয়তের আহকাম ও বিধান সেহেতু মুহাদ্দিসগণ ঘটনাবলী বর্ণনা করার চেয়ে আহকাম বিষয়ক রিওয়ায়াত বর্ণনা করার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, ছাহাবা কেরাম দ্বারা কারামাত একেবারেই প্রকাশ পায় নি বা সেগুলো মোটেও বর্ণিত হয় নি। তাঁদের দ্বারাও বহু কারামাত প্রকাশ পেয়েছে এবং হাদীছ বর্ণনার কঠোর শর্তাবলীর দ্বারা বিশুদ্ধ প্রমাণিত অবস্থায় বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে সাধারণ মানুষ যেহেতু উপরে বর্ণিত কারণগুলো দ্বারা পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না এবং ছাহাবা কেরামের কিছু কারামাত না শুনে তাদের মন শান্ত হতে পারে না, এজন্য হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-র আদেশক্রমে ছাহাবা কেরামের কারামাত সংক্রান্ত ঘটনাবলী সংগ্রহের কাজে আমি অধম আত্মনিয়োগ করেছি। আল্লাহ্ পাক কবুল করুন। পাঠকবর্গের খিদমতে বিনীত নিবেদন, আল্লাহ্র ওয়াস্তে এই অধমের জন্য মাগফিরাতের এবং নেক মকছুদ হাছিলের দু'আ করবেন।

উল্লেখ্য যে, কিতাবের ভূমিকা হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.) দীর্ঘ দিন আগেই লিখে রেখেছিলেন এবং কোন এক খাদেমকে দিয়ে কিছু বিক্ষিপ্ত তথ্যও সংগ্রহ করিয়েছিলেন। কিন্তু সময়াভাবে হযরতের পবিত্র হাতে কাজটি সম্পন্ন হতে পারল না। হযরতের লিখিত ভূমিকার সারাংশ সংক্ষেপে ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ বর্তমান ভূমিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ . رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযি.)-র কারামাত

১ নং কারামত ঃ

اَخْرَجَ مَالِكٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِيْنَ وَسَقًا مِنْ مَالِه بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ قَالَ يَا بُنَيَّةُ! وَاللهِ مَا مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَىَّ غِنَىً مِنْكَ وَلاَ اَعَزَّ فَقْرًا بَعْدِى مِنْكَ وَاِنِّىْ كُنْتُ نَحَلْتُكَ جِدَادَ عِشْرِيْنَ وَسَقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِه وَاحْتَرَزْتِه كَانَ لَكَ وَاِنَّمَا هُوَ مَالُ وَارِثٍ وَاِنَّمَا هُوَ اَخُوَاكِ وَاُخْتَاكِ فَاَقْسِمُوْه عَلَى كِتَابِ اللهِ .

فَقَالَتْ يَاَبَتِ وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُه اِنَّمَا هِىَ اَسْمَاءُ فَمَنِ الاُخْرٰى قَالَ ذُوْبَطْنِ ابْنَةَ خَارِجَةَ اَرَاهَا جَارِيَةٌ وَاَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ وَقَالَ فِى اٰخِرِه قَالَ ذَاتُ بَطْنِ ابْنَةَ خَارِجَةَ قَدْ اُلْقِىَ فِىْ رَوْعِى اَنَّهَا جَارِيَةٌ فَاسْتَوْصِى بِهَا خَيْرًا فَوَلَدَتْ اُمُّ كُلْثُوْمٍ (تاريخ الخلفاء ص٦١)

ইমাম মালিক (রহ.) হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর (রাযি.) একবার আয়েশা (রাযি.)-কে বাগানে গাছে থাকা অবস্থায় বিশ 'ওয়াসাক' (প্রায় পাঁচ মন) খেজুর হেবা (দান) করলেন। অতঃপর মৃত্যুর সময় তিনি তাঁকে ডেকে বললেন, প্রিয় কন্যা! সম্পদ দান করার ব্যাপারে তোমার চেয়ে প্রিয় আমার কেউ নেই। আবার তোমার দরিদ্রতাও আমার কাছে খুবই প্রিয়।

আমি তোমাকে বিশ ওয়াসাক খেজুর দান করেছিলাম ঠিকই। যদি সেগুলো গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে নিতে তাহলে সেগুলো তোমার মালিকানায় চলে যেতো। এখন কিন্তু তা সমস্ত ওয়ারিছদের মাল। তোমার দুই ভাই এবং দুই বোনও এখন তাতে শরীক হবে। সুতরাং সেগুলো তুমি কোরানের হুকুম মুতাবিকই বন্টন করবে। হযরত আয়েশা (রাযি.) উত্তরে বললেন, আব্বাজান! পরিমাণে আরো বেশী হলেও আপনার এই দান থেকে আমি অবশ্যই হাত গুটিয়ে নিতাম। কিন্তু আমার একমাত্র বোন তো হলেন আসমা। দ্বিতীয় বোন আবার কে ? হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) জবাবে বললেন, বিনতে খারেজা [হযরত আবু বকর (রাযি.)-র স্ত্রীর] গর্ভে আমি কন্যা সন্তান দেখতে পাচ্ছি।

ইবনে সা'আদ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, আমার মনে একথা ইলকা করা হয়েছে (ঢেলে দেয়া হয়েছে) যে, বিনতে খারেজার গর্ভের কন্যা সন্তানই আছে। আমি তার সেবা-যত্ন করার অছিয়ত করে যাচ্ছি। পরে হযরত উম্মে কুলছুম জন্মগ্রহণ করলেন।

আলোচ্য অছিয়ত থেকে হযরত আবু বকর (রাযি.)-র কারামত প্রমাণিত হয়। কেননা স্ত্রীর গর্ভের অবস্থায়ই তিনি আপন কন্যা উম্মে কুলছুমের কথা জানতে পেরে হযরত আয়েশাকে হুকুম দিয়েছিলেন, যেন তার জন্য কন্যা সন্তানের মিরাছ রাখা হয়।

২ নং কারামত ঃ

اَخْرَجَ اَبُوْ يَعْلى عَنْ عَائِشَةَ قِصَّةً وَفِيْهَا ثُمَّ قَالَ (اَىْ اَبُوْ بَكْرٍ) فِىْ اَىِّ يَوْمٍ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ . قَالَ اَرْجُوْ فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَتُوُفِّىَ لَيْلَةَ الثُّلَثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ ـ (تاريخ الخلفاء ص٦٢)

হযরত আবু ইয়ালা হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যার অংশ বিশেষ এরূপ ঃ

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিন ওয়াফাত লাভ করেছিলেন ? আমি বললাম, সোমবার। তখন হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, আমি একরাত্র পরেই মৃত্যুর আশা করছি। সত্য সত্যই হযরত আবু বকর (রাযি.) মঙ্গলবার রাত্রে দুনিয়া হতে চির বিদায় গ্রহণ করলেন এবং ভোর হওয়ার আগেই তাকে দাফন করা হলো।

৩ নং কারামাত ঃ

اَخْرَجَ (اَىْ اِبْنُ سَعْدٍ) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ لَمَّا مَاتَ ارْتَجَّتْ مَكَّةُ فَقَالَ اَبُوْ قُحَافَةَ مَا هذَا قَالُوا مَاتَ ابْنُكَ قَالَ رَزْءٌ جَلِيْلٌ ..... الخ (تاريخ الخلفاء ص٦٢)

ইবনে সা'আদ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব হতে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর (রাযি.)-র ইন্তিকালের সময় মক্কা শরীফ কম্পিত হয়েছিলো।

তখন হযরত আবু বকর (রাযি.)-র সম্মানিত পিতা আবু কোহাফা (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, এ কম্পন কিসের ? তাকে বলা হলো যে, আপনার পুত্র ইনতিকাল করেছেন। হযরত আবু কোহাফা তখন ধৈর্য ধারণ করে বললেন, এটা তো খুবই বড় বিপদের কথা।

বলাবাহুল্য যে, মৃত্যুর সময় পবিত্র মক্কা শহর কম্পিত হওয়া হযরত আবু বকর (রাযি.)-র বহু বড় কারামাত।

৪ নং কারামাত ঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ فِىْ قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ فَدَعَا (اَىْ اَبُوْ بَكْرٍ) بِالطَّعَامِ فَاَكَلَ وَ اَكَلُوْا فَجَعَلُوْا لاَ يَرْفَعُوْنَ لُقْمَةً الاَّ رَبَتْ مِنْ اَسْفَلِهَا اَكْثَرَ مِنْهَا فَقَالَ لامْرَاَتِه يَا اُخْتَ بَنِىْ فِرَاسٍ مَا هذَا قَالَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ اِنَّهَا الآنَ لاَكْثَرَ مِنْهَا قَبْلَ ذلِكَ بِثَلاَثِ مِرَارٍ فَاَكَلُوْا وَبَعَثَ بِهَا اِلى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَنَّهُ اَكَلَ مِنْهَا ـ (متفق عليه)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রহ.) হতে বর্ণিত একটি বড় ঘটনার অংশ বিশেষ এরূপ ঃ

হযরত আবু বকর (রাযি.) একবার মেহমান দাওয়াত দিলেন এবং নিজেও খানায় শরীক হলেন। তখন দস্তরখানে শরীক প্রত্যেকেই স্বচক্ষে দেখতে পেলেন যে, প্রতিটি লোকমা উঠানোর সাথে সাথে খানা পূর্বের চেয়ে বেড়ে যাচ্ছিলো। হযরত আবু বকর (রাযি.) তার স্ত্রীকে (ইনি বনী ফারাস গোত্রের মেয়ে ছিলেন) বললেন, হে বনী ফারাস গোত্রের বোন! ব্যাপার কি ?! তিনি আরয করলেন, এটা আমার চোখ জুড়ানোর ব্যাপার (অর্থাৎ আপনার কারামতের প্রকাশ ঘটিয়ে আল্লাহ্ আমার চক্ষু জুড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন।) খানা তো এখন পূর্বের চেয়ে তিন গুণ বেশী মনে হচ্ছে। অতঃপর সকলে পেট ভরে খেয়ে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতেও পাঠালেন এবং তিনিও তা আহার করলেন।

—বুখারী, মুসলিম

এটা ছিলো হযরত আবু বকর (রাযি.)-র নেক নিয়তের ফল, তাঁরই বরকতে খানা এভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো যে, সকল মেহমান পেট ভরে খাওয়া সত্ত্বেও তাতে বরকত দেখা যাচ্ছিলো। বলাবাহুল্য যে, এটা হযরত আবু বকর (রাযি.)-র সামান্য একটি কারামাত মাত্র।

৫ নং কারামাত ঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَبِىْ بَكْرٍ فَرَآهُ ثَقِيْلاً فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِه فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ يُخْبِرُهَا بِوَجْعِ اَبِىْ بَكْرٍ اِذْ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَبِىْ يَدْخُلُ فَجَعَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَجِّبٌ لِمَا عَجَّلَ اللهُ فِيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ فَقَالَ مَا هُوَ الاَّ اَنْ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِىْ فَعُوْفِيْتُ فَاَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَسَعَطَنِىْ سَعْطَةً فَقُمْتُ وَقَدْ بَرَأْتُ معزوة لابن ابى الدنيا وابن عساكر (قرة العينين ص٩٩)

মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাযি.)-কে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন তিনি সেখান থেকে বের হয়ে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-র কাছে তাশরীফ নিলেন। উদ্দেশ্য, তাঁকে তাঁর পিতার অসুস্থতার সংবাদ দেওয়া। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করা মাত্র হযরত আবু বকর (রাযি.) দরজার বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। হযরত আয়েশা (রাযি.) বললেন, আব্বাজান দেখি তাশরীফ নিয়ে এসেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই আশ্চর্য প্রকাশ করতে লাগলেন যে, আল্লাহ্ পাক এত দ্রুত তাকে আরোগ্য দান করেছেন। হযরত আবু বকর (রাযি.) আরয করলেন, হুজুর! আপনি বের হওয়া মাত্রই হযরত জিবরীল (আ.) আগমন করলেন এবং আমাকে একটি অষুধ শুঁকালেন, আর সাথে সাথে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।

ইবনে আবুদ্দিনার ও ইবনে আসাকিরও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

দেখুন, হযরত আবু বকর (রাযি.)-র কত বড় কারামত এটা ; হযরত জিবরীল (আ.) নিজে আসমান থেকে অবতরণ করে তাঁর চিকিৎসা করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তিনি সুস্থতা লাভ করলেন।

৬ নং কারামাত ঃ

عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ اَبُوْبَكْرٍ يَسْمَعُ مُنَاجَاةَ جِبْرِيْلَ النَّبِىَّ لاَ يَرَاهُ رَوَاهُ اِبْنُ ابى داود فى المصاحف كذا قال ابن عساكر - (كنز العمال ج٦ ص٣١١)

হযরত আবু জাফর হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রাযি.) হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরীল আমীনের কথোপকথন শুনতে পেতেন। তবে তিনি তাকে দেখতে পেতেন না।

৭ নং কারামাত ঃ

فِىْ قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فَاَتَيْتُ نَبِىَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللهِ اَلَسْتُ نَبِىَّ اللهِ حَقًّا ، قَالَ بَلَى ، قُلْتُ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ ، قَالَ بَلَى ، قُلْتُ فَلِمَ نُطِى الدَّنِيَّةَ فِىْ دِيْنِنَا اِذَنْ قَالَ اِنِّىْ رَسُوْلَ اللهِ وَلَسْتُ عَاصِيَه وَهُوَ نَاصِرِىْ قُلْتُ اَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا اَنَّا سَنَأْتِى الْبَيْتَ وَنَطُوْفُ ، قَالَ بَلَى ، اَفَاَخْبَرْتُكَ اَنَّكَ تَأْتِيْهِ الْعَامَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّكَ اَتِيْه وَمُطَوِّفٌ بِه ، قَالَ فَاَتَيْتُ اَبَابَكْرٍ فَقُلْتُ يَا اَبَابَكْرٍ اَلَيْسَ هَذَا نَبِىَّ اللهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِىْ دِيْنِنَا اِذَنْ ، قَالَ اَيُّهَا الرَّجُلُ اَنَّه رَسُوْلُ اللهِ وَلَنْ يَعْصِى رَبَّه وَهُوَ نَاصِرُه فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِه فَوَاللهِ اِنَّه عَلَى الْحَقِّ فَقُلْتُ اَلَيْسَ يُحَدِّثُنَا اَنَا سَنَأْتِى الْبَيْتَ وَنَطُوْفُ بِه قَالَ بَلَى اَفَاَخْبَرَكَ اَنَّكَ تَأْتِيْهِ الْعَامَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّكَ آتِيْهِ وَمُطَوِّفٌ بِه قَالَ فَعَمِلْتُ لِذَالِكَ اَعْمَالاً

(رواه البخارى و ابوداود)

হোদায়বিয়ার সন্ধি ঘটনার অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

হযরত উমর ফারুক (রাযি.) বলেন, আমি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি সত্য নবী নন ? হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই। আমি বললাম, আমরা কি সত্যের উপর নই এবং আমাদের শত্রু কি মিথ্যার উপর নয় ? তিনি উত্তরে বললেন, অবশ্যই। অতঃপর আমি আরয করলাম, তাহলে দ্বীনের ব্যাপারে কেন আমরা যিল্লতি বরদাশত করবো ? (অর্থাৎ কেন নতি স্বীকার করে কাফিরদের শর্ত মুতাবেক সন্ধি করবো ?)

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখো, আমি আল্লাহ্র

রাসূল! আমি তার নাফরমানি করতে পারি না। অবশ্যই তিনি আমাদের সাহায্য করবেন (এবং অবশেষে আমাদেরই বিজয় হবে)।

তখন আমি আরয করলাম, আপনি আমাদেরকে এ খোশখবর দেন নি যে, আমরা অতি সত্তর বাইতুল্লায় প্রবেশ করবো এবং আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করবো ? হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, অবশ্যই। কিন্তু এ কথা কি বলেছি যে, এ বছরই আমরা আসবো ? আমি আরয করলাম, জি-না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, অবশ্যই তোমরা এখানে আসবে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করবে।

(হযরত উমর বলেন) অতঃপর আমি আবু বকর এর কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু বকর! ইনি কি আল্লাহ্‌র সত্য নবী নন ? তিনি বললেন, অবশ্যই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কি সত্যের উপর নই এবং আমাদের শত্রুরা মিথ্যার উপর নয় ? তিনি উত্তর দিলেন, অবশ্যই। আমি আরয করলাম, তাহলে কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে যিল্লতি বরদাশত করবো। আবু বকর তখন উত্তর দিলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনি আল্লাহ্‌র নাফরমানি করতে পারেন না। আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন (এবং তাকে বিজয় দান করবেন), সুতরাং তুমি তাঁর আদেশ কঠোরভাবে পালন করে যাও। কেননা আল্লাহ্‌র কসম! তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি আমাদের বলেন নি যে, আমরা বাইতুল্লাহ্‌য় এসে তাওয়াফ করবো ? হযরত আবু বকর (রাযি.) উত্তর দিলেন, অবশ্যই। কিন্তু তিনি কি এ কথাও বলেছিলেন যে, এ বছরই তুমি বাইতুল্লাহ্ আসবে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করবে ?

(হযরত উমর (রাযি.) বলেন,) প্রশ্ন করার এই আস্পর্ধা দেখানোর কাফ্‌ফারা হিসাবে আমি অনেক আমল করেছিলাম। (বুখারী ও আবু দাউদ শরীফে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে।)

আবু বকর (রাযি.)-র উত্তর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের সাথে হুবহু শব্দে শব্দে মিলে যাওয়া নিঃসন্দেহে তাঁর কারামত। কেননা সাধারণের বেলায় এরূপ হতে দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এটা হযরত আবু বকর (রাযি.)-র নেক নিয়তের প্রকাশ যে, নিজের কারামতকে অন্যের সামনে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করতেন না, বরং নিরবে কথায় ও আচরণে বিভিন্ন কারামাতের প্রকাশ ঘটাতেন। যাতে মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

হযরত উমর (রাযি.)-র কারামাত

৮ নং কারামাত ঃ

اَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَكُنْ فِىْ اُمَّتِىْ اَحَدٌ فَاِنَّه عُمَرُ اَىْ مُلْهَمُوْنَ ـ (تاريخ الخلفاء ص ٨٤)

وَاَخْرَجَ الطَّبْرَانِىُّ فِىْ الْاَوْسَطِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ مَرْفُوْعًا فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ وَ اِنَّه لَمْ يَبْعَثِ اللهُ نَبِيًّا اِلاَّ كَانَ فِىْ اُمَّتِه مُحَدَّثٌ وَ اِنْ يَكُنْ فِىْ اُمَّتِىْ مِنْهُمْ اَحَدٌ فَهُوَ عُمَرُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ مُحَدَّثٌ قَالَ تَتَكَلَّمُ الْمَلٰئِكَةُ عَلٰى لِسَانِه اسناده حسن ـ (تاريخ الخلفاء ص ٨٥)

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বিগত উম্মত-সমূহের মাঝে আল্লাহ্‌র এমন বান্দারা থাকতেন যাদের অন্তরে বিভিন্ন ইলকা বা ইলহাম করা হতো (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের অন্তরে বিভিন্ন কথা ঢেলে দেওয়া হতো।) আমার উম্মতের মধ্যে আল্লাহ্‌র এমন কোন বান্দা থাকলে তিনি হচ্ছেন উমর।

আল্লামা তাবরানী (রহ.) الاوسط গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে আছে, আল্লাহ্ পাক যে জাতির কাছে কোন নবী পাঠাতেন, তখন সেই জাতির মাঝে আল্লাহ্‌র এমন কোন না কোন বান্দা অবশ্যই থাকতেন যার অন্তরে সেই নবীর আগমনের কথা পূর্বেই ইলকা করা হতো। আমার উম্মতের এ ধরণের কোন বান্দা যদি থেকে থাকেন তবে তিনি হচ্ছেন উমর। ছাহাবা কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই লোকটির অবস্থা কি হতো যার অন্তরে ইলকা করা হতো। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তার যবানীতে আসলে ফিরেশতারা কথা বলতেন। অর্থাৎ সেই ব্যক্তির অবস্থা এই হতো যে, ফিরেশতারা তার অন্তরে যে কথা ইলকা করতেন তিনি মানুষের কাছে নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করতেন। নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলতেন না। আলোচ্য হাদীছের সনদ উত্তম ও গ্রহণযোগ্য।

আলোচ্য হাদীছ দু'টিতে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃক হযরত উমর (রাযি.)-কে ইলহামের অধিকারী আখ্যায়িত করা নিঃসন্দেহে তার

কারামতের প্রমাণ। এখানে إن يكن (যদি থাকে) কথাটা মূলতঃ তাকীদ বা জোর প্রকাশের জন্য বলা হয়েছে, সন্দেহ প্রকাশের জন্য নয়।

যেমন নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সম্পর্কে মানুষ বলে থাকে যে, দুনিয়াতে যদি আমার কোন আপন লোক থেকে থাকে তাহলে সে তুমি। এ কথায় কোন বুদ্ধিমানই তার বন্ধু থাকার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের অর্থ বুঝে না। বরং অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিশ্চয়তার অর্থই বুঝে থাকে।

তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে যখন ইলহামের অধিকারী মানুষ ছিলেন, তখন উম্মতে মুহাম্মদীতে এই-নিয়ামতের অধিকারী মানুষ থাকাটা তো খুবই স্বাভাবিক ও জরুরী। কেননা জ্ঞানে-গুণে সকল দিক থেকে উম্মতে মুহাম্মদীই হলেন শ্রেষ্ঠ উম্মত।

হযরত আবু বকর (রাযি.)-র ইলহামের অধিকারী হওয়ার কথা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত উমর ফারুক (রাযি.)-র অন্তরে বৃষ্টি ধারার ন্যায় ইলহাম বর্ষণ মূলতঃ তাঁর বৈশিষ্টমূলক উত্তম গুণাবলীরই পরিচায়ক। আর এ কথা তো সকলেই জানা আছে, প্রায় বাইশটি বিষয়ে হযরত উমর (রাযি.)-র মতামত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছানুরূপ হয়েছিলো। তাফসীর ও হাদীছগ্রন্থগুলোতে তা উল্লেখিত হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য তারীখুল খোলাফা পৃষ্ঠা ৮৭ থেকে ৮৯ দেখুন)

৯ নং কারামাত ঃ

أَخْرَجَ التِّرْمِذِىُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّى لَاَنْظُرُ اِلَى شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ وَالاِنْسِ قَدْ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ (تاريخ الخلفاء) وَاَخْرَجَ اَحْمَدُ مِنْ طَرِيْقِ بُرَيْدَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرُقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ ـ (تاريخ الخلفاء ص ٨٥)

ইমাম তিরমিযি (রহ.) হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষরূপী ও জ্বিনরূপী শয়তান সকলকেই আমি দেখতে পাচ্ছি যে, উমরের ভয়ে পালিয়ে গেছে।

ইমাম আহমদ (রহ.) হযরত বারীদা (রাযি.)-র সনদে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে উমর! শয়তান তোমাকে ভীষণ ভয় পায়।

১০ নং কারামাত ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَجَّهَ عُمَرُ جَيْشًا وَ رَأَسَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً يُدْعَى سَارِيَةَ فَبَيْنَا عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ جَعَلَ يُنَادِى يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ ثَلاَثًا ثُمَّ قَدِمَ رَسُوْلُ الْجَيْشِ فَسَأَلَه عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! هُزِمْنَا فَبَيْنَا نَحْنُ ذَلِكَ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتًا يُنَادِى يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ ثَلاَثًا فَاَسْنَدْنَا ظُهُوْرَنَا اِلَى الْجَبَلِ فَهَزَمَهُمُ اللهُ قَالَ قِيْلَ لِعُمَرَ اِنَّكَ كُنْتَ تَصِيْحُ بِذٰلِكَ وَ ذٰلِكَ الْجَبَلُ الَّذِىْ كَانَ سَارِيَةَ عِنْدَه بِنَهَاوَنْدَ مِنْ اَرْضِ الْعَجَمِ قَالَ اِبْنُ حَجَرٍ فِى الاصابة اسناده حسن ـ (تاريخ الخلفاء)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) একবার হযরত সারিয়া (রাযি.)-র নেতৃত্বে এক বাহিনীকে জেহাদে পাঠিয়েছিলেন। পরে একদিন হযরত উমর (রাযি.) জুমু'আয় মিম্বরে খুৎবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় খুৎবার মাঝেই তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে সরে আসো। এভাবে তিনবার বললেন, (কেননা, পাহাড়ের দিকে সরে আসলে মুসলমানদের অবস্থান হবে সুবিধাজনক এবং তাদের বিজয় হবে অবশ্যম্ভাবী)। কিছুদিন পরে যখন মুসলিম বাহিনীর দূত মদীনায় আগমন করলো তখন হযরত উমর (রাযি.) তার কাছে যুদ্ধের খোজখবর জিজ্ঞাসা করলেন। দূত আরয করলো, হে আমীরুল মুমিনীন! একদিন আমাদের পরাজয় আসন্ন হয়ে পড়েছিলো। এমন সময় হঠাৎ এক আওয়াজ শুনতে পেলাম, যেন কেউ আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলছে, হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে সরে আসো। তিনবার আমরা এ আওয়াজ শুনলাম। অতঃপর আমরা পাহাড়ের দিকে পিছন দিয়ে অবস্থান গ্রহণ করামাত্র আল্লাহ্ পাক মুশরিকদেরকে শোচনীয় পরাজয় দান করলেন। লোকেরা তখন হযরত উমরকে বললো, এজন্যই বুঝি খুৎবার মাঝে আপনি 'হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে সরে আসো' বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন।

হযরত সারিয়া যে পাহাড়ের পাদদেশে লড়াই করছিলেন, সেটা আজমের নাহাওয়ান্দ এলাকার পাহাড়। আল ইছাবাহ গ্রন্থে ইবনে হাজার এ বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন।

১১ নং কারামত ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا لِرَجُلٍ مَا

اسْمُكَ قَالَ جَمْرَةُ قَالَ ابْنُ مَنْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ مِمَّنْ قَالَ مِنَ الْحُرْقَةِ قَالَ اَيْنَ مَسْكَنُكَ قَالَ اَلْحَرَّةُ قَالَ بِاَيِّهَا قَالَ بِذَاتِ لَظَى فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَدْرِكْ اَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ اَهْلَهُ قَدِ احْتَرَقُوا اخرجه ابو القاسم بن بشران فى فوائده ومالك فى المؤطا عن يحى بن سعيد نحوه واخرجه ابن دريد فى الاخبار المشهور وابن الكلبى فى الجامع وغيرهم - (تاريخ الخلفاء)

হযরত ইবনে উমর (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, হযরত উমর (রাযিঃ) একবার জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি ? সে বললো, আমার নাম জামরাহ! তিনি বললেন, কার পুত্র তুমি! সে বললো, শিহাবের পুত্র। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন অঞ্চলে বসবাস করো তোমরা। সে বললো, হাররা অঞ্চলে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হাররা অঞ্চলের কোন উপঅঞ্চলে থাকো। সে বললো, যাতুলাযা এলাকায় (শব্দগুলো আভিধানিক অর্থ হলো যথাক্রমে, জ্বলন্ত অংগার, জ্বলন্ত উল্কা পিণ্ড, প্রদাহ বা জ্বালা, গরম স্ফুলিংগময়) অবশেষে হযরত উমর (রাযি.) বলে উঠলেন, তাড়াতাড়ি পরিবার পরিজনের কাছে ফিরো, তারা সব জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। লোকটি গোত্রে ফিরে গিয়ে দেখতে পেলো সত্যি সত্যিই ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডে সব ছারখার হয়ে গেছে।

এ ঐতিহাসিক ঘটনাটি আবুল কাসিম বিন বাশরান ফাওয়াইদ গ্রন্থে এবং ইমাম মালিক ইয়াহয়া বিন সাঈদের সূত্রে মুআত্তা গ্রন্থে এবং ইবনে দোরায়দ আল আখবারুল মাশহুরা গ্রন্থে এবং ইবনে কালবী আল জামে গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

১২ নং কারামাত ঃ

اَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُحَدِّثُ عُمَرَ بِالْحَدِيْثِ فَكَذَبَهُ الْكِذْبَةَ فَيَقُوْلُ اِحْبِسْ هذه ثُمَّ يُحَدِّثُهُ بِالْحَدِيْثِ فَيَقُوْلُ اِحْبِسْ هذه فَيَقُوْلُ لَهُ كُلَّ مَا حَدَّثْتُكَ حَقٌّ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِىْ اَنْ اَحْبِسَهُ وَ اَخْرَجَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اِنْ كَانَ اَحَدٌ يَعْرِفُ الْكَذِبَ اِذَا حُدِّثَ فَهُوَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ - (باب كرامات عمر تاريخ الخلفاء)

ইবনে 'আসাকির তারিক বিন শিহাব (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন, কোন ব্যক্তি যখন হযরত উমরের সাথে কথা বলতো এবং কথার মাঝে কোন মিথ্যার আশ্রয় নিতো তখন হযরত উমর (রাযি.) সাথে সাথে বলতেন, এ কথাটা মনে রেখো। আবার কথা বলতে শুরু করে যখনই কোন মিথ্যার আশ্রয় নিতো তখনই হযরত উমর বলে উঠতেন, এ কথাটাও মনে রেখো, শেষে লোকটি বলে উঠতো, আপনি যেখানে যেখানে বাঁধা দিয়েছেন সেগুলো আসলেই মিথ্যা কথা ছিলো, অন্য কথাগুলো সত্য কথা।

ইবনে 'আসাকির হযরত হাসান বছরী (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ছাহাবা কেরাম (রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) এর যামানায় এমন কেউ যদি থেকে থাকেন যিনি মিথ্যা কথা ধরে ফেলতে পারেন তাহলে তিনি ছিলেন হযরত উমর।

যে কোন মিথ্যা কথা ধরে ফেলতে পারা ছিলো হযরত উমর (রাযি.)-র ঈমানী কারামত ও অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ এবং তাঁর কারামতের পূর্ণ প্রকাশ। অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে, বিচক্ষণ লোক তো অনেক সময় বিভিন্ন আলামত দেখে অসাধারণ বিষয় অনুধাবন করে ফেলতে পারে। তার জবাব এই যে, বিচক্ষণ লোকদের আন্দাজ অনুমান প্রমাণ ও উপাত্ত ভিত্তিক এবং তাদের অধিকাংশ ধারণা এ কারণে ভুল হয় যে, তারা ঈমানী কারামাত বা অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হয় না। আর ঈমানী কারামতের ক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রমাণ-আলামতের প্রয়োজন পড়ে না। বরং ঈমানী কারামাতের অধিকারী ব্যক্তি স্বয়ং ও স্বতস্ফূর্ত জ্ঞান লাভ করে থাকেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, কাশফযোগে যে ইলম ও জ্ঞান লাভ হয় তা শরীয়তি হুজ্জতরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং নিছক কাশফের ভিত্তিতে কারো প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা জায়েয নেই। কাশফ যোগে লব্ধ জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে গেলে যদি শরীয়তের বাঁধা আসে তাহলে উক্ত কাশফের উপর আমল করা যাবে না। বরং বাহ্যিক তথ্য প্রমাণের আলোকে যে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

১৩ নং কারামাত ঃ

اَخْرَجَ الْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّلَائِلِ عَنْ اَبِى هُدْبَةَ الْحِمْصِىِّ قَالَ اُخْبِرَ عُمَرُ بِاَنَّ اَهْلَ الْعِرَاقِ قَدْ حَصَبُوْا اَمِيْرَهُمْ فَخَرَجَ غَضْبَانَ فَصَلَّى فَسَهَا فِىْ صَلٰوتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ قَدْ لَبَسُوْا عَلَىَّ فَالْبِسْ عَلَيْهِمْ وَعَجِّلْ عَلَيْهِمْ بِالْغُلَامِ الثَّقَفِىِّ يَحْكُمُ فِيْهِمْ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ

وَلَا يَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيْئِهِمْ اَشَارَ بِهِ اِلَى الْحَجَّاجِ قَالَ ابْنُ لَهْيَةَ وَمَا وُلِدَ يَوْمَئِذٍ ـ (تاريخ الخلفاء ص٩١)

বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে আবু হোদবা আল হিমছী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হযরত উমর (রাযি.)-কে একবার জানানো হলো যে, ইরাকীরা আপনার নিযুক্ত প্রশাসককে পাথর মেরেছে। এই অসদাচরণের খবরে হযরত উমর ক্রদ্ধ হলেন। এমনকি নামায আদায় করতে গিয়ে ভুল করে বসলেন এবং সিজদা সহু দিতে হলো। তখন তিনি নামায শেষ করে এই দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! এই জালিম ইরাকীরা আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে যার দরুন আমার নামাযে পর্যন্ত ভুল হয়েছে। সুতরাং তাদেরকেও চরম বিব্রতকর অবস্থায় ফেলুন এবং অতি দ্রুত ছাকাফী যুবকের শাসন তাদের উপর চাপিয়ে দিন। যেন সে তাদের উপর জাহেলী যুগের অনুরূপ শাসন চালায়। সৎ লোকদের সদাচারে যেন সে তুষ্ট না হয় এবং মন্দ লোকের মন্দাচার যেন সে ক্ষমা না করে।

ইমাম বায়হাকী বলেন, ছাকাফী যুবকের শাসন দ্বারা হযরত উমর (রাযি.) হাজ্জাজের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। ইবনে লাহয়াহ্ বলেন, অথচ তখন হাজ্জাজের জন্মও হয় নি।

প্রতিপক্ষ যখন মোকাবেলায় নেমে আসে এবং স্পর্ধা প্রদর্শন করে তখন এধরণের বদদু'আ করার অবকাশ আছে। বলাবাহুল্য যে, হযরত উমর (রাযি.)-র এ দু'আ কবুল হওয়া নিঃসন্দেহে তার একটি বড় কারামাত।

১৪ নং কারামাত ঃ

اَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ الْجِنَّ نَاحَتْ عَلَى عُمَرَ

(تاريخ الخلفاء ص ١٠٣)

ইবনে সা'আদ সোলায়মান বিন ইয়াসার (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রাযি.)-র ইনতিকালের পর জ্বিন জাতিও শোক প্রকাশ করেছে।

১৫ নং কারামাত ঃ

اَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ مَالِك بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سُمِعَ صَوْتٌ بِجَبَلِ تَبَالَةَ حِيْنَ قُتِلَ عُمَرُ :

لِيَبْكِ عَلَى الاسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا فَقَدْ اَوْشَكُوا صَرْعى وَمَا قَدِمَ

الْعَهْدُ وَ اَدْبَرَتْ الدُّنْيَا وَ اَدْبَرَ خَيْرُهَا وَقَدْ مَلَّهَا مَنْ كَانَ يُوْقِنُ بِالوَعْدِ

(تاريخ الخلفاء ص ١٠٣)

ইমাম হাকিম, মালিক বিন দিনার হতে বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রাযি.) যখন নিহত হন তখন তাবালা পাহাড়ের উপর থেকে এই মর্মে এক আওয়াজ আমি শুনতে পেলাম—

"ইসলামের প্রতি যাদের ভালবাসা আছে তাদের উচিত ইসলামের দুরবস্থার উপর শোক প্রকাশ করা, ইসলামী যামানা যদিও প্রাচীন হয় নি, কিন্তু মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে এবং তাদের দুর্বলতা এসে গেছে। পৃথিবী এবং পৃথিবীর যাবতীয় কল্যাণ মুসলমানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মৃত্যুর একীন যার অন্তরে আছে সে এই দুনিয়ার প্রতি বিসাদগ্রস্ত থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

দুনিয়ার যাবতীয় নেয়ামত যেহেতু ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের জীবনই হলো চিরস্থায়ী। এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা 'স্থবির প্রশান্তি' যাকে সুখ ও শান্তি নাম দেয়া হয়েছে তা কিছুতেই লাভ করতে পারে না। আখেরাতের চিন্তা অবশ্যই তাকে বিসাদগ্রস্ত করে রাখবে।

হযরত উমর (রাযিঃ)-র মৃত্যুতে জ্বিন জাতির ক্রন্দন ও শোক প্রকাশ নিঃসন্দেহে হযরত উমর (রাযি.)-র কারামাত।□

১৬ নং কারামাত ঃ

اَخْرَجَ اَبُو الشَّيْخِ فِى كِتَابِ العصْمَة عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مِصْرُ اَتى عَمْرَو بْنَ العَاصِ وَفْدٌ حِيْنَ دَخَلَ يَوْمٌ مِنْ اَشْهُرِ الْعَجَمِ فَقَالُوا يَا اَيُّهَا الاَمِيْرُ! اِنَّ لِنِيْلِنَا هذَا سُنَّةً لَا يَجْرِى اِلَّا بِهَا قَالَ وَمَا ذَالِكَ قَالُوا اِذَا كَانَ اِحْدى عَشَرَةَ لَيْلَةً تَخْلُو مِنْ هذَا الشَّهْرِ عَمَدْنَا اِلى جَارِيَةٍ بِكْرٍ بَيْنَ اَبَوَيْهَا فَارْضَيْنَا اَبَوَيْهَا وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ اَفْضَلَ مَا يَكُوْنُ ثُمَّ اَلْقَيْنَاهَا فِى النِّيْلِ فَقَالَ لَهُمْ عَمْرٌو اِنَّ هذَا لَايَكُوْنُ اَبَدًا فِى الاسْلَامِ وَ اِنَّ الاسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه فَاَقَامُوْا وَالنِّيْلُ لَا يَجْرِى قَلِيْلاً وَلَا كَثِيْرًا حَتّى هَمُّوا بِالجَلَاءِ فَلَمَّا رَاى ذلِكَ عَمْرٌو كَتَبَ اِلى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بِذلِكَ فَكَتَبَ لَه اَنْ قَدْ اَصَبْتَ بِالَّذِىْ فَعَلْتَ وَاِنَّ الاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا

كَانَ قَبْلَه وَبَعَثَ بِطَاقَةً فِى دَاخِلِ كِتَابِه وَكَتَبَ اِلَى عَمْرٍو اِنِّى قَدْ بَعَثْتُ بِطَاقَةً فِى دَاخِلِ كِتَابِى فَاَلْقِه فِى النِّيْلِ فَلَمَّا قَدِمَ كِتَابُ عُمَرَ اِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَخَذَ الْبِطَاقَةَ فَفَتَحَهَا فَاِذَا فِيْهَا مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَى نِيْلِ مِصْرَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنْ كُنْتَ تَجْرِىْ مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِ وَ اِنْ كَانَ اللهُ يَجْرِيْكَ فَاَسْاَلُ اللهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ اَنْ يُجْرِيْكَ فَاَلْقَى الْبِطَاقَةَ فِى النِّيْلِ قَبْلَ الصَّلِيْبِ بِيَوْمٍ فَاَصْبَحُوْا وَقَدْ اَجْرَاهُ اللهُ تَعَالَى سِتَّةَ عَشَرَ ذِرَاعًا فِى لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَعَ اللهُ تِلْكَ السُّنَّةَ عَنْ اَهْلِ مِصْرَ اِلَى الْيَوْمِ ـ (تاريخ الخلفاء ص ٩٠-٩١)

হাফেযুল হাদীছ আবুশ শায়খ (রহ.)-র কিতাবুল ইছমত গ্রন্থে কায়স বিন হাজ্জাজ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আর কায়স বর্ণনা করেছেন তার উপরস্থ রাবীর কাছ থেকে। তিনি বলেন, মিশর বিজয়ের পর অনারব বর্ষপঞ্জীর কোন এক মাসের প্রথম তারিখে একদল লোক মিশরের শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনুল আছ (রাযি.)-র খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলো, এই নীলনদকে কেন্দ্র করে আমাদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান রয়েছে, তা পালন না করা পর্যন্ত নীলনদের পানি প্রবাহে প্রাচুর্য আসবে না। হযরত আমর ইবনুল আছ (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানটা কী ? তারা বললো, আমাদের রীতি এই যে, প্রতি বছর এই সময়ে যুবতী বয়সের পিতা-মাতার একমাত্র কুমারী কন্যাকে মা-বাবাকে রাজি করিয়ে নিয়ে আসি। অতঃপর তাকে স্নান করিয়ে সর্বোত্তম পোশাক ও অলংকারে সজ্জিত করে নীলনদে বিসর্জন দান করি। হযরত আমর ইবনুল আছ সব শুনে বললেন, এসব হচ্ছে জাহেলী যুগের রসম-রেওয়াজ। আল্লাহ্‌র কসম! ইসলামী শাসনাধীনে এ ধরণের কাজ কিছুতেই হতে পারে না। কেনান ইসলাম জাহেলী যুগের যাবতীয় আচার-প্রথা নিষিদ্ধ করেছে। মিশরীয়রা তখন নিরব হয়ে চলে গেল এবং সে বছর কুমারী বিসর্জন দানের অনুষ্ঠান পালিত না হওয়ায় নীলনদের প্রবাহ থেমে থাকলো। তখন লোকেরা দেশ ত্যাগের মনস্থ করল। হযরত আমর ইবনুল আছ সমগ্র অবস্থা আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাবকে লিখে জানালেন। চিঠির জবাবে হযরত উমর লিখলেন, হে আমর বিন আছ! তুমি যা করেছো ঠিকই করেছো। তোমার মতামত নির্ভুল। ইসলাম জাহেলী যুগের রসম-রেওয়াজের মূলোৎপাটন করেছে।

তিনি আরো লিখলেন, তোমার চিঠির সাথে আমি আলাদা একটি চিরকুট পাঠাচ্ছি। সেটা তুমি নীলনদে ফেলে দিও।

হযরত আমর বিন আছ আলাদা চিরকুটটি পড়লেন, তাতে লেখা ছিলো—

'আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ থেকে মিশরের নীলনদের নামে।

হামদ ছালাতের পর। যদি তুমি নিজের ক্ষমতায় প্রবাহিত হয়ে থাকো তাহলে প্রবাহিত হয়ো না। আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে প্রবাহিত করে থাকেন তাহলে মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করছি যেন তিনি তোমাকে প্রবাহিত করে দেন। আমর ইবনুল আছ ষ্টার ক্রসের একদিন পূর্বে রাতের বেলা এই হুকুমনামা নীলনদে নিক্ষেপ করলেন। পরদিন ভোরে লোকেরা দেখতে পেলো রাতের মধ্যেই নীলনদের পানি ষোল হাত উঁচু করে আল্লাহ্ পাক প্রবাহিত করে দিয়েছেন। এভাবে মিশরবাসীকে চিরজীবনের জন্য নীলনদে কুমারী বিসর্জন দানের বর্বর প্রথা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

ফারূকী হুকুমনামায় ان كان শব্দ দ্বারা এ ধরণের সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন শক্তির হাতে বুঝি আছে। নাউযুবিল্লাহ্! বরং এ ধরণের বর্ণনাভঙ্গী শুধু মূল বক্তব্যে তাকীদ ও জোর প্রদানের জন্য ব্যবহৃদ হয়। অর্থাৎ কোন সন্দেহ নেই যে, হে নীলনদ! আল্লাহ্‌র হুকুমেই তুমি প্রবাহিত হয়ে থাকো। নিজের উপর তোমার কোনই নিয়ন্ত্রণ নেই। 'প্রবাহিত হয়ো না' কথাটাও হুমকি ও তিরস্কার স্বরূপ। কেননা বলাইবাহুল্য যে, প্রবাহিত হওয়া না হওয়া কোনটারই এখতিয়ার নীলনদের নেই। প্রকৃত অবস্থা এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস তাকে ভয় করতে থাকে। আল্লাহ্‌কে ভয় করে সব কিছুর উপরই তার হুকুমত ও কর্তৃত্ব চলে।

১৭ নং কারামত ঃ

عَنْ يَحْىَ بْنِ اَيُّوْبَ الْخُزَاعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَنَّه ذَهَبَ اِلَى قَبْرِ شَابٍّ فَنَادَاهُ يَا فُلَانُ! وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه جَنَّتٰنِ فَاَجَابَه الْفَتَى مِنْ دَاخِلِ الْقَبْرِ يَا عُمَرُ! قَدْ اَعْطَانِيْهَا رَبِّىْ فِى الْجَنَّةِ مَرَّتَيْنِ ، وَالْقِصَّةُ بِطُوْلِهَا مَعْزُوَّةٌ لِابْنِ عَسَاكِر ـ (قرة العينين ص ٩٧-٩٨)

ইয়াহয়া বিন আইউব খোযায়ী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব সম্পর্কে আলোচনাকারী জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে, হযরত উমর

ইবনুল খাত্তাব একবার জনৈক যুবকের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। এবং ডাক দিয়ে বললেন, হে অমুক! জীবিত অবস্থায় যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে তার জন্য জান্নাতে রয়েছে দুটি উদ্যান। (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٰنِ আয়াতের অর্থ। এটা সূরা রহমানে রয়েছে)। তখন যুবক কবরের ভিতর হতে জওয়াব দিলেন, হে উমর ফারুক! আমাকে আল্লাহ্ এ ধরণের বাগান দুই বার দান করেছেন। ঘটনাটি আগাগোড়া ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন।

১৮ নং কারামাত ঃ

عَنْ مِعْدَانَ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ فِى قِصَّةٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى قَدْ رَاَيْتُ رُؤْيَا كَاَنَّ دِيْكًا اَحْمَرَ نَقَرَنِى نَقْرَتَيْنِ وَلَا اَرٰى ذٰلِكَ اِلَّا لِحُضُوْرِ اَجَلِىْ اَخرجه ابن ابى شيبة ـ (قرة العينين ص ١٠٣)

একটি ঘটনা প্রসঙ্গে মি'দান ইবনে আবু তালহা বর্ণনা করেন যে, একবার উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বললেন, হে লোক সকল! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি লাল মোরগ আমাকে দুবার ঠোকর দিয়েছে। এ স্বপ্ন দেখার কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। ইবনে আবু শায়বা এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

যেহেতু এ স্বপ্ন ছিলো কাশফ ও ইলহামেরই এক প্রকার। কেননা পরবর্তীতে তার মৃত্যুর মাধ্যমে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু এই স্বপ্নও ছিলো হযরত উমর (রাযি.)-র একটি বিশেষ কারামাত।

১৯ নং কারামাত ঃ

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَوْ نُحَدَّثُ اَنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَانَتْ مُصَفَّدَةً فِى اِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا اُصِيْبَ بُثَّتْ رواه ابن عساكر ـ (كنز العمال ج٦ ص٣٣٦)

হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা বলাবলি করতাম যে, উমর (রাযি.)-র শাসনকালে সমস্ত শয়তান বন্দী অবস্থায় ছিলো। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সকল শয়তান চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। (ইবনে আসাকির এ আলোচনা বর্ণনা করেছেন।)

২০ নং কারামাত ঃ

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ لِشَىْءٍ قَطُّ اِنِّى لَاَظُنُّهُ كَذَا اِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ اِبْنُ عُمَرَ جَلَسَ اِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَقَدْ اَخْطَاَ ظَنِّىْ وَاَنَّ هٰذَا عَلٰى دِيْنِهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ عَلَىَّ الرَّجُلَ فَدُعِىَ لَه فَقَالَ لَه عُمَرُ لَقَدْ اَخْطَاَ ظَنِّىْ وَاَنَّكَ لَعَلٰى دِيْنِكَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَلَقَدْ كُنْتَ كَاهِنَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ مَا رَاَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْزِمُ عَلَيْكَ اِلَّا مَا اَخْبَرْتَنِىْ قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَخْرَجَهُ الْبُخَارِى ـ (تيسير ص ١٤٥ ج٢)

হযরত ছালেম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রাযি.)-কে যখনই কোন বিষয় সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, আমার এরূপ ধারণা হয় তখন সেটা তাঁর ধারণা মুতাবেকই হতো। একবার তিনি বসা ছিলেন। এমন সময় একজন লোক তার পাশ দিয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, আমার ধারণা দেখি ভুল হয়ে গেল। এ লোক তো জাহেলী যুগে গণক ছিলো এবং এখনো নিজের পুরনো ধর্মেই বহাল আছে। লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে আসো তো। লোকটিকে ডেকে আনা হলে হযরত উমর ফারূক (রাযি.) বললেন, আমার এ ধারণা কি মিথ্যা যে, তুমি এখনো তোমার পুরণো ধর্মে বহাল আছো এবং জাহেলী যুগে তুমি গণক ছিলে। লোকটি উত্তরে বললো, আজ পর্যন্ত আপনার মতো মুসলমান আমি দেখি নি। তিনি বললেন, আচ্ছা, এখন তুমি আমাকে তোমার পুরো অবস্থা বলো। তখন গণক স্বীকার করে বললো, হাঁ জাহেলী যুগে আমি গণক ছিলাম। ইমাম বুখারী এ রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

হযরত উছমান (রাযি.)-র কারামত

২১ নং কারামাত ঃ

عَنْ مَالِكٍ وَكَانَ (اَىْ عُثْمَانُ مَقْتُوْلًا) عَلٰى بَابٍ وَاَنَّ رَاْسَهُ لَيَقُوْلُ طَقْ ، طَقْ حَتّٰى صَارُوْا بِهِ اِلٰى حَشِّ كَوْكَبٍ فَاحْتَفَرُوْا لَه ـ (الاستيعاب ص ٤٩١ ج٢)

হযরত ইমাম মালিক (রহ.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উছমান (রাযি.) নিহত হওয়ার পর তাঁর জানাযা দরজার সামনে রাখা ছিলো। তখন তার পবিত্র যবান থেকে طق طق (দাফন কর, দাফন কর,) শব্দ বের হচ্ছিল। তখন তাঁর পবিত্র জানাযা বাগে কাওকাবে পৌছানো হলো এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হলো।

২২ নং কারামত ঃ

وَفِى الْقِصَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ قَالَ مَالِكٌ وَكَانَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَمُرُّ بِحَشِّ كَوْكَبٍ فَيَقُوْلُ انَّه سَيُدْفَنُ هٰهُنَا رَجُلٌ صَالِحٌ ـ

উপরোল্লেখিত ঘটনা প্রসঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে যে, উছমান (রাযি.) যখনই বাগে কাওকাব নামক স্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন তখন বলতেন, এখানে একজন নেককার মানুষ দাফন হবে।

পরে দেখা গেল যে, তিনি নিজেই সেখানে দাফন হয়েছেন। সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেলো, কারামত হিসাবে নিজের সম্পর্কেই তিনি প্রচ্ছন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

২৩ নং কারামত ঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ عُثْمَانَ اَصْبَحَ فَحَدَّثَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَنَامِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ! اَفْطِرْ عِنْدَنَا فَاَصْبَحَ عُثْمَانُ صَائِمًا فَقُتِلَ مِنْ يَوْمِه ـ (اخرجه الحاكم)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযি.) বলেন, একদিন সকালে হযরত উছমান (রাযি.) বললেন, রাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি বলছেন, হে উছমান! আমাদের এখানে এসে ইফতার করো। তাই সেদিন উছমান (রাযি.) রোযা রাখলেন এবং সেদিনই শহীদ হলেন। হাকীম (রহ.) এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

হাকিম (রহ.) আরো লিখেছেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উছমানকে স্বপ্নযোগে এ কথাও বলেছিলেন, হে উছমান! তুমি শুক্রবারে আমাদের কাছে এসে যাবে। যেহেতু জুমু'আর দিনেই তিনি রোযা অবস্থায় শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, সেহেতু স্বপ্নের অধিক কোন ব্যাখ্যারই আর প্রয়োজন নেই। এই স্বপ্ন হযরত উছমানের কারামত নয়ত কি ?

২৪ নং কারামত ঃ

عَنْ مِحْجَنٍ مَولى عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ فِىْ اَرْضِه فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ اَعْرَابِيَّةٌ بِضُرٍّ فَقَالَتْ انِّىْ قَدْ زَنَيْتُ فَقَالَ اَخْرِجْهَا يَا مِحْجَنُ!

فَاَخْرَجْتُهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَتْ انِّى قَدْ زَنَيْتُ فَقَالَ اَخْرِجْهَا يَا مِحْجَنُ فَاَخْرَجْتُهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَتْ انِّى قَدْ زَنَيْتُ فَقَالَ عُثْمَانُ وَيْحَكَ يَا مِحْجَنُ اُرَاهَا بِضُرٍّ وَانَّ الضُّرَّ يَحْمِلُ عَلَى الشَّرِّ فَاذْهَبْ بِهَا فَضمَّهَا الَيْكَ فَاَشْبِعْهَا وَاكْسُهَا فَذَهَبْتُ بِهَا فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ بِهَا حَتّٰى رَجَعْتُ الَيْهَا نَفْسُهَا ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ اَوْقِرْ لَهَا عِمَارًا مِنْ تَمْرٍ وَ دَقِيْقٍ وَ زَبِيْبٍ ثُمَّ اذْهَبْ بِهَا فَاِذَا مَرَّ قَوْمٌ يَغْدُوْنَ بَادِيَةَ اَهْلِهَا فَضمَّهَا الَيْهِمْ ثُمَّ قُلْ لَهُمْ يُؤَدُّوْهَا الى اَهْلِهَا فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ بِهَا فَبَيْنَا انَا اَسِيْرُ بِهَا اذْ قُلْتُ لَهَا اَتُقِرِّيْنَ بِمَا اَقْرَرْتِ بِه بَيْنَ يَدَىْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ لَا انَّمَا قُلْتُ ذٰلِكَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَنِىْ ـ (رواه العقيل)

হযরত উছমান (রাযি.)-র আদায়কৃত গোলাম মিহ্জান বলেন, একদিন আমি হযরত উছমানের সাথে এক স্থানে গেলাম। সেখানে এক মহিলা ব্যথায় অস্থির ছিলো। সে হযরত উছমান (রাযি.)-র খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার দ্বারা যিনার অপরাধ হয়েছে। হযরত উছমান তখন আমাকে আদেশ করলেন, এই নারীকে বের করে দাও। আমি তাকে তাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে সে পুনরায় বলল, আমি যিনা করেছি। হযরত উছমান (রাযি.) বললেন, হে মিহ্জান! একে বাইরে বের করে দাও। আমি তাকে দূরে তাড়িয়ে দিলাম। তৃতীয়বার ফিরে এসে সে আবার বলল, হে খলীফাতুল মুসলিমীন! অবশ্যই আমি যিনা করেছি। (আমার তিনবার স্বীকারোক্তি করার পর শরীয়তের হুকুম মুতাবিক আমার উপর হদ জারী করুন)। তখন হযরত উছমান (রাযি.) বললেন, হে মিহ্জান! এ নারীর উপর দেখি বিরাট বিপদ এসে গেছে! আর বিপদ কষ্ট সর্বদা মন্দের কারণ হয়ে থাকে। একে তুমি সাথে নিয়ে যাও এবং পেট ভরে রুটি এবং শরীর ঢাকার কাপড়ের

ব্যবস্থা করে দাও। সেই পাগলীকে আমি সাথে নিয়ে গেলাম এবং আমীরুল মুমিনীনের হুকুম মোতাবেক সব ব্যবস্থা করে দিলাম। কিছু দিন পর যখন তার হুঁশজ্ঞান ফিরলো এবং কষ্ট দূর হলো তখন হযরত উছমান বললেন, আচ্ছা এখন গাধার পিঠে খেজুর, আটা ও কিশমিশ বোঝাই করে তাকে মরুপল্লীর বাসিন্দাদের কাছে নিয়ে যাও এবং তাদেরকে বলো, যেন তারা এ নারীকে তার গোষ্ঠীর লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়। আমি গাধার পিঠে সব বোঝাই করে তাকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলাম। পথে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমীরুল মুমিনীনের সামনে তুমি যা স্বীকার করেছিলে এখনো কি তা স্বীকার করো ? উত্তরে সে বলতে লাগল, না। মোটেই না। তখন তো সে কথা শুধু এজন্য বলেছিলাম যে, আমার উপর কষ্টের পাহাড় চেপে বসেছিলো। তাই আমি চাচ্ছিলাম যেন আমার উপর যিনার হদ জারী করা হয়, আর মৃত্যুর মাধ্যমে এই কষ্ট থেকে আমি উদ্ধার লাভ করি। উকায়লী (রহ.) এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

দেখুন, এটা ছিলো হযরত উছমান (রাযি.)-র ইলহাম যোগে কাশফ বা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ, যা পরে সত্য প্রমাণিত হলো। এটা ছিলো তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রাযি.)-র এক জিন্দা কারামত। তাঁর অসংখ্য কারামাতের মধ্য থেকে কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করলাম।

হযরত আলী (রাযি.) এর কারামত

২৫ নং কারামত ঃ

قَالَ عَلِىٌّ اَمَا اِنَّ هٰذَا فَقَاتِلِى قِيلَ فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْهُ قَالَ اِنَّه لَمْ يَقْتُلْنِىْ بَعْدُ ـ (الاستيعاب ص٤٧٣ ج٢)

আলী (রাযি.) ইবনে মুলজামের দিকে ইশারা করে বললেন, শুনে রাখো ; এ লোক আমাকে হত্যা করবে। সকলে তখন আরয করলো, তাহলে একে ধরতে আপনার বাঁধা কোথায় ? তিনি বললেন, এখনো তো সে আমাকে হত্যা করে নি। সুতরাং কোন্ অপরাধে তাকে ধরতে পারি ?

শেষ পর্যন্ত সেই মর্মবিদারক ঘটনাই সংঘটিত হলো। অভিশপ্ত ইবনে মুলজাম হযরত আলী (রাযি.)-কে শহীদ করে দিলো।

দেখুন ; ছাহাবা কেরামের প্রতিটি কথার মধ্যে কারামত ও কাশফ-ইলহামের কেমন জিন্দা নমুনা প্রকাশ পেতো।

২৬ নং কারামত ঃ

اَخْرَجَ الطَّبْرَانِىُّ فِى الاَوْسَطِ وَ اَبُو نَعِيْمٍ فِى الدَّلاَئِلِ عَنْ رَاذَانَ اَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَ بِحَدِيْثٍ وَ كَذَّبَه رَجُلٌ فَقَالَ لَه عَلِىٌّ اَدْعُو عَلَيْكَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا قَالَ اُدْعُ فَدَعَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْرَحْ حَتّٰى ذَهَبَ بَصَرُه ـ (تاريخ الخلفاء ص ١٢٥-١٢٦)

তাবরানী কিতাবুল আওসাত গ্রন্থে এবং আবু নঈম দালায়েল গ্রন্থে হযরত রাযান হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাযিঃ) একবার কিছু কথা বললেন, আর জনৈক ব্যক্তি তাঁর কথাকে মিথ্যা বলে দাবী করলো। তখন আলী (রাযি.) বললেন, যদি তুমি মিথ্যা বলে থাকো তাহলে তোমাকে আমি বদদু'আ দেবো। সে বলল, করুন দেখি বদদু'আ। হযরত আলী তখন বদদু'আ করলেন আর সাথে সাথে সে অন্ধ হয়ে গেল।

দেখুন ; হযরত আলী (রাযি.) প্রথমে তাকে সতর্ক করেছিলেন যে, তোমাকে বদদু'আ দিয়ে এখনই আমি প্রকাশ করে দিতে পারি যে, কে আসল মিথ্যাবাদী। সুতরাং এখনও সময় আছে তুমি সতর্ক হও। কিন্তু সেই নাদান নিজের মিথ্যা ঢাকা দেয়ার জন্য স্পর্ধার সাথে বললো যে, আমি মিথ্যাবাদী হলেই না আপনার বদদু'আ আমার উপর লাগবে। করুন না দেখি বদদু'আ। তখন হযরত আলী (রাযি.) নিজের সত্যবাদিতা প্রকাশ করার জন্য বদদু'আ করলেন, আর সাথে সাথেই লোকটির অন্ধত্বের মাধ্যমে তাঁর কারামতের প্রকাশ ঘটলো।

২৭ নং কারামত ঃ

عَنْ اَبِىْ يَحْىٰ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَنَا عَبْدُ اللهِ وَ اَخُو رَسُوْلِه لاَ يَقُوْلُهَا اَحَدٌ بَعْدِى اِلاَّ كَاذِبٌ فَقَالَ رَجُلٌ فَاَصَابَتْهُ جُنَّةٌ ـ رواه العدنى (كنز العمال ص ١٩٦ ج٢)

আবু ইয়াহয়া হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত আলী (রাযি.)-কে একবার বলতে শুনলাম, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূলের ভাই। এ কথা আমাকে ছাড়া যে বলবে সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আমীরুল মুমিনীনের উপস্থিতিতেই সে ব্যক্তি কথা ক'টি উচ্চারণ করলো আর সাথে সাথেই সে পাগল হয়ে গেল।

২৮ নং কারামত ঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى قَالَ خَطَبَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ اَنْشُدُ اللهَ اَمْرَأً نَشْدَةَ الاِسْلَامِ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ اَخَذَ بِيَدِى يَقُوْلُ اَلَسْتُ اَوْلٰى بِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ اَنْفُسِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلَاهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَلَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ اِلَّا قَامَ فَشَهِدَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَشَهِدُوْا وَكَتَمَ قَوْمٌ فَمَا فَنُوا مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا عَمُوْا وَبَرِصُوْا ـ رواه الخطيب فى الافراد (كنز العمال ص ٣٩٧ ج ٦)

আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা বলেন, হযরত আলী (রাযি.) একবার খুৎবা দানকালে বললেন, আমি আল্লাহ্‌র নামে ইসলামী কসম দিয়ে এমন প্রতিটি লোককে সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করছি, যারা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীছ শুনেছে যে, গাদীরে খাম নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বলেছিলেন, হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় নই ? সকলে এক বাক্যে স্বীকার করে বললো, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যার কাছে প্রিয়, আলীও তার কাছে প্রিয়। হে আল্লাহ্! যে আলীকে ভালবাসবে তুমিও তাকে ভালোবেসো। যে আলীর সাথে শত্রুতা করবে তুমিও তার প্রতি শত্রুতা পোষন করো। হে আল্লাহ্! যে আলীকে সাহায্য করবে, তুমিও তাকে সাহায্য করো। আলীকে যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দেবে তুমি তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দিও। (রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীছ যারা শুনেছো তারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাক্ষ্য দাও)। দশ/বারোজন মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে হাদীছের সত্যতার সাক্ষ্য দিলেন, কিন্তু একদল লোক সাক্ষ্য গোপন করলো। তারা সকলে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে অন্ধ অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলো। আল ইফরাদ গ্রন্থে খতীব (রহ.) এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

দেখুন ; হযরত আলী (রাযি.)-র কেমন যিন্দা কারামত এটা যে, শুধু তার পক্ষে সাক্ষ্য না দেয়ার কারণে এতগুলো মানুষ কেমন শোচনীয়ভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো।

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ كُلِّ الْخَطَايَا

(হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সর্বপ্রকার গোনাখাতা হতে হেফাযত করুন।)

২৯ নং কারামত ঃ

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عُرِضَ لِعَلِىٍّ رَجُلَانِ فِى خُصُوْمَةٍ فَجَلَسَ فِى اَصْلِ جِدَارٍ فَقَالَ رَجُلٌ الجِدَارُ فَقَالَ امْضِ كَفٰى بِاللهِ حَارِسًا فَقَضٰى بَيْنَهُمَا وَقَامَ ثُمَّ سَقَطَ الْجِدَارُ ـ رواه ابو نعيم فى الدلائل (كنز العمال ص ٤٠٢ ج ٢)

জাফর বিন মুহাম্মদ তার পিতা ইমাম মুহাম্মদ বিন বাকের হতে বর্ণনা করেন যে, দুই ব্যক্তি তাদের বিবাদের মীমাংসার জন্য হযরত আলী (রাযি.)-র দরবারে হাজির হলো। তিনি তাদের বক্তব্য শোনার পর এক দেয়ালের নীচে বসলেন। তখন তাদের একজন বলে উঠলো, দেয়াল পড়ে যাচ্ছে। হযরত আলী শান্ত স্বরে বললেন, তুমি তোমার বক্তব্য বলে যাও। হিফাযতের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। হযরত আলী (রাযি.) তাদের বক্তব্য শুনে ফায়সালা করে উঠে দাঁড়ালেন আর সেই মুহূর্তে দেয়াল ধ্বসে পড়লো। আবু নঈম (রহ.) দালায়েল গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৩০ নং কারামত

عَنْ اَبِى الْبُخْتَرِىِّ اَنَّ رَجُلًا اَتٰى عَلِيًّا فَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ بَلَغَهُ عَنْهُ قَبْلَ ذٰلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ لَيْسَ مَا تَقُوْلُ وَ اَنَا فَوْقَ مَا فِى نَفْسِكَ ـ رواه ابن ابى الدنيا وابن عساكر (كنز العمال ص ٤٠٩ ج ٢)

আবুল বুখতারী হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাযি.)-র খিদমতে হাজির হয়ে উচ্ছসিত ভাষায় তার প্রশংসা করতে লাগল। হযরত আলী (রাযি.) পূর্ব থেকে তার সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন, তাই তিনি বললেন, তুমি যা বলছো তা তোমার আন্তরিক কথা নয়। আর তোমার অন্তরে যে ধারণা আছে আমি তার চে' অনেক উত্তম। ইবনে আবুদ্দুনিয়া ও ইবনে আসাকির এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ আল্লাহ্ আমার মরতবা অনেক বুলন্দ করেছেন। তোমার মিথ্যা

প্রশংসার কোন প্রয়োজন নেই। হযরত আলী (রাযি.) কাশফযোগে তার মুনাফেকীর বিষয় অবগত হয়েছিলেন। এটা তাঁর এক বড় কারামত।

৩১ নং কারামত

عَنْ جَعْفَرٍ لَمَّا دَخَلَ رَمضانُ كَانَ عَلِيٌّ يُفْطِرُ عِنْدَ الْحَسَنِ لَيْلَةً وَعِنْدَ الْحُسَيْنِ لَيْلَةً وَ لَيْلَةً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ لاَ يَزِيْدُ عَلَى اللُّقْمَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَقِيْلَ لَه فَقَالَ اِنَّمَا هِيَ لَيَالٍ قَلاَئِلُ يَاْتِىْ اَمْرُ اللهِ وَاَنَا خَمِيْصٌ فَقُتِلَ مِنْ لَيْلَةٍ رواه العسكرى ـ (كنز العمال ص ٤٠٩ ج ٦)

হযরত জাফর ছাদেক বর্ণনা করেন, রমযান মাস এসে গিয়েছিলো সে সময়। তখন হযরত আলী (রাযি.) এক রাতে হাসানের কাছে আরেক রাতে হোসায়নের কাছে এবং আরেক রাতে আব্দুল্লাহ্ ইবনে জা'ফরের কাছে ইফতার করতেন। কিন্তু দুই লোকমার বেশী আহার গ্রহণ করতেন না। তাঁর এত সল্পাহার দেখে সকলেই তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি বললেন, অল্প কয়েক রাত বাকী আছে মাত্র। ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই আল্লাহ্র হুকুম (মৃত্যু) আমার কাছে এসে যাবে। পরে এক রাতে তাকে শহীদ করা হলো। আল আসকারী (রহ.) এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৩২ নং কারামত ঃ

عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقِيَنِىْ حَبِيْبِىْ فِى الْمَنَامِ يَعْنِىْ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ فَشَكَوْتُ اِلَيْهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ بَعْدَه فَوَعَدَنِىْ الرَّحْمَةَ مِنْهُمْ الى قريب فما بعث الا ثلاثا ـ رواه العدنى (كنز العمال ص ٤١١ ج ٦)

হযরত হাসান ও হোসায়ন (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রাযি.) একবার বললেন, আমার প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে আমাকে যিয়ারত দান করলেন। তখন আমি তাঁর খিদমতে তাঁর দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর আমার সাথে ইরাকবাসীদের কষ্টদায়ক দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করলাম। তিনি অচিরেই তাদের দুর্ব্যবহার থেকে আরাম লাভের

ওয়াদা আমাকে দিলেন। তারপর মাত্র তিন দিন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন। আদনী এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৩৩ নং কারামত ঃ

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجَ عَلِيٌّ اِلى الفَجْرِ فَاَقْبَلَ الوَزُّ يَصِحْنَ فِى وَجْهِه فَطَرَدُوهُنَّ عَنْهُ فَقَالَ ذَرُوهُنَّ فَاِنَّهُنَّ نَوَائِحُ فَضَرَبَه ابْنُ مُلْجِمٍ ـ رواه ابن عساكر (كنز العمال ص ٤١٣ ج ٦)

হাসান বিন কাছীর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রাযি.) ফজরের নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় কতগুলো হাঁস তাঁর সামনে এসে তাঁকে দেখে আওয়া করতে লাগলো। লোকেরা সেগুলোকে তাঁর সামনে থেকে তাড়াতে লাগলো। তখন তিনি লোকদের বাঁধা দিয়ে বললেন, ছেড়ে দাও। এরা শোক প্রকাশ করছে। এরপরেই ইবনে মুলজাম তাঁকে শহীদ করে দিলো। ইবনে আসাকির এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৩৪ নং কারামত ঃ

عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ خَطَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيْهِ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَعَثَه فِى سَرِيَّةٍ كَانَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِيْنِه وَمِيْكَائِيلُ عَنْ يَسَارِه فَلاَ يَرْجِعُ حَتّٰى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ـ رواه ابن ابى شيبة (كنز العمال ص ٤١٢ ج ٦)

আছিম বিন যুমরাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান বিন আলী একবার খুৎবা দানকালে বললেন, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার পিতা আলী (রাযি.)-কে কোন জিহাদে পাঠাতেন তখন তাঁর ডান পাশে হযরত জিবরীল এবং বাম পাশে হযরত মিকাঈল থাকতেন এবং তিনি যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসতেন।

অর্থাৎ যুদ্ধে হযরত আলীকে আল্লাহ্ পাক জিবরীল ও মিকাঈলের মাধ্যমে সাহায্য করতেন। ফলে যুদ্ধে তার জয় হতো। ইবনে আবী শায়বা এ রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

৩৫ নং কারামত ঃ

عَنْ اَبِى رَافِعٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ حِيْنَ بَعَثَه رَسُوْلُ الله صلّى الله عليه وسلم بِرَايَتِه فَلَمَّا دَنَا مِنَ الحِصْنِ خَرَجَ اِلَيْه اَهْلُه فَقَاتَلَهُمْ فَضَرَبَه رَجُلٌ مِنَ اليَهُوْدِ فَطَرَحَ قُرْسَه من يَدِه فَتَنَاوَلَ عَلِىٌّ بَابًا كَانَ عِنْدَ الحِصْنِ فَتَرَسَ نَفْسَه فَلَمْ يَزَلْ فِى يَدِه وَهُوَ يُقَاتِلُ حَتّٰى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ اَلْقَاهُ مِنْ يَدِه حِيْنَ فَرَغَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِى فِى سَفَرٍ مَعِى سَبْعًا اُنَاسًا مِنْهُمْ نَجْهَدُ عَلٰى اَنْ نُقَلِّبَ ذٰلِكَ الْبَابَ رواه احمد (الرحمة المهداة ص ٢١٦)

আবু রাফে (রাযি.) বলেন, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপন ঝাণ্ডা দিয়ে হযরত আলী (রাযি.)-কে খায়বারের দিকে রওয়ানা করলেন, তখন আমরা তার সাথে ছিলাম। আমরা যখন খায়বার দুর্গের নিকটে পৌঁছলাম তখন খায়বারবাসীরা তার মোকাবেলায় নেমে আসলো এবং তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তিনিও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন। তখন জনৈক ইহুদী তার উপর এমনভাবে হামলা করলো যে, তার হাতের ঢাল পড়ে গেলো। তখন আলী (রাযি.) দুর্গের একটি দরজা উপড়ে ফেলে সেটাকে ঢালরূপে ব্যবহার করলেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন, এবং যুদ্ধ জয় করার পর হাত থেকে উক্ত ঢালরূপী দরজা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ঐ যুদ্ধে আমার সাথে আরো সাতজন যোদ্ধা ছিলো। আমরা আটজন মিলে দরজাকে উল্টাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। যে দরজা হযরত আলী এক হাতে ঢালরূপে ব্যবহার করেছিলেন, সেটাকে আমরা আটজন মিলে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও উল্টাতে পারলাম না। ইমাম আহমদ এ রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

৩৬ নং কারামাত ঃ

رَوَى البَيْهَقِى فِى دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ فِىْ قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ وَجَاءَتِ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوا صَوْتًا مِنْ نَاحِيَةِ البَيْتِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه اِنَّ فِى الله عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِاللهِ فَاتَّقُوا وَاِيَّاهُ فَارْجُوْا فَاِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ فَقَالَ عَلِىٌّ اَتَدْرُوْنَ مَنْ هٰذَا هُوَ الخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ (مشكوة ص ٥٥ ج ٢)

ইমাম বায়হাকী বর্ণিত এক দীর্ঘ ঘটনার অংশবিশেষ এরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর যখন শোকগ্রস্ত একে অন্যকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলো, তখন ছাহাবা কেরাম ঘরের কোণা থেকে এই মর্মে আওয়াজ শুনতে পেলেন—হে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকেরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ পাক চিরঞ্জীব। তিনি সকল বিপদই দূর করে দেন। তিনিই বান্দাদের দুঃখ দূর করেন। সকল হারিয়ে যাওয়া বস্তুর তিনি হলেন উত্তম বিনিময়। সুতরাং তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র প্রতি আশা-ভরসা রাখো। কেননা আসল বিপদগ্রস্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে দাওয়াত থেকে বঞ্চিত হয় এবং হতাশাগ্রস্ত হয়।

হযরত আলী (রাযি.) তখন লোকদের বললেন, তোমরা জানো এ আওয়াজ কার ? ইনি হযরত খিজির (আ.), যিনি আল্লাহ্ নবী তো নন ; তবে বড় কামেল বুজুর্গ।

বলাবাহুল্য যে, হযরত খিজির (আ.)-কে চিনতে পারা হযরত আলী (রাযি.)-র বড় কারামত।

হযরত ইমাম হোসায়ন (রাযি.)-র কারামত

৩৭-৪৬ নং কারামত ঃ

لَمَّا قُتِلَ الحُسَيْنُ مَكَثَتِ الدُّنْيَا سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَالشَّمْسُ عَلَى الحِيْطَانِ كَالمَلَاحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ والكَوَاكِبُ يَضْرِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَكَانَ قَتْلُه يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَكُسِفَتِ الشَّمْسُ فِى ذٰلِكَ اليَوْمِ وَاَحْمَرَّتْ اٰفَاقُ السَّمَاءِ سِتَّةَ اَشْهُرٍ بعدَ قَتْلِه ثُمَّ زَالَتِ الحُمْرَةُ وَلَمْ تَكُنْ تُرٰى فِيْهَا بَعدَ ذٰلِكَ وَلَمْ تَكُنْ تُرٰى فِيْهَا قَبْلَه وقِيْلَ انَّه لَمْ يُقلبْ حَجَرُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ يَوْمَئِذٍ اِلَّا وُجِدَ تَحْتَه دَمٌ عَبِيْطٌ وَصَارَ الورس الَّذِى فِى عَسْكَرِهِمْ رَمَادًا وَذَبَحُوا شَاةً فَكَانُوا يَرَوْنَ فِى لَحْمِهَا مِثْلَ النِّيْرَانِ وَطَبَخُوهَا فَصَارَتْ مِثْلَ العَلْقَمِ وَتَكَلَّمَ رَجُلٌ فِى الحُسَيْنِ بِكَلِمَةٍ فَرَمَاهُ اللهُ بِكَوْكَبَيْنِ مِنَ السَّمَاءِ فَطُمِسَ بَصَرُه (كَذَا فى تاريخ الخلفاء ص ١٤٥ وفيه ايضا اخرج ابو نعيم فى الدلائل عن ام سلمة قالت سمعت الجن تبكى على حسين فتنوح عليه)

হযরত ইমাম হোসায়ন (রাযি.) শহীদ হওয়ার পর সাতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার অবস্থা ছিলো এই যে,

১. দেয়ালের উপর সূর্যের আলো কুসুম রংয়ের চাদরের মতো মনে হতো (অর্থাৎ সূর্যের আলো খুবই নিষ্প্রভ ছিলো)।
২. মনে হচ্ছিলো একটি তারকা অন্যটির উপর গিয়ে পতিত হচ্ছে (অর্থাৎ লাগাতার তারকারাজি কক্ষচ্যুত হচ্ছিলো)।
৩. ষাট হিজরীর মুহররম মাসের দশ তারিখে তাঁর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। সে দিনই ভয়ংকরতম সূর্য গ্রহণ হয়েছিলো।
৪. ছয়মাস পর্যন্ত আকাশের দিগন্ত রক্তের মত আশ্চর্য রকম লাল ছিলো। পরে ধীরে ধীরে সে রক্তিমতা অদৃশ্য হয়ে যায়। তার শাহাদাতের আগে বা পরে আকাশ আর কখনো এমন লাল রং ধারণ করে নি।
৫. তাঁর শাহাদাতের দিন বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিটি পাথর থেকে লাল তাজা খুন প্রবাহিত হয়েছিলো।
৬. জালিমদের ফউজে রক্ষিত তাজা ঘাসগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো।
৭. জালিমরা তাদের বাহিনীতে একটি উট জবাই করলো, কিন্তু তার গোশত থেকে আগুন বের হতে দেখা গেলো।
৮. যখন সেই গোশত পাকানো হলো তখন তা 'আলকাম ফলের মত তেতো হয়ে গেলো।
৯. এক নরাধম হযরত হোসায়ন (রাযি.) সম্পর্কে অশালীন উক্তি করলো। তখন আল্লাহ্ পাক তার উপর আসমান থেকে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করলেন, ফলে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেলো। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন তারীখুল খোলাফা, পৃষ্ঠা ১৪৫)

হযরত হোসায়ন (রাযি.)-র শাহাদত সম্পর্কে হযরত উম্মে সালামাহ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হোসায়নের শাহাদতে জ্বিন জাতিকে শোক ও বিলাপ করতে শুনেছি। হযরত আবু নো'আইম দালায়েল গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।) উপরোক্ত কারামাতগুলো তারীখুল খোলাফা গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) আরো বিশুদ্ধ সনদে তাহযীবুত্তাহযীব গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন।)

৪৭-৫২ নং কারামত ঃ

قَالَ خَلْفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ اسْوَدَّتِ السَّمَاءُ وَظَهَرَتِ الْكَوَاكِبُ نَهَارًا وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ الاَسْدِىُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ جَاءَ رَجُلٌ يُبَشِّرُ النَّاسَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فَرَأَيْتُه اَعْمٰى يُقَادُ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَتْنِى جَدَّتِىْ اُمُّ اَبِىْ قَالَتْ شَهِدَ رَجُلَانِ مِنَ الْجُعْفِيِّيْنَ قَتْلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَتْ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَطَالَ ذَكَرُه حَتّٰى كَانَ يَلُفُّه وَاَمَّا الاخَرُ فَكَانَ يَسْتَقْبِلُ الرَّاوِيَةَ بِفِيْهِ حَتّٰى يَأْتِىَ عَلٰى آخِرِهَا وَفِى قِصَّةٍ عَنِ السُّدِّيِّ فَقُلْنَا مَا شَرَكَ فِى قَتْلِه اَحَدٌ الاَّ مَاتَ بِاَسْوَءِ مِيْتَةٍ فَقَالَ كَذَبْتُمْ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ فَاَنَا مِمَّنْ شَرَكَ فِى ذٰلِكَ فَلَمْ يَبْرَحْ حَتّٰى دَنَا مِنَ الْمِصْبَاحِ وَهُوَ يَتَّقِدُ فَنَفَطَ فَذَهَبَ يُخْرِجُ الْفَتِيْلَةَ بِاِصْبَعِه فَاَخَذَتِ النَّارُ فِيْهَا فَذَهَبَ يُطْفِئُهَا بِرِيْقِه فَاَخَذَتِ النَّارُ فِى لِحْيَتِه فَعَدَا فَاَلْقٰى نَفْسَه فِى الْمَاءِ فَرَاَيْتُه كَاَنَّه حُمَمَةٌ ـ (تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ص ٣٥٤-٣٥٥ ج٢)

হযরত খালফ বিন খলীফা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইমাম হোসায়ন (রাযি.) শহীদ হওয়ার পর আসমান এমন অন্ধকার হলো যে, দিনের বেলায় তারকা দেখা যেতে লাগলো।

মুহম্মদ বিন ছালত আসাদী রাবী বিন মুনযির ছাওরী হতে আর তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, এক লোক আনন্দ প্রকাশ করে হযরত হোসায়নের শাহাদাতের খবর দিতে দিতে আসলো। কিন্তু একটু পরেই সে অন্ধ হয়ে গেলো। তখন অন্য একজন লোক তাকে টেনে টেনে নিয়ে গেলো।

ইবনে ওয়াইনা বলেন, আমার দাদী আমাকে শুনিয়েছেন যে, জা'ফিয়্যীন গোত্রের দু'জন লোক ইমাম হোসায়ন (রাযি.)-র হত্যায় শরীক ছিলো। তাদের একজনের লজ্জাস্থান এত লম্বা হয়ে গিয়েছিলো যে, বাধ্য হয়ে সে তা পেঁচিয়ে রাখতো। দ্বিতীয়জন এমন কঠিন পিপাসা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো যে, ভরা মশকে মুখ লাগিয়ে সে পানি পান করতো এবং শেষ ফোঁটা পর্যন্ত পান করতো, কিন্তু তার পিপাসা দূর হতো না।

হযরত ছুদ্দি এক ঘটনা বলেন, আমি একবার এক জায়গায় মেহমান হলাম। সেখানে হযরত হোসায়নের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। আমি তাদের আলোচনায় শরীক হয়ে বললাম, হযরত হোসায়েনকে যারা হত্যা করেছে তারা সকলেই মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করেছে। মজলিসের একজন আমার কথার উত্তরে বলে উঠলো, হে ইরাকীরা তোমরা এত মিথ্যা কথা বলতে পারো ? এই দেখো আমিও হোসায়নের হত্যাকাণ্ডে শরীক ছিলাম (কিন্তু এখনো ছহী সালামতে বেঁচে আছি)। এ কথা বলে সে বাতিতে তেল ঢেলে আলো উসকে দিচ্ছিলো। ঠিক সেই মুহূর্তে বাতির গায়ে আগুন ধরে গেল। লোকটি থুথু দিয়ে আগুন নিভানোর চেষ্টা করছিলো। কিন্তু তার দাড়ীতেই আগুন ধরে গেলো। তখন সে দৌড়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জ্বলে কয়লার মত হয়ে গেলো।

হায়রে নরাধম। আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতেই দেখিয়ে দিলেন তোর দুস্কৃতির পরিণাম কত ভয়াবহ।

৫৩ নং কারামত ঃ

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ لَمَّا جِيْءَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ نُضِّدَتْ رُؤُوْسُهُمْ فِى رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ جَاءَتْ فَاذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ فَجَعَلَتْ تُخَلِّلُ الرُّؤسَ حَتَّى دَخَلَتْ فِى مُنْخَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتْ هُنَيْهَةً ثُمَّ خَرَجَتْ فَذَهَبَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهِ وَفَعَلَتْ ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ او ثلاثا اخرجه الترمذى وصححه ـ (تيسير كشورى ص ١٥٠ ج ٢)

উমারা বিন ওমায়র বলেন, ওবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ ও তার সংগীদের কর্তিত মুণ্ড যখম মসজিদের বারান্দায় সাজিয়ে রাখা হলো আমি তখন সেখানে গেলাম। লোকেরা বলাবলি করছিলো, ঐযে, আসছে! এরই মধ্যে দেখি, এক সাপ এসে গেছে। সাপটি মাথাগুলোর ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ওবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের নাক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলো এবং কিছুক্ষণ পর বের হয়ে গেলো। এভাবে দুইবার কি তিনবার ভিতরে ঢুকলো আর বের হলো। ইমাম তিরমিযি এটা বর্ণনা করেছেন এবং সনদ বিশুদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন।

হযরত ইমাম হাসান (রাযি.)-র কারামত

৫৪-৫৫ নং কারামত ঃ

فِى تَارِيْخِ الْخُلَفَاءِ مَا لَفْظُه قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رُوِيْنَا مِن وُجُوْه انَّه لَمَّا احْتُضِرَ قَالَ لِاَخِيْهِ يَا اَخِىْ اِنَّ اَبَاكَ اسْتَشْرَفَ لِهٰذَا الاَمْرِ فَصَرَفَهُ اللهُ عَنْهُ وَ وَلِيَهَا اَبُو بَكْرٍ ثُمَّ اسْتَشْرَفَ لَهَا وَصُرِفَتْ عَنْهُ الى عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَشُكَّ وَقْتَ الشُّوْرٰى اَنَّهَا لَا تَعدُوه فَصُرِفَتْ عَنْهُ الى عُثْمَانَ فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بُوِيعَ عَلى ثُمَّ نُوزِعَ حَتّٰى جُرِّدَ السَّيْفُ مَا صَفَتْ لَه وَاِنِّى وَاللهِ مَا اَرى اَن يَّجْمَعَ اللهُ فِيْنَا النُّبُوَّةَ وَالخِلَافَةَ فَلَا اَعرِفَنَّ مَا اسْتَخَفَّكَ سُفَهَاءُ الكُوفَةِ فَاَخْرَجُوْكَ وَقَدْ كُنْتُ طَلَبْتُ الى عَائِشَةَ اَن اُدفَنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ نَعَمْ : وَما اظُنُّ القَومَ الاَّ سَيَمْنَعُوْنَكَ فَاِنْ فَعَلُوا فَلَا تُرَاجِعْهُمْ فَلَمَّا مَاتَ اَتَى الْحُسَيْنُ الى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ وَكَرَامَةً فَمَنَعَهُمْ مَرْوَانَ فَلَبِسَ الْحُسَيْنُ و مَنْ مَعَهُ السِّلَاحَ حَتّٰى رَدَّهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ دُفِنَ بِالْبَقِيْعِ الى جَنْبِ اُمِّه ـ (ص ١٢٥)

তারীকুল খোলাফার ভাষ্যমতে ইবনে আব্দুর বার বলেন, বিভিন্ন সূত্রে আমাদের কাছে এ খবর পৌছেছে যে, মৃত্যুর সময় হযরত হাসান (রাযি.) হযরতে হোসায়ন (রাযি.)-কে বললেন, হে ভাই! আব্বাজান খেলাফতের মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ পাক বিভিন্ন হিকমত ও কল্যাণের কারণে খেলাফতের দায়িত্বভার তাঁর পরিবর্তে হযরত আবু বকরকে দান করলেন। হযরত আবু বকর (রাযি.)-র মৃত্যুর পরে আব্বাজানের আবার সে খেয়াল হলো। কিন্তু খেলাফত হযরত উমর (রাযি)-র হাতে সোপর্দ হলো। তার মৃত্যুর পরে মজলিসে শুরার বৈঠকে আব্বাজানের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, খেলাফত এবার তাঁকে ডিংগিয়ে যাবে না, (তাঁকেই খলীফারূপে গ্রহণ করা হবে)। কিন্তু খেলাফতের যিম্মাদারী হযরত উছমান (রাযি.)-র হাতে সোপর্দ করা হলো। হযরত উছমানের শাহাদতের পর আব্বাজানের হাতে বাই'আত হলো এবং তিনি খলীফা হলেন। কিন্তু পরে এক ভীষণ ফেতনা দাঁড়ালো এবং তলোয়ার কোষমুক্ত হলো। ফলে খেলাফত তাঁর পক্ষে নিষ্কন্টক হলো না। আল্লাহ্র কসম! আমি চাই

না যে, আমাদের আহলে বাইতের মাঝে আল্লাহ্ পাক নবুওয়াত ও খেলাফত একত্র করুন। (অর্থাৎ আমার ধারণা যে, আল্লাহ্ এরূপ করবেন না।) আমি এও চাই না যে, কুফার নির্বোধ লোকেরা তোমাকে পরামর্শ দিয়ে তৎপর করবে এবং দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাবে। (হযরত হোসায়নের সাথে অশালীন আচরণ করার কোন সম্ভাবনা বা আলামত তখন বিলকুল ছিলো না। কিন্তু হযরত ইমাম হাসান আরো বললেন, আমার আকাঙ্খা যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে আমাকে দাফন করা হবে। হযরত আয়েশা (রাযি.) এ ব্যাপারে রাজিও হয়েছেন। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর আবার তাঁর কাছে আবেদন জানিও। তবে আমার ধারণা যে লোকেরা এতে বাঁধা দিবে। সত্যি যদি বাঁধা দেয় তবে তাদের সাথে বাদানুবাদ করতে যেয়ো না।

যাই হোক, হযরত হাসানের মৃত্যুর পর হযরত হোসায়ন (রাযি.) হযরত আয়েশা (রাযি.)-র খিদমতে দরখাস্ত পেশ করলেন, আর তিনিও সানন্দে তাতে সম্মতি দিলেন। কিন্তু মদীনার গভর্ণর মারওয়ান হযরত হাসান (রাযি.)-কে সেখানে দাফন করতে নিষেধ করলো। এতে হযরত হোসায়ন ও তাঁর সহযোগীরা অস্ত্র হাতে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তবে হযরত আবু হোরায়রা (এই বলে) তাদের নিরস্ত করলেন (যে, যদিও মারওয়ান দাফন কার্যে বাঁধা দিয়ে অন্যায় ও অসংগত কাজ করেছে, কিন্তু এ কারণে তোমাদের সংঘর্ষের পথে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।) অবশেষে হাসান (রাযি.)-কে জান্নাতুল বাকীতে আম্মা ফাতেমা (রাযি.)-র পাশে দাফন করা হলো।

হযরত হাসান (রাযি.)-র ইনতিকালের সময় আহলে বাইতের অনুগত লোকদের সংখ্যাধিক্যের কারণে এ আশংকা কিছুতেই ছিলো না যে, তাঁকে দাফন করতে বাঁধা দেওয়া হবে। কিন্তু মহান ইমাম বিদ্যমান পরিস্থিতির বিপরীত যে অছিয়ত করেছেন এবং বাঁধা দানের আশংকা প্রকাশ করেছেন, সেটা কাশফ ও কারামত যোগে জানার মাধ্যমেই করেছেন।

সা'আদ বিন মু'আয (রাযি.)-র কারামত

৫৬-৫৭ কারামত ঃ

فِى تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص ٤٨١ ج ٣) وَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ لَمَّا مَاتَ (اى سَعْدُ بْنُ مُعَاذْ) مَا اَخَفَّ جَنَازَتَه فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اِنَّ

الْمَلٰئِكَةَ حَمَلَتْهُ وَقَالَ رَسُوْلُ الله فِيْمَا رَوَى عنهُ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيْرَةٍ اِهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ـ

তাহযীবুত্তাহযীব গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'আদ বিন মু'আয (রাযি.)-র ওয়াফাতের পর মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগলো যে, এ লোকের জানাযা তো বেশ হালকা! তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সা'আদের জানাযা ফেরেশতারা বহন করছেন, তাই হালকা মনে হচ্ছে। (অথচ ওয়াকিদী কিতাবুল মাগাযী গ্রন্থে এবং যায়লায়ী (রহ.) তাখরীজুল হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত সা'আদ (রাযি.) বেশ মোটা ও ভারী দেহের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সা'আদ বিন মু'আযের মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিলো। শোক ও বিসাদের কারণে কিংবা এই উৎফুল্লতায় যে, সা'আদের রূহ এখন দুনিয়া ছেড়ে উর্ধ্বজগতে আমাদের কাছে চলে আসবে।)

৫৮ কারামত ঃ

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم فِىْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ لَقَدْ شَهِدَه سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ وَلَمْ يَنْزِلُوا الى الاَرْضِ قَبْلَ ذَلكَ الْحَدِيْث ـ (زيلعى ص ٢٥٧ ج ١)

ইবনে সা'আদ হযরত ইবনে উমর (রাযি.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'আদ বিন মু'আয সম্পর্কে বলেছেন যে, সত্তর হাজার ফেরেশ্তা তার জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে এত বিপুল সংখ্যায় দুনিয়াতে ফেরেশ্তাদের অবতরণ ঘটে নি। (হাদীছটি আরো দীর্ঘ।)

৫৯ নং কারামত ঃ

قَالَ الزُّهْرِىُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَعَدُ بْنُ مُعَاذ ثَلاَثٌ اَنَا فِيْهِنَّ رَجُلٌ (يَعنى كَمَا يَنْبَغِى) وَمَا سوى ذلك فَاَنَا رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم حديْثًا قَطُّ الاَّ عَلِمْتُ

انَّه حَقٌّ منَ الله تعالى وَلاَ كُنْتُ فى صلوة قطُّ فشَغَلْتُ نَفْسى بغَيْرِهَا حتّٰى اَقْضيهَا وَلاَ كُنْتُ فى جَنَازَة قطُّ فحَدَّثْتُ نَفْسى بغَيْرِ مَا تَقُوْلُ وَيُقَالُ لَهَا حَتّٰى انْصَرِفَ منْهَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّب فَهذه الخصَالُ مَا كُنْتُ اَحْسبُهَا الاَّ فى نَبِيٍّ كَذَا فى تهذيب التهذيب (تكشف ص ٨٨-٨٩ ج٥)

ইমাম যুহরী ইবনুল মুসাইয়িব থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'আদ বিন মু'আয (রাযি.) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমি একজন সৌভাগ্যশালী মানুষ। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি সাধারণ লোকদেরই একজন।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যখন যে হাদীছই আমি শুনেছি, সেটাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে চির সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছি এবং নামাযে থাকা অবস্থায় নামায শেষ করা পর্যন্ত অন্য কোন চিন্তায় আমি মশগুল হই নি। তদ্রূপ কোন জানাযায় থাকা অবস্থায় তা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত নিজের সাথে শুধু সে আলোচনাই করি যা মুরদার বলে এবং মুরদারকে বলা হয়।

ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, আমার ধারণা ছিলো যে, এসকল গুণ নবী ছাড়া আর কারো মাঝে পাওয়া যায় না। (কিন্তু সা'আদ বিন মু'আযকে দেখে তা বিশ্বাস হলো।)

৬০-৬১ নং কারামত ঃ

عَنْ عَائشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ منَ الْخَنْدَقِ الحديثُ وَفيه وَكَانَ سَعْدٌ اُصيبَ يَومَ الْخَنْدَقِ فى اَكْحَله فَضَرَبَ عَلَيه صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فى الْمَسْجد ليَعُوْدَه منْ قَرِيْب فَقَالَ سَعْدٌ اَللّٰهُمَّ انَّكَ تَعْلَمُ انَّه لَيْسَ قَوْمٌ اَحَبَّ الَىَّ اَنْ اُجَاهدَهُمْ فيْكَ منْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُوْلَكَ وَاَخْرَجُوْهُ اَللّٰهُمَّ فَانِّى اَظُنُّ انَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَانْ كَانَ بَقِىَ منْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَىْءٌ فَابْقنى حَتّٰى اُجَاهدَهُمْ فيْكَ وَانْ كُنْتَ وَضَعْتَ الحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجعَلْ مَوْتِى فيهَا فَانْفَجَرَتْ منْ لَيْلَته فَلَمْ يَرُعْهُمْ فى الْمَسْجد الاَّ وَالدَّمُ يَسيلُ الَيْهِمْ فَاذَا سَعْدٌ يَغْذُو

جُرْحُه دَمًا فَمَاتَ منْهَا ـ اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عن جابرٍ قَالَ انَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذ فى يَوْم الاَحْزَاب قَطَعُوا اَكْحَلَه اَو اَبْجَله فَحَسَمَه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالنَّار ـ فَانْتَفَخَتْ يَدُه فَتَرَكَه الدَّمُ فَحَسَمَه اُخْرى فَانْتَفَخَتْ يَدُه فَلَمَّا رَاى ذلك قَالَ اللّٰهُمَّ لاَ تُخْرِجْ نَفْسى حَتّٰى تَقُرَّ عَيْنِى منْ بَنى قُرَيْظَةَ فَاسْتَمْسَكَ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتّٰى نَزَلُوْا عَلى حُكْمه فَحَكَمَ فيْهِمْ اَنْ تُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَ تُسْتَحْيى نسَاؤُهُمْ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم اَصَبْتَ حُكْمَ الله فيْهِمْ وَكَانُوا اَرْبَعَ مائَة فَلَمَّا فَرَغَ منْ قَتْلهِمْ انْفَتَقَ عرْقُه فَمَاتَ اَخْرَجَه الترمذى وصححه ـ (تكشف ص ٨٨-٨٩ ج٥)

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খন্দকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। (বর্ণিত হাদীছটির অংশবিশেষ এরূপ)

খন্দক যুদ্ধের দিন সা'আদ বিন মু'আয (রাযি.) শাহরগে তীরবিদ্ধ হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে রেখে দেখাশোনা করার জন্য মসজিদেই তার জন্য তাবু টানিয়েছিলেন। সে সময় সা'আদ বললেন, হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, যারা তোমার রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং তাঁকে দেশ থেকে বের করেছে। তোমার ওয়াস্তে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা অন্য যে কোন কওমের বিরুদ্ধে জিহাদ করার তুলনায় আমার কাছে অধিক প্রিয় কাজ। হে আল্লাহ্! আমার ধারণা যে, আমাদের ও তাদের মাঝে লড়াই তুমি বন্ধ করে দিয়েছো। (অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং সামনে আর কোন লড়াই হবে না। হে আল্লাহ্! যদি আমার এ ধারণা ভুল হয় এবং) যদি কোরাইশের সাথে আমাদের আরো কোন যুদ্ধ বাকী থেকে থাকে তবে আমাকে জীবিত রাখো। যেন তোমার পথে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। আর যদি যুদ্ধ শেষ করে দিয়ে থাকো, তাহলে আমার শাহরগের জখম থেকে খুন জারী করে দাও এবং এতেই আমার মৃত্যু দান কর।

যাইহোক, সেই রাতেই জখমের মুখ খুলে গেল এবং মসজিদে উপস্থিত লোকেরা দেখলো, তাদের দিকে রক্ত গড়িয়ে আসছে। এ অবস্থায় রক্ত প্রবাহিত হতে হতে হযরত সা'আদের মৃত্যু হলো। এ হাদীছ ইমাম বুখারী ও মুসলিম

হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, খন্দক যুদ্ধে ইহুদীরা সা'আদ বিন মু'আযের শাহরগে তীর ছুঁড়ে রগ ছিঁড়ে ফেলল। রক্ত ঝরা বন্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জখম দাগালেন। রক্ত ঝরা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু হযরত সা'আদ বিন মু'আযের হাত ফুলে গেলো। রক্তের চাপ যেহেতু বেশী ছিলো, তাই জখমের মুখ ফেটে আবার রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় বার জখম দাগালেন। এতে রক্ত ঝরা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেলো, কিন্তু হাতের ফোলা আরো বেড়ে গেলো। হযরত সা'আদ এ অবস্থা দেখে বললেন, হে আল্লাহ্! বনু কোরায়যার চূড়ান্ত পরিণতি দেখার মাধ্যমে আমার চক্ষু শীতল হওয়ার আগে যেন আমার মৃত্যু না হয়। তখন থেকে তার জখমের রক্ত ঝরা এমন পূর্ণরূপে বন্ধ হলো যে, একটি ফোঁটাও আর বের হলো না। অবশেষে বনু কোরায়যার লোকেরা অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে এই শর্তে আত্মসমর্পণ করলো যে, হযরত সা'আদ আমাদের বিষয়ে ফায়সালা করবেন। হযরত সা'আদ এই ফায়সালা দিলেন যে, তাদের যুদ্ধক্ষম পুরুষদের হত্যা করা হবে এবং নারী ও অল্পবয়স্কদের জীবিত রাখা হবে। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সা'আদ তাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্র ইচ্ছা মাফিক ফায়সালাই করেছো। তাদের সংখ্যা ছিলো চারশ। ফায়সালা মুতাবেক তাদের হত্যাকর্ম যখন সমাপ্ত হলো তখন তার শাহরগের জখম আবার ফেটে গেলো এবং তিনি ইনতিকাল করলেন। ইমাম তিরমিযি হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং তার বিশুদ্ধতার পক্ষে রায় দিয়েছেন।

আলোচ্য ঘটনায় হযরত সা'আদ বিন মু'আয (রাযি.)-র কয়েকটি কারামাতের উল্লেখ রয়েছে। প্রথমতঃ কোরায়শের মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার বিষয় তিনি অবগত হয়েছিলেন এবং সত্য সত্যই খন্দক যুদ্ধের পর আর কোন যুদ্ধ মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের হয় নি। মক্কা বিজয়কালের বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধকে যুদ্ধ বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ যখমের রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে যাওয়া। তৃতীয়তঃ বন্ধ খুন আবার প্রবাহিত হওয়া।

হাদীছে বর্ণিত فلما فرغ কথাটা সংক্ষেপিত। মূল কথা এরূপ হবে—

فَلَمَّا فَرَغَ وَ دَعَا بِمَا فِى الْحَدِيْثِ الاولِ فَانفتَقَ

যখন ফয়সালা মুতাবেক তাদের হত্যা থেকে ফারেগ হলেন, তখন তিনি প্রথম হাদীছে বর্ণিত দু'আ করলেন। ফলে জখমের মুখ খুলে গেল।

হযরত খোবায়ব (রাযি.)-র কারামত

৬২-৬৩ নং কারামত ঃ

رَوَى الْبُخَارِى فِى قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ فَكَانَتْ تَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ أَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ لَقَدْ رَأَيْتُه يَأْكُلُ مِن قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَانَّه لَمُوْثَقٌ فِى الْحَدِيْدِ وَمَا كَانَ الاَّ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ (ج ٢ ص ٥٨٥)

এক দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, (পূর্বে যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে) সেই মহিলা বলতেন, খোবায়বের চেয়ে উত্তম কয়েদী আমি দেখি নি।

(এটা হলো সেই সময়ের ঘটনা যখন হযরত খোবায়ব মক্কা শরীফে কাফিরদের হাতে বন্দী ছিলেন। সেই মহিলা আরো বলেন,) খোবায়ব যখন লোহার শিকলে বাঁধা (যার ফলে কোথাও আসা যাওয়া করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না), সেই সময় মক্কায় ফলফলাদির মৌসুমও ছিলো না। কিন্তু তাকে আমি আংগুরের থোকা খেতে দেখেছি। সেটা আল্লাহ্র দেয়া রিযিক ছাড়া আর কিছু ছিলো না।

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন, কেউ কি আছো যে, খোবায়েবের লাশ শূলী থেকে নামিয়ে আনতে পারবে ? তখন হযরত যোবায়র ও হযরত মিকদাদ (রাযি.) লাব্বাইক বলে তৈয়ার হলেন এবং মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। রাতে তারা ছফর করতেন আর দিনে লুকিয়ে থাকতেন। অবশেষে তারা শূলী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। সেখানে চল্লিশ জন পাহারাদার মওজুদ ছিলো। কিন্তু সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তারা উভয়ে খোবায়বকে শূলী থেকে নামালেন এবং ঘোড়ার পিঠে রেখে রওয়ানা দিলেন। হযরত খোবায়বকে হত্যার পর চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হয়েছিলো, কিন্তু তার দেহ ছিলো সম্পূর্ণ তরতাজা। জখম থেকে তখনও রক্ত ঝরছিলো। এবং মিশকের ন্যায় সুগন্ধ আসছিলো। ভোরে কাফেররা যখন ব্যাপার জানতে পারলো তখন চারদিকে সওয়ার দল ছুটিয়ে দিলো। একদল সওয়ার যোবায়র ও মিকদাদ (রাযি.)-কে ধরে ফেলার উপক্রম করলো। হযরত যোবায়র অবস্থা আঁচ করে লাশ মাটিতে নামিয়ে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে লাশ যমিনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলো। এজন্যই হযরত খোবায়ব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে بليغ الارض বলা হয়। অতঃপর হযরত যোবায়র কাফিরদের দিকে ঘুরে চিৎকার করে বললেন, আমি

যোবায়র ইবনুল আওয়াম এবং ছফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব আমার মা। আর আমার সঙ্গী হচ্ছেন মিকদা ইবনুল আসওয়াদ। তোমরা চাইলে তীর দ্বারা লড়াই হতে পারে। আমরা বাঁধা দেব না। এই কথা শুনে সওয়ার দল ভয় পেয়ে ফিরে চলে গেল।

উভয়ে মদীনায় ফিরে এসে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। ঠিক সেই সময় হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালাম হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ফিরেশতাদের মজলিসে আপনার এই সাথীদ্বয়ের প্রশংসা হচ্ছে।

উপরোক্ত ঘটনা মাওলানা মুফতী ইনায়াত আহমদ ছাহেব রচিত তারীখে হাবীবে ইলাহ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনা কোথাও আমি পাই নি। তবে তারীখে হাবীবে ইলাহ যেহেতু খুবই নির্ভরযোগ্য কিতাব সেহেতু এ কিতাবের হাওয়ালা দেয়াই যথেষ্ট।

৬৪-৬৫ নং কারামত ঃ

رَوَى الْبُخَارِىُّ فِى قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ وَبَعَثَ قُرَيْشٌ اِلَى عَاصِمٍ لِيَأْتُوا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُوْنَهُ وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيْمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدبرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُؤُوْسِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ ـ (ج ٢ ص ٥٨٦)

এক দীর্ঘ ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন, মক্কার মুশরিকরা হযরত আছিমের লাশ থেকে একটা টুকরা হলেও কেটে আনার জন্য একদল লোক পাঠালো। যাতে সেটা দেখে তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় (এবং হৃদয়ের প্রতিহিংসাও চরিতার্থ হয়। কেননা,) আছিম বদরের যুদ্ধে তাদের নেতৃস্থানীয় একজনকে হত্যা করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ পাক আছিম ও তার সাথীদের লাশের উপর মেঘের মত মৌমাছির ঝাঁক পাঠিয়ে দিলেন। মৌমাছির ঝাঁক শহীদদের লাশ হেফাযত করল। ফলে তারা আছিমের লাশ থেকে কিছুই নিতে পারলো না।

বুখারী শরীফের হাশিয়াতে হযরত ইবনে ইসহাক লিখেছেন যে, হযরত আছিম (রাযি.) আল্লাহ্ পাকের সাথে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কোন মুশরিক তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। হযরত উমর (রাযি.) এই ঘটনা জানার পর বলেছেন, সেই প্রতিজ্ঞার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ মৃত্যুর পরও তার মুসলমান বান্দার হিফাযত করেছেন। দৃশ্যতঃ হযরত আছিমের লাশের হিফাযতের কোনই ব্যবস্থা

ছিলো না। কিন্তু আল্লাহ্ পাক নিজ গায়বী কুদরতে তা হিফাযত করেছেন। কোন কাফের তার পবিত্র লাশে হাত লাগাতে পারে নি। এভাবে মৃত্যুর পরও তার প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়েছে। এসবই হলো হযরত আছিমের কারামত।

হযরত আনাস (রাযি.)-র কারামত

৬৬ নং কারামত ঃ

عَنْ انَسٍ اَنَّ الرُّبَيْعَ عَمَّتَه كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا اِلَيْهَا الْعَفْوَ فَاَبَوْا فَعَرَضُوا الاَرْشَ فَاَبَوا فَاَتَوْا رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم وَاَبَوْا اِلاَّ الْقِصَاصَ وَاَمَرَ رَسُوْلُ الله صلّى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسُ بْنُ نَضَرٍ يَا رَسُوْلَ الله! اَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيْعِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَا اَنَسُ كِتَابُ الله الْقِصَاصُ فَرَضِىَ الْقَوْمُ فَعَفَوا فَقَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم اِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى الله لاَبَرَّه ـ (ص ٦٤٢ ج ١)

(হযরনত আনাস বিন মালিকের ভাতিজা) হযরত আনাস বিন নজর বর্ণনা করেন যে, তার ফুফু রোবাইআ কোন এক মেয়ের সামনের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলো। রোবাইআর লোকেরা মেয়ে পক্ষের কাছে মাফ চাইলো। কিন্তু তারা মাফ করতে অস্বীকৃতি জানাল। তাদেরকে অনুরোধ করা হলো যে, তোমরা দাঁতের বদলা দাঁত নেয়ার পরিবর্তে কিছু অর্থ গ্রহণ করো। কিন্তু তাতেও তারা সম্মত হল না এবং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে মাফ করা বা দিয়ত (ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করার পরিবর্তে কিসাসের দাবীতে অটল রইলো। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের ফয়সালা মুতাবেক কিসাস তথা 'দাঁতের বদলা দাঁত' এর নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস বিন নাযার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ফুফুর সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে? সেই মহান সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। (তার এ বক্তব্য শরীয়তের বিরোধিতার জন্য ছিলো না, বরং আবেগাতিশয্যে আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল ও ভরসা তার এমন প্রবল হলো যে, তিনি আল্লাহ্র নামে কসম খেয়ে ফেললেন, এবং তার অন্তরে বিশ্বাস জমে গেলো যে, হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করার কিংবা দিয়ত

গ্রহণের অনুভূতি সৃষ্টি করে দিবেন।) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন, হে আনাস! আল্লাহ্র কিতাব তো কিসাসের হুকুমই দিচ্ছে। (সেই সময় প্রতিপক্ষের অন্তর নরম হয়ে গেল) এবং তারা সন্তুষ্টচিত্তে মাফ করে দিলো। এই ঘটনার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র এমন বান্দাও আছেন, যারা (আল্লাহ্র উপর ভরসা করে) আল্লাহ্র নামে কোন কসম করলে তিনি তা অক্ষুণ্ণ রাখেন।

এ ধরণের কসম আবেগ ও বিশ্বাসের প্রবলতার সময়ই শুধু করা যেতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আনাস (রাযি.)-র মত অবস্থা ও যোগ্যতা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ এ ধরণের কসম খাওয়া উচিত নয়।

সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযি.)-র কারামত

৬৭ নং কারামত ঃ

رَوَى الْبُخَارِىُّ فِى قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ اَمَا وَاللهِ لَاَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ عَبْدُكَ هٰذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَاَطِلْ عُمُرَه وَاَطِلْ فَقْرَه وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ وَكَانَ بَعْدُ اِذَا سُئِلَ يَقُوْلُ شَيْخٌ كَبِيْرٌ مَفْتُوْنٌ اَصَابَتْنِى دَعْوَةُ سَعْدٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَاَنَا رَاَيْتُه بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلٰى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَاِنَّه لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِى فِى الطَّرِيْقِ يَغْمِزُهُنَّ ـ (ص ١٠٤ ج ١)

একটি সুদীর্ঘ ঘটনার একাংশে ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) একবার বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ঐ ব্যক্তির নামে তিনটি বদ দু'আ করছি যে আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করছে। হে আল্লাহ্! তোমার এই বান্দা যদি মিথ্যাবাদী হয় এবং যশ-খ্যাতি লাভের জন্য (আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে) দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তাকে অত্যাধিক বয়স দান করো এবং দীর্ঘ দারিদ্র দান করো এবং বিভিন্ন ফিতনায় তাকে নিক্ষেপ করো। এই বদ দু'আর পরবর্তী কালে যখন তাকে কুশল জিজ্ঞাসা করা হতো তখন সে বলতো, ভাই! আমি মতিভ্রষ্ট এক বুড়ো। সা'আদের বদদু'আ লেগেছে আমার।

আবদুল মালেক বলেন, ঐ বুড়োকে আমি এমন অবস্থায় দেখেছি যে, বার্ধক্যের কারণে তার ভ্রু চোখের উপর এসে গিয়েছিলো। অথচ সেই বয়সেও রাস্তায় যুবতীদের উত্তক্ত করতো।

রাস্তায় এ আচরণ তার চরম দারিদ্রের কারণেই ছিলো। কেননা অর্থের সচ্ছলতা থাকলে কিছুটা শরম তার থাকতো এবং রাস্তাঘাটে মানুষের সামনে এধরণের আচরণ করার মত নির্লজ্জ হতে পারতো না।

মোটকথা, হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাসের তিনটি দু'আই আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন।

৬৭ নং কারামত ঃ

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ قَالَ رَاَيْتُ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعَنْ شِمَالِه يَوْمَ اُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يُقَاتِلَانِ كَاَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَاَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ يَعْنِى جِبْرِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ متفق عليه ـ

(مشكوة ص ٥٢١ ج ٢)

হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, অহুদের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই পাশে শ্বেতবস্ত্রধারী দুই যোদ্ধাকে এমন তুমুল যুদ্ধ করতে দেখেছি যা আগে বা পরে আর কখনো দেখি নি। এরা দু'জন ছিলেন জিবরীল ও মীকাঈল।

হযরত হানযালাহ্ (রাযি.)-র কারামত

৬৯ নং কারামত ঃ

رَوَى الْوَاقِدِىُّ فِى كِتَابِ الْمَغَازِى قَالَ وَكَانَ حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِى عَامِرٍ تَزَوَّجَ جَمِيْلَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلُوْلٍ وَدَخَلَ عَلَيْهَا لَيْلَةَ قِتَالِ اُحُدٍ بَعْدَ اَنْ اسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَصْبَحَ جُنُبًا وَ اَخَذَ سِلَاحَه وَلَحِقَ بِالْمُسْلِمِيْنَ وَاَرْسَلَتْ اِلٰى اَرْبَعَةٍ مِنْ قَوْمِهَا فَاَشْهَدَتْهُمْ اَنَّه قَدْ دَخَلَ بِهَا فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ رَاَيْتُ فِىْ لَيْلَتِى كَاَنَّ السَّمَاءُ فُتِحَتْ ثُمَّ اُدْخِلَ وَاُغْلِقَتْ دُوْنَه فَعَرَفْتُ اَنَّه مَقْتُوْلٌ مِنَ الْغَدِ وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَه ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فَوَلَدَتْ لَه مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَلَمَّا انْكَشَفَ الْمُشْرِكُوْنَ اعْتَرَضَ حَنْظَلَةُ لِاَبِى

سُفْيَانَ يُرِيْدُ قَتْلَه فَحَمَلَ عَلَيْهِ الاَسْوَدُ بْنُ شُعَيْبٍ بِالرُّمْحِ فَقَتَلَه وَقَالَ رَسُوْلُ الله صلى عليه وسلم انِّىْ رَاَيْتُ الْمَلئكَةَ تَغْسِلُ حَنْظَلَةَ ابْنَ عَامِرٍ بَيْنَ السَّمَاء وَالاَرْضِ بِمَاء الْمُزْنِ فِى صِحَافِ الفِضَّةِ قَالَ اَبُو اُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ فَذَهَبْنَا نَنْظُرُ اِلَيْهِ فَاذَا رَأْسُهُ يَقْطُرُ وَقَالَ اَبُو اُسَيْدٍ فَرَجَعْتُ الى رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم فَاَخْبَرْتُه فَاَرْسَلَ الى امْرَأتِه فَسَاَ لَهَا فَاَخْبَرَتْهُ اَنَّه قَدْ خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ انْتَهى -

আল ওয়াকিদী তাঁর কিতাবুল মাগাযী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হানযালা বিন আবী আমির জামিলা বিনতে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাল্লকে বিয়ে করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে অহুদ যুদ্ধের পূর্বরাতে বাসর যাপন করেছেন। সকালে বিনা গোসলেই অস্ত্র নিয়ে মুসলমানদের সাথে গিয়ে যোগ দিলেন। এদিকে নববধূ তার কাওমের চারজন লোককে ডেকে এনে সাক্ষী রাখলেন যে, হানযালা তার সাথে সহবাস করেছেন। লোকেরা নববধূকে তার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আসমানের দরজা খোলা হয়েছে। হানযালা ভিতরে প্রবেশ করেছেন। সাথে সাথে আসমানের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, হানযালা আগামীকাল শহীদ হয়ে যাবেন। (তাই আমি সহবাসের সাক্ষী রাখতে চাই, যাতে আমার গর্ভ সঞ্চার হলে মানুষ কুধারণা না করে বসে।) পরবর্তীতে ছাবিত বিন কায়েস তাকে বিয়ে করেছিলেন এবং তার গর্ভে মুহম্মদ বিন ছাবিত বিন কায়েস জন্ম গ্রহণ করেছেন।

এদিকের ঘটনা এই যে, অহুদের মাঠ থেকে মুশরিকরা যখন পরাজিত হয়ে পালাতে মনস্থ করলো তখন হযরত হানযালা (রাযি.) আবু সুফিয়ানকে (যিনি তখনো অমুসলমান ছিলেন) আঘাত করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু পিছন থেকে আসওয়াদ বিন শোআইব হানযালাকে লক্ষ্য করে এমন বর্শাঘাত করলেন যে, তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি দেখেছি, হানযালা বিন আবু আমিরকে আসমান যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে রূপোর টবে করে বৃষ্টির পানিতে ফিরেশতারা গোসল দিচ্ছে। আবু উসায়দ সাঈদী (রাযি.) বলেন, আমরা হানযালাকে দেখতে গেলাম। দেখি কি! হানযালার চুল থেকে পানির ফোঁটা ঝরছে।

এই আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করে তৎক্ষণাৎ আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বিষয়টি তাকে অবহিত করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হানযালার বিধবার কাছে দূত পাঠিয়ে ঘটনা জানতে চাইলেন। দূত বিধবাকে ঘটনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে জানালেন যে, হানযালা জানাবতের (গোসল ফরযের) অবস্থায় ময়দানে গিয়েছিলেন।

ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে শহীদকে গোসল দেয়া হয় না। কিন্তু গোসল ফরয হওয়ার অবস্থায় শহীদ হলে গোসল দেয়া জরুরী। হযরত হানযালা (রাযি.)-র উপর যেহেতু গোসল ফরয ছিলো, অথচ ইসলামী ফউজের কারো সে কথা জানা ছিল না। এজন্য আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের দ্বারা তার গোসলের ব্যবস্থা করেছেন। হযরত হানযালার মাথার চুল থেকে পানির ফোঁটা ঝরে পড়ার দৃশ্য রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্যরা প্রত্যক্ষ করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা ছিলো তার অতি বড় কারামত।

জনৈক আনছারী ছাহাবীর কারামত

৭০ নং কারামত ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِىْ اَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَمَامَه اِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَه وَصَوْتُ الفَارِسِ يَقُوْلُ اَقْدِمْ حَيْزُوْمُ اِذْ نَظَرَ الى الْمُشْرِكِ اَمَامَه خَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ اَنْفُه وَشُقَّ وَجْهُه كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذلِكَ اَجْمَعُ فَجَاءَ الاَنْصَارِىُّ فَحَدَّثَ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ صَدَقْتَ ذلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاء الثَّالِثَةِ فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِيْنَ وَاَسَرُوا سَبْعِيْنَ - رواه مسلم (مشكوة ص ٥٣١ ج ٢)

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের দিন জনৈক ছাহাবী এক মুশরিককে তাড়া করছিলেন। হঠাৎ তিনি তার সামনে মুশরিকের মাথায় চাবুক মারার আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং এক অদৃশ্য ঘোড়সওয়ারকে বলতে শুনলেন, হায়যূম! [হযরত জিবরীল (আ.) এর ঘোড়ার নাম।] আগে বাড়ো, অতঃপর তিনি মুশরিককে চিত হয়ে পড়ে যেতে দেখলেন। আরো দেখলেন যে, তার নাক ফেড়ে গেছে এবং চেহারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। খুব জোরে চাবুকের

আঘাত করলে যেমন হয়ে থাকে। তদ্রূপ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ নীল হয়ে গিয়েছিলো। সেই আনছারী ছাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি সত্য বলছো। এ হচ্ছে তৃতীয় আসমানের সাহায্য। মুসলমানরা সেদিন সত্তরজন মুশরিককে হত্যা এবং সত্তরজনকে বন্দী করেছিলেন। ইমাম মুসলিম এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-র কারামত

৭১-৭২ নং কারামত ঃ

فِى الْمِشْكٰوةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِى حَدِيْثٍ قَالَ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ - (رواه البخارى ص ٥٣٧-٥٣٨ ج ٢)

মিশকাত শরীফের বর্ণনা মতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, খানা খাওয়ার সময় আমরা খাদ্যদ্রব্য থেকে তাসবীহ ও যিকির পড়ার আওয়াজ শুনতে পেতাম। বুখারী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ খাদ্য থেকে সুবহানাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ্! আওয়াজ আসতো। দালায়েলুন্নবুওয়াত গ্রন্থে আবু নাঈম এক দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাতে আমার সামনে খেজুর বাগানের দিক থেকে কালো মেঘের মতো কিছু একটা উঠে আসতে দেখতে পেলাম। আমার ভয় হলো যে, এটা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষতির কারণ হয় কি না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হুকুম আমার মনে পড়লো যে, "কোন অবস্থাতেই এখান থেকে সরবে না।" তাই আমি চুপ করে নিজের জায়গায় জমে বসে থাকলাম। সেই অবস্থাতেই আমি শুনতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, বসে পড়ো। সকাল হতে হতে পুরো মেঘ পরিস্কার হয়ে গেলো। সকালে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনার পর আমি আমার আশংকা প্রকাশ করলাম এবং পূর্ণ ঘটনা তাঁকে খুলে বললাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এরা নাসবীন এলাকার জ্বিন। আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিলো। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুফতী ইনায়াত আহমদ কৃত আল-কালামুল মুবীন।

জ্বিনদেরকে অবলোকন করতে পারা যেহেতু অলৌকিক ব্যাপার সেহেতু এ ঘটনাকে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের কারামত বলে গণ্য করা হয়েছে।

হযরত উসায়দ বিন হোযায়র ও আব্বাস বিন বিশর (রাযি.)-র কারামত

৭৩-৭৪ নং কারামত ঃ

عَنْ اَنَسٍ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ و عَبَّاسِ بْنِ بِشْرٍ تَحَدَّثَا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم فِى حَاجَةٍ لَهُمَا حَتّٰى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً فِى لَيْلَةٍ شَدِيْدَةِ الظُّلْمَةِ ثُمَّ خَرَجَا من عِنْدِ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم يَنْقَلِبَانِ وبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُصَيَّةٌ فَاَضَاءَتْ عَصَا اَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتّٰى مَشَيَا فِى ضَوْئِهَا حَتّٰى اِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيْقُ اَضَاءَتْ لِلْآخَرِ عَصَاهُ فَمَشٰى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِى ضَوْءِ عَصَاهُ حَتّٰى بَلَغَ اَهْلَه - (رواه البخرى ، مشكوة ص ٥٤٤ ج٢)

হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে তারা নিজেদের কোন প্রয়োজন পেশ করলেন। কিছু রাত্র হয়ে গেলো। সে রাত্রটাও ছিলো গভীর অন্ধকার। ফলে অন্ধকারেই তারা বাড়ীর পথে রওয়ানা হলেন। তাদের হাতে লাঠি ছিলো। হঠাৎ একজনের লাঠি বাতির মতো আলোকিত হয়ে গেলো। সে আলোতে নির্বিঘ্নে তারা পথ চলতে লাগলেন। যখন দুজনের পথ আলাদা হয়ে গেলো, তখন অন্য জনের লাঠিও আলোকিত হয়ে গেলো এবং উভয়ে লাঠির আলোকে নিজ নিজ পথে চলতে লাগলেন এবং ঘরে পৌঁছে গেলেন। ইমাম বুখারী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনায় লাঠি জ্বলে উঠা এবং বাতির মত আলোকিত হওয়া উভয় ছাহাবীর কারামতরূপে গণ্য। কেননা যখন পথ আলাদা হয়ে গেলো তখন উভয়ের লাঠিই আলোকিত হয়েছিলো।

হযরত জাবের (রাযি.)-র পিতার কারামত

৭৫ নং কারাতম ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَ اُحُدٌ دَعَانِى اَبِى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا اَرَانِى اِلاَّ مَقْتُوْلاً فِى اَوَّلِ مَن يُقْتَلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى عليه

وسلم وَانِّى لاَ اَتْرُكُ بَعْدِى اَعَزَّ عَلَىَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم وَاَنَّ عَلَىَّ دَيْنًا فَاقْضِ واسْتَوْصِ بِاَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَاَصْبَحْنَا فَكَانَ اَوَّلَ قَتِيْلٍ وَدَفَنْتُه مَعَ اخرَ فِى قَبْرٍ رواه البخارى (مشكوة ص ٤٤_٤٥)

হযরত জাবের (রাযি.) বর্ণনা করেন, অহুদ যুদ্ধের সময় এক রাত্রে আমাকে আমার পিতা ডেকে বললেন, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবাদের মাঝে আমিই প্রথম শহীদ হবো। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তুমি আমার সবচে' প্রিয়। শোনো আমার উপর এক ব্যক্তির ঋণ রয়েছে। সেটা তুমি আদায় করে দিবে। আর তোমাকে আমি তোমার বোনদের সাথে উত্তম আচরণের অছিয়ত করে যাচ্ছি।

হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, সকালে আমি দেখতে পেলাম, আমার পিতাই ছাহাবাদের মাঝে প্রথম শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করলেন। আমি তাকে এবং অন্য একজন শহীদকে একই কবরে দাফন করলাম।

এভাবে কাশফ ও ইলহাম যোগে নিজের শাহাদতের আগাম খবর দেয়া অবশ্যই একটি বড় ধরনের কারামত।

কতিপয় ছাহাবা (রাযি.)-র কারামত

৭৬ নং কারামত ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اَرَادُوا غَسْلَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لاَ نَدْرِى اَنُجَرِّدُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ ثِيَابِه كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا اَمْ نَغْسِلُه وَعَلَيْهِ ثِيَابُه فَلَمَّا اخْتَلَفُوا اَلْقَى اللهُ عَلَيْهِم النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُم رَجُلٌ الاَّ وذَقنُه فِى صَدْرِه ثُمَّ كَلَّمَهُم مُكَلِّمٌ من نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُوْنَ مَنْ هُوَ: اغسلوا النبىَّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثِيَابُه فَقَامُوا فَغَسَلُوهُ وعَلَيهِ قَمِيصُه يَصُبُّوْنَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيْصِ وَيَدلُكُوْنَه ـ رواه البيهقى فى دلائل النبوة (مشكوة ص ٥٤٥ ج٢)

হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর ছাহাবা কেরাম যখন তাঁকে গোসল দিতে মনস্থ করলেন, তখন তারা বলাবলি করতে লাগলেন, বুঝতে পারছি না, আমাদের অন্যান্য মুরদারের বেলায় যেমন করি তেমনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ থেকেও কি কাপড় খুলে গোসল দিবো না কি কাপড় রেখেই ধোয়াবো ? তাদের মাঝে যখন এ বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলো তখন আল্লাহ্ তাদের উপর তন্দ্রা নামালেন। এমনকি তন্দ্রাভারে তাদের প্রত্যেকের চিবুক বুকের সাথে লেগে গেলো। অতঃপর ঘরের কোণা থেকে এক অদৃশ্য ব্যক্তি বলে উঠলো, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাপড়-চোপড় সহই গোসল দান করো। কেউ জানতে পারলো না যে, আওয়াজদানকারী লোকটি কে ? তখন সকলে মিলে তাঁর দেহের কোর্তা সহই তাঁকে গোসল দান করলেন। অর্থাৎ কোর্তার উপর থেকেই পানি ঢেলে উপর দিয়েই আলতোভাবে মলে দিচ্ছিলেন। এ হাদীছ ইমাম বাইহাকী দালায়েলুন্নবুওয়ত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ছাফীনাহ (রাযি.)-র কারামত

৭৭ নং কারামত ঃ

عَنْ ابنِ الْمُنكَدِرِ اَنَّ سَفِيْنَةَ مَولى رسُولِ الله صَلَّى الله عليه وسلم اَخطَاءَ الْجَيْشَ بِاَرْضِ الرُّوْمِ وَاُسِرَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا يَلتَمِسُ الْجَيْشَ فَاذَا هُوَ بِالاَسَدِ فَقَالَ يَا اَبَا الْحَارِث اَنَا مَولى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم كَانَ من اَمْرِى كَيْتَ وَكَيْتَ فَاَقْبَلَ الاَسَدُ لَه بَصْبَصَةٌ حَتَّى قَامَ الى جَنْبِه كُلَّمَا يَسْمَعُ صَوْتًا اَهْوى اِلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَمْشِى الى جَنْبِه حَتَّى بَلَغَ الْجَيْشَ ثُم رَجَعَ الاسَدُ ـ (مشكوة ج ٢ ص ٥٤٥)

হযরত ইবনুল মুনকাদির বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত ছাফীনাহ (রাযি.) রোমকদের অঞ্চলে মুসলিম বাহিনীর অবস্থান ক্ষেত্র হারিয়ে ফেললেন এবং পথ তালাশ করা অবস্থায় শত্রুদের হাতে বন্দী হলেন। একদিন সুযোগমতো তিনি বন্দিদশা থেকে ফেরার হয়ে মুসলিম বাহিনীর অবস্থান অনুসন্ধান করছিলেন। হঠাৎ এক সিংহের মুখোমুখী হয়ে গেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর সৃষ্টি! আমি আল্লাহর

রাসূলের আযাদকৃত গোলাম। আমার বর্তমান অবস্থা এই এই। একথা শোনা মাত্র বনের সিংহ লেজ নেড়ে তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করতে লাগলো। এবং তাঁর বরাবর হয়ে চলতে লাগলো। যখনই সে কোন আওয়াজ শুনতো, সাথে সাথে সেদিকে ছুটে যেতো। আবার তার পাশাপাশি চলতে শুরু করতো। হযরত ছাফীনাহ (রাযি.) যখন ইসলামী বাহিনীর নিকটে এসে উপনীত হলেন তখন সিংহটি নিরবে ফিরে গেলো।

হযরত আয়েশা (রাযি.)-র কারামত

৭৮ নং কারামত ঃ

عَنْ اَبِى الجَوْزَاء قَالَ قُحطَ اَهلُ الْمَدِيْنَة قَحْطًا شَدِيدًا فَشكوا الى عَائِشَةَ فَقَالَت انْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوْا منهُ كُوًى الى السَّمَاء حَتَّى لاَ يَكُونَ بَيْنَه وَبَيْنَ السَّمَاء سَقْفٌ فَفَعَلُوا فَمُطِرُوا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ العُشْبُ وَسَمِنَت الابلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ من الشَّحْم فَسُمِّيَ عَامَ الفَتقِ ـ رواه الدارمى (مشكوة ج ٢)

হযরত আবুল জাওযা (রহ.) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার মদীনা শরীফে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো এবং লোকেরা হযরত আয়েশা (রাযি.)-র খিদমতে ফরিয়াদ জানালো। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফে যাও এবং গোম্বুদে খাযরার (সবুজ গম্বুজের) মাথায় ছিদ্র করে দাও। যাতে তাঁর ও আসমানের মাঝে ছাদের কোন অন্তরায় না থাকে। তারা তাই করলো। ফলে খুব বৃষ্টি হলো। সবুজ ঘাস জন্মালো এবং উটগুলো এতো মোটাতাজা হলো যে, চর্বি ফেটে বের হয়ে গেল এবং সেই বছরটি عام الفتق (চর্বি ফেটে বের হওয়ার বছর) নামে অভিহিত হলো। এ ঘটনা ইমাম দারেমী বর্ণনা করেছেন।

৭৯ নং কারামত ঃ

فِى قِصَّةٍ طَوِيْلَة فَقَالَ (اى صلى الله عليه وسلم) يَا اُمَّ سَلَمَةَ لاَ تُوذِيْنِى فِىْ عَائِشَةَ فَانَّه وَالله مَا نَزَلَ عَلَىَّ الْوَحْىُ وَ اَنَا فِى لِحَافِ امْرَاَة مِنْكُنَّ غَيْرَهَا ـ (اسد الغابة ص ٥٠٣ ج٥)

একটি সুদীর্ঘ ঘটনার অংশবিশেষে এরূপ বর্ণিত হয়েছে—রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উম্মে সালামা তুমি আয়েশার সাথে কোন মন্দ আচরণ করে আমাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ্র কসম! আয়েশা ছাড়া আর কোন স্ত্রীর বিছানায় থাকা অবস্থায় আমার উপর অহী অবতীর্ণ হয় নি। (অর্থাৎ সে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম নারী। সুবহানাল্লাহ্! হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর বুজুর্গী ও কারামত লক্ষ্য করুন। কারো কোন আচরণে হযরত আয়েশার কষ্ট হলে তাতে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ব্যথিত হন।

৮০ নং কারামত ঃ

قَالَ اَبُو سَلَمَةَ انَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَومًا يَا عَائِشَةُ هذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَؤُكَ السَّلاَمَ فَقُلْتُ وَعَلَيه السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه تَرى مَا لاَ اَرى ـ (اسد الغابة ص ٥٠٣ ج٥)

হযরত আবু ছালামা (রাযি.) বলেন, আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন, হে আয়েশা! ইনি জিবরীল আমীন। তোমাকে সালাম বলছেন। আয়েশা (রাযি.) বলেন, তখন আমি জবাবে বললাম, وعليه السلام ورحمة الله وبركاته। হে আল্লাহ্র রাসূল আপনি যা দেখতে পান আমি তো তা দেখতে পাই না।

অর্থাৎ হযরত জিবরীল (আ.) যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ছালাম বলেছেন, হযরত আয়েশা (রাযি.) তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ছালামের জবাব দিয়েছেন। এই হাদীছ দ্বারাও উর্ধ্ব জগতের সাথে হযরত আয়েশা (রাযি.)-র গভীর সম্পর্ক প্রমাণিত হচ্ছে, যার কারণে শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা হযরত জিবরীল আমীন তাঁকে ছালাম বলেছেন। নিঃসন্দেহে এটা হযরত আয়েশা (রাযি.)-র অতি বড় কারামত।

হযরত খাদীজা (রাযি.)-র কারামত

৮১ নং কারামত ঃ

عَنْ خَدِيْجَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَا ابْنَ عَمِّ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُخْبِرَنِىْ بِصَاحِبِكَ الَّذِىْ يَأْتِيْكَ اذَا جَاءَكَ

قَالَ نَعَمْ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا اِذَا جَاءَه جِبْرِيْلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هذَا جِبْرِيْلُ قَدْ جَاءَنِى فَقَالَتْ اَتَرَاهُ الْآنَ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَاجْلِسْ عَلى شَقِّى الْاَيْسَرِ فَجَلَسَ قَالَتْ هَل تَرَاهُ الْآنَ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَتَحَوَّلْ فَاجْلِسْ فِى حُجْرِى فَتَحَوَّلَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ فَقَالَتْ هَلْ تَرَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَحَسَّرَتْ وَاَلْقَتْ خِمَارَهَا فَقَالَتْ هَل تَرَاهُ قَالَ لاَ قَالَتْ مَا هذَا شَيْطَانٌ اِن هذَا لَمَلَكٌ يَا ابْنَ عَمِّ اُثْبُتْ وَابْشِرْ ثُمَّ امَنَتْ بِه وَشَهِدَتْ اَنَّ الَّذِىْ جَاءَ بِهِ الْحَقُّ - (اسد الغابة ص ٤٢٧ ج ٥)

বর্ণিত আছে যে, হযরত খাদীজা (রাযি.) একবার রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আরয করলেন, হে চাচার পুত্র! (আরবে এ ধরণের সম্বোধনের প্রথা ছিল) আপনার যে ফেরেশতা বন্ধু সর্বদা আপনার কাছে আসেন, আবার কখনো আসলে কি আমাকে জানাতে পারেন ? রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই পারবো। তিনি হযরত খাদীজা (রাযি.)-র কাছেই বসা ছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরীল আমীন তশরীফ আনলে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই যে, জিবরীল এসেছেন। হযরত খাদীজা (রাযি.) বললেন, এখন কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন ? তিনি বললেন, হাঁ। হযরত খাদীজা (রাযি.) বললেন, আপনি আমার বাম পাশে বসুন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাম পাশে বসলেন। তখন হযরত খাদীজা (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন ? তিনি বললেন, হাঁ। হযরত খাদীজা (রাযি.) বললেন, এবার আপনি ডান দিকে বসুন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান দিকে বসলেন। তখন হযরত খাদীজা (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কি আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর হযরত খাদীজা (রাযি.) বললেন, আচ্ছা এবার আপনি আমার কোলে বসে পড়ুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবেই বসলেন। তখন হযরত খাদীজা (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, এবার তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ দেখতে পাচ্ছি। তখন হযরত খাদীজা (রাযি.) মাথার কাপড় ফেলে

দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখনো তাকে দেখতে পাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না এখনতো আর দেখতে পাচ্ছি না। তখন হযরত খাদীজা (রাযি.) বললেন, তাহলে শয়তান নয়, বরং সত্যি সত্যি ফিরেশতাই আপনার খিদমতে এসে থাকেন। সুতরাং আপনার ঘাবড়াবার কারণ নেই। সত্যের উপর আপনি অবিচল থাকুন এবং আনন্দিত হোন যে, নবুওয়াতের মহা সৌভাগ্য আপনাকে দান করা হয়েছে। অতঃপর হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাযি.) তাঁর উপর ঈমান আনলেন এবং সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি যা কিছু এনেছেন সবই সত্য ও অভ্রান্ত।

নবুওয়ত লাভের প্রথম দিকে যেহেতু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছুটা ভয় ভয় ভাব ছিলো, সেহেতু হযরত খাদীজা (রাযি.) তাঁকে সান্ত্বনা দান করেছিলেন, যেন তাঁর মন শান্ত ও আশ্বস্ত হয়ে যায়। এতে যাকে সান্ত্বনা দেয়া হলো তার উপর সান্ত্বনাদানকারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। কেননা ছোটও বড়কে সান্ত্বনা দান করতে পারে।

ভালোভাবে বুঝে নিন, এমন সূক্ষ্ম ও উর্ধ্বজাগতিক বিষয় আকল-বুদ্ধি দ্বারা বুঝে আসতে পারে না, বরং ইলহাম ও কাশফযোগেই শুধু জানা যায়। সুতরাং এটা হযরত খাদীজা (রাযি.)-র একটি কারামতরূপে সুপ্রমাণিত।

৮২ নং কারামত ঃ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اَتَانِى جِبْرِيْلُ عَلَيهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! هذه خَدِيْجَةُ قَد اَتَتْك وَمَعَهَا اِنَاءٌ فِيْه اِدَامٌ اَوْ طَعَامٌ اَوْ شَرَابٌ فَاِذَا هِىَ اَتَتْك فَاقْرَاْ عَلَيْه السَّلَامَ مِن رَّبِّهَا وَ مِنِّى وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ (اسد الغابة ص ٤٣٨ ج ٥)

হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জিবরীল (আ.) একবার আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই যে, খাদীজা আপনার কাছে আসছেন। তাঁর সাথে একটি পাত্রে তরকারী, আহার্যদ্রব্য ও পানীয় আছে। তিনি আসলে তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম পেশ করবেন এবং তাঁকে জান্নাতে এমন এক ভবনের সুসংবাদ দান করবেন যা মুক্তার

তৈরী। যেখানে কোন শোরগোল নাই। কষ্ট নাই। শুধু প্রশান্তি আর প্রশান্তি।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত খাদীজা (রাযি.)-র জন্য সালামের তোহফা নিয়ে হযরত জিবরীল আমীনের আগমন! সুবহানাল্লাহ্! এর চেয়ে বড় বুজুর্গী আর কারামত কি হতে পারে!

হযরত ফাতেমা যাহরা (রাযি.)-র কারামত

৮৩ নং কারামত ঃ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ شَكْوَاهَا الَّتِى قُبِضَتْ فِيْهَا فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا فَاصْبَحَتْ يَوْمًا كَامْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِى شَكْوَاهَا تِلْكَ قَالَتْ وَخَرَجَ عَلِىٌّ لِبَعْضِ حَاجَتِه فَقَالَتْ يَا أُمَّه أُسْكُبِى لِى غُسْلاً فَاغْتَسَلَتْ كَاَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّه اَعْطِيْنِى ثِيَابِى الْجُدُدَ فَاَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا ثُمَّ قَالَتْ لِى يَا أُمَّه اجْعَلِى لِى فِرَاشِى فِى وَسَطِ الْبَيْتِ فَفَعَلْتُ فَاضْطَجَعَتْ وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّه انِّى مَقْبُوضَةٌ الْآنَ قَدْ طَهُرْتُ الْآنَ فَلَا يَكْشِفُنِى اَحَدٌ فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ فَجَاءَ عَلِىٌّ فَاَخْبَرْتُه (اسد الغابة ص ٥٩٠ ج ٥)

হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) বলেন, যে অসুখে হযরত ফাতেমা (রাযি.)-র মৃত্যু হলো, সে সময় আমি তাঁর সেবা করছিলাম। একদিন সকালে আমি তাঁকে অসুস্থকালীন সময়ের সর্বোত্তম অবস্থায় দেখতে পেলাম। হযরত আলী (রাযি.) কোন কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, হে আম্মা! আমাকে গোসল করার পানি ঢেলে দিন। তিনি গোসল করলেন। এর চেয়ে সুন্দরভাবে গোসল করতে তাকে দেখি নি। অতঃপর তিনি বললেন, হে আম্মা! আমাকে আমার নতুন কাপড়গুলো দিন। তাকে নতুন কাপড়গুলো দিলাম। তিনি তা পরিধান করলেন। অতঃপর বললেন, হে আম্মা! ঘরের মধ্যখানে আমাকে বিছানা বিছিয়ে দিন। আমি তাই করলাম। তিনি বিছানায় শয়ন করলেন এবং কেবলামুখী হয়ে গালের নীচে হাত রেখে বললেন, আম্মাজান! এখন আমি আমার রবের সাথে মিলিত হতে চলেছি। আমি বিলকুল পবিত্র অবস্থায় আছি। সুতরাং কেউ যেন আমাকে নিরাবরণ না করে। অতঃপর সেখানেই তার রূহ বের হয়ে গেলো। হযরত আলী আসার পর তাকে আমি পুরো ঘটনা বললাম।

হযরত ফাতেমা (রাযি.)-র ফাযায়েল ও মানাকিব তথা গুণাবলী ও মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন আহমদ হাসান সাম্ভালী রচিত মানাকিবে ফাতেমা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তার মুসনাদ গ্রন্থে আবু নাঈমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ফাতেমা (রাযি.)-কে গোসলের পানি, কাপড় ও বিছানা বিছিয়ে দিয়েছিলেন আবু রাফে' (রাযি.)-এর স্ত্রী।

আমরা এখানে শুধু বলতে চাই যে, খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাযি.) কাশফ ও ইলহামযোগে মৃত্যুর সঠিক সময় জানতে পেরেছিলেন এবং একজন সুস্থ মানুষের মত পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় শুয়ে পড়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর অতি বড় এক কারামত।

উসদুল গাবার পঞ্চম খণ্ডে বলা হয়েছে যে, হযরত ফাতেমা (রাযি.) এভাবে গোসল করার উদ্দেশ্য এই ছিলো না যে, তাঁকে আর মাইয়েতের গোসল দেয়া হবে না। কেননা অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত ইসমাঈল হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতেমা (রাযি.) বলেছিলেন, হে আসমা! তুমি এবং আলী আমাকে গোসল দেবে। এ ছাড়া আর কেউ যেন আমার শরীরে হাত না দেয়।

৮৪ নং কারামত ঃ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادى مُنَادٍ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ يَا اَهْلَ الْجَمِيْعِ غُضُّوا اَبْصَارَكُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُرَّ - (اسد الغابة ص ٥٢٣ ج٥)

হযরত আলী (রাযি.) বলেন, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন পর্দার পিছন থেকে ঘোষণা করা হবে, হে উপস্থিত লোক সকল! ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ অতিক্রম করা পর্যন্ত তোমরা দৃষ্টি নীচু করে রাখো।

আল্লাহু আকবার! কত বড় মর্তবা খাতুনে জান্নাতের যে, কেয়ামতের কঠিন দিনেও তাঁর সম্মানার্থে ফরমান জারী হবে। এর চেয়ে বড় কারামত আর কী হতে পারে ?

৮৫ নং কারামত ঃ

عَنْ عَلِى اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ اِنَّ اللهَ يَغْضَبُ لِغَضَبِكِ وَ يَرْضَى لِرِضَاكِ - (اسد الغابة ص ٥٢٢ ج ٥)

হযরত আলী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমাকে বলেছেন, তোমার অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন এবং তোমার সন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। অর্থাৎ তুমি কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার প্রতি আল্লাহ্ও অসন্তুষ্ট হন। কেননা কারো প্রতি অকারণে তুমি অসন্তুষ্ট হতে পারো না। তদ্রূপ তুমি কারো প্রতি সন্তুষ্ট হলে তার প্রতি আল্লাহ্ও সন্তুষ্ট হন এবং তাকে বিভিন্ন নেয়ামত দান করেন। কেননা তুমি অকারণে কারো প্রতি সন্তুষ্ট হও না। কারো প্রতি তোমার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি আল্লাহ্রই জন্য হয়ে থাকে। এজন্যই আল্লাহ্ তোমাকে এত মর্যাদা-মরতবা দান করেছেন। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হযরত ফাতেমা (রাযি.) ছিলেন আল্লাহ্র খুবই প্রিয় পাত্রী। সুতরাং সকলেই বিশেষতঃ নারীরা হযরত ফাতেমা (রাযি.)-র জীবন ও চরিত্র অনুসরণ করে সহজেই আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র বা পাত্রী হতে পারে। এখন শুধু আমল করার দেরী মাত্র।

৮৬ নং কারামত ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِى قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ اِلَى فَاطِمَةَ فَاَقْبَلَتْ تَسْعٰى وَثَبَتَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا حَتّٰى اَلْقَتْهُ عَنْهُ وَاَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ .... الخ متفق عليه (اشعث اللمعات ص ٢٨١ ج ٤)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.) এক দীর্ঘ ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন, (একবার রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে আত্মনিমগ্ন ছিলেন। তখন নরাধম কাফিররা সিজদার সময় তাঁর উপর আবর্জনা এনে নিক্ষেপ করলো। তাঁকে লক্ষ্য করে তামাশা-উপহাস করতে লাগলো। তখন নিজের ঈমান গোপনকারী) কোন এক ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে হযরত ফাতেমাকে খবর দিলো। হযরত ফাতেমা ছুটে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো সিজদায় পড়ে ছিলেন। হযরত ফাতেমা তাঁর উপর থেকে আবর্জনা সরিয়ে তাঁকে উদ্ধার করলেন এবং নরাধম কাফিরদের কঠোর ভর্ৎসনা করলেন।

হযরত ফাতেমা (রাযি.)-র এ হিম্মত নিঃসন্দেহে তাঁর অতি বড় কারামত। কেননা শিশু অবস্থায় হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি শত্রুদের সামনে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে টু-শব্দ করারও কারও সাহস হলো না। শত্রুদল ক্রোধের সময় প্রতিপক্ষের ছোট শিশুর মুখে কড়া কথা শুনে কখনো এটা মনে করে না যে, বাচ্চা মানুষ, যেতে দাও। বরং আরো বেশী মারমুখী হয়ে উঠে। আর এরা তো মুসলমানদের জানি দুশমন। কন্যাসন্তান

জীবন্ত দাফনকারী জালিম দল। সুতরাং হযরত ফাতেমার মুখে কড়া কথা শুনে চুপ করে বসে থাকার পাত্র ছিলো না তারা কিছুতেই। বরং এটা হযরত ফাতেমা (রাযি.)-রই কারামত যে, তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ কথায় জালিমদের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

জনৈক ছাহাবীর কারমত

৮৭ নং কারামত ঃ

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَاِلٰى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ ـ متفق عليه (مشكوة ص ١٨٢ ج ١)

হযরত বারা (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ছাহাবী সূরাতুল কাহফ তেলাওয়াত করছিলেন। তার পাশে এক ঘোড়া বাঁধা ছিলো। এমন সময় একটি মেঘ দেখা দিল, যা তাকে ঢেকে ফেলল। অতঃপর মেঘখণ্ড ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল। আর তার ঘোড়া দাপাদাপি করতে লাগলো। সকালে উক্ত ছাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে ঘটনা খুলে বললেন। তিনি ইরশাদ করলেন, এটা হলো সাকীনা (বা জান্নাতী প্রশান্তি) যা কোরআন তেলাওয়াতের কারণে নাজিল হয়েছে।

হযরত উছায়দ বিন হোযায়র (রাযি.)-র কারামত

৮৮ নং কারামত ঃ

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَاءُ مِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوْطَةٌ عِنْدَهُ اِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ فَقَرَأَ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيٰى قَرِيْبًا مِنْهَا فَاَشْفَقَ اَنْ تُصِيْبَهُ وَلَمَّا اَخَّرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَلَمَّا اَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِىَّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَا يَابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَا

يَابْنَ حُضَيْرٍ قال : فَاشْفَقْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ! اَن تَطَأَ يَحيى وَكَانَ منهَا قريبًا فَانْصَرَفْتُ اِلَيه وَرَفَعْتُ رَأسى اِلَى السَّمَاء فَاذا مِثْلُ الظُّلَّة فيهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَخَرَجْتُ حَتّٰى لاَ اَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِى مَا ذَاكَ قَالَ لاَ ، قَالَ تِلكَ الْمَلٰئِكَةُ دَنَتْ بِصَوْتِكَ وَلَو قَرَأتَ لَاَصبحتْ يَنظُرُ النَّاسُ اِلَيهَا لا تَتَوَارى مِنْهُم مُتَّفَقٌ عليه واللفظ للبخارى ـ (مشكوة ص ٢٨٤ ج ١)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, উছায়দ বিন হোযায়র বলেছেন যে, একরাত্রে তিনি সূরা বাকারা তিলাওয়াত করছিলেন। তার ঘোড়া পাশেই বাঁধা ছিলো। হঠাৎ ঘোড়া লাফাতে শুরু করলো। তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করে চুপ হলেন। তখন ঘোড়াও শান্ত হয়ে গেলো। তিনি আবার যখন তেলাওয়াত শুরু করলেন, তখন ঘোড়া আবার উত্তেজিত হলো। তখন তিনি আবার চুপ হয়ে গেলেন। আর ঘোড়াও শান্ত হয়ে গেলো। তিনি আবার তেলাওয়াত শুরু করলেন। এবার তৃতীয় দফায় ঘোড়া লাথি ছাড়তে শুরু করলে তিনি কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। কেননা তার পুত্র ইয়াহয়া ঘোড়ার খুব কাছে ছিলো। তাই তার গায়ে ঘোড়ার লাথি লাগার আশংকা ছিলো। তিনি পুত্রকে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে উপরে আসমানের দিকে মাথা তুললেন। দেখেন কি, ছায়ার মত কি এক জিনিস, তাতে বাতির মত কতগুলো কি যেন জ্বল জ্বল করছে।

ভোরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ঘটনা শোনালেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি যদি পড়তেই থাকতে তাহলে ভালো হতো। তিনি বললেন, আমার পুত্র ইয়াহয়া ঘোড়ার কাছেই ছিলো। আমার ভয় হচ্ছিল যে, হয়ত ঘোড়া তার উপর ছুটে গিয়ে পড়বে। এজন্য আমি তিলাওয়াত বন্ধ করে তার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে বেরিয়ে এসে আর কিছুই দেখতে পেলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জানো যে তা কী ছিলো ? তিনি আরয করলেন জ্বি-না, জানি না। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তারা ছিলেন ফেরেশতা। তোমার তিলাওয়াতের আওয়াজে তারা নিকটে আসছিলেন। তুমি যদি অব্যাহতভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতে, তাহলে ভোরে সকলে তাদেরকে দেখতে পেতো। তোমাদের কারো দৃষ্টির আড়ালে থাকতো না। (বুখারী মুসলিম, তবে শব্দগুলো, বুখারী বর্ণিত)

জনৈক ছাহাবীর কারামত

৮৯ নং কারামত ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُ قَالَ ضَرَبَ بَعْضُ اَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَاءَه عَلٰى قَبْرٍ وَهُوَ لاَ يَحْسَبُ اَنَّه قَبْرٌ فَاِذَا فِيْهِ اِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِه الْمُلْكُ حَتّٰى خَتَمَهَا فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخبَرَه فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم هِىَ الْمَانِعَةُ هِىَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِن عَذَابِ الله ـ رواه الترمذى (مشكوة ص ١٨٧-١٨٨ ج ١)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, জনৈক ছাহাবী এক কবরের নিকটে তাবু টানালেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, সেখানে কবর আছে। সেই কবরবাসী পূর্ণ সূরা তাবারাকাল্লাযী তিলাওয়াত করলেন। উক্ত ছাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাবারাকাল্লাযী সূরা হচ্ছে বিপদাপদ রোধকারী এবং আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে রক্ষাকারী। ইমাম তিরমিযি এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য হাদীছ থেকে জানা গেলো যে, উক্ত ছাহাবী কবরের ভিতরের কোরআন তিলাওয়াত শুনতে পেয়েছিলেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা তাঁর অতি বড় কারামত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.)-র কারামত

৯০ নং কারামত ঃ

عَنْ اَبِى هُرَيرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنهُ فِى حَدِيْثٍ طَوِيلٍ فَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم مَا فَعَلَ اَسِيرُكَ قُلْتُ زَعَمَ اَنَّه يُعَلِّمُنِى كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا قَالَ اَمَا اَنَّه صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ وَتَعلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ قُلتُ لاَ قَالَ ذَاكَ الشَّيطَانُ ـ رواه البخارى (مشكوة ص ١٨٥ ج ١)

এক দীর্ঘ ঘটনার অংশবিশেষে হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.)-কে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হোরায়রা! তোমার বন্দীর কি খবর। আমি আরয করলাম, সে বলতে চায় যে, আমাকে এমন কালাম শিখিয়ে দিবে যা আমার উপকারে আসবে। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করলেন, চরম মিথ্যাবাদী হলেও তোমার সাথে সে সত্য কথাই বলেছে। জানো! কার সাথে তিন রাত্র ধরে কথা বলছো ? আমি আরয করলাম, না। তিনি বললে, সে ছিলো শয়তান। ইমাম বুখারী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী দীর্ঘ হাদীছের আগাগোড়া সবটাই বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে আমরা প্রয়োজনীয় অংশটাই শুধু বর্ণনা করলাম, যাতে হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.) কর্তৃক শয়তানকে গেরেফতার করার কথা বর্ণিত হয়েছে, যা তাঁর কারামতের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

হযরত রাবী (রাযি.)-র কারামত

৯১ নং কারামত ঃ

عَنْ رَبْعِى بْنِ حِرَاشٍ قَالَ كُنَّا اَرْبَعَةَ اِخْوَة وَكَانَ الرَّبِيْعُ اَخُوْنَا اَكْثَرَنَا صَلوةً وَاَكْثَرنَا صِيَامًا فِى الْحَرِّ وَالْبَرد وَاَنَّه تُوُفِّىَ فِيْنَا وَنَحْنُ حَوْلَه وَبَعَثْنَا مَن يَّبْتَاعُ لَه كَفَنًا اِذْ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِه فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ الْقَوْمُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا اَخَا عَبسٍ اَبَعْدَ الْمَوْت قَالَ نَعَمْ اِنِّى لَقِيْتُ رَبًّا غَيْرَ غَضْبَانَ فَاسْتَقْبَلَنِىْ بِرُوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَاسْتَبرَق اَلاَ وَاَنَّ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يَنتَظِرُ الصَّلوةَ عَلَىَّ فَعَجِّلُوْنِىْ وَلاَ تُوَخِّرُونِى ثُمَّ كَانَ بِمَنْزِلَةِ حَصَاءِ رُمِىَ فِى طَسْتٍ فَنُمِىَ الحَدِيْثُ اِلى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اَمَا اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَتَكَلَّمُ رَجُلٌ مِن اُمَّتِى بَعْدَ الْمَوْتِ ـ رواه فى الحلية (الرحمة المهداة ص٣٠٢)

হযরত রাবঈ বিন হিরাশ (রাযি.) বলেন, আমরা চার ভাই ছিলাম। আমাদের (সকলের ছোট) ভাই রাবী নামাযে এবং শীত-গ্রীষ্মে রোজা রাখার

ব্যাপারে আমাদের চেয়ে আগুয়ান ছিলো। সে যখন মৃত্যু বরণ করলো তখন আমরা তাকে ঘিরে বসেছিলাম। আমরা কাফনের কাপড় খরিদ করার জন্য মানুষও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ তিনি মুখের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে বলে উঠলেন, السلام عليكم। সকলে জবাবে বললো, وعليكم السلام, মৃত্যুর পরে কথা বলছো ? সে উত্তর দিলো, হাঁ। তোমাদেরকে ছেড়ে গিয়ে আমি এমন রব্বের সান্নিধ্য পেয়েছি যিনি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ নন। তিঁনি আমার উপর রহমতের বারিধারা বর্ষণপূর্বক জান্নাতের খুশবু ও জান্নাতের পোশাক দান করেছেন। শোন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম আমার জানাযা পড়ানোর অপেক্ষায় আছেন। সুতরাং এখন বিলম্ব করো না। দ্রুত সব কিছু সমাধা করো। অতঃপর আবার সে আগের মত নিষ্প্রাণ হয়ে গেলো। (তখন আমরা তার দাফন-কাফনের ইন্তিজাম করলাম।)

এ ঘটনা যখন হযরত আয়েশা (রাযি.)-কে শোনানো হলো তখন তিনি বললেন, হাঁ। আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের একজন লোক মৃত্যুর পর কথা বলবে। আল হোলয়া গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত রাবী এর নাম ছাহাবা কেরামের তালিকায় দেখা তো যায় নি, তবে এই ঘটনা ও অন্যান্য আলামত দ্বারা তাঁর ছাহাবা হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃত।

হযরত 'আলা বিন হাযরামী (রাযি.)-র কারামত

৯২-৯৩ নং কারামত ঃ

عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَانِبٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ العَلاَءِ بنِ الحَضْرَمِىِّ فَسِرْنَا حَتّى اَتَيْنَا دَارِينَ وَالبَحْرُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم فَقَالَ يَا عَلِيْمُ يَا حَكِيْمُ يَا عَلِىُّ يَا عَظِيْمُ اِنَّا عَبِيْدُكَ اَللّهُمَّ فَاجْعَلْ لَنَا اِلَيْهِمْ سَبِيْلاً فَتَقَحَّمَ بِنَا الْبَحْرُ فَخُضْنَا مَا بَلَغَ لُبُودَنَا الْمَاءُ فَخَرَجْنَا اِلَيْهِمْ وَفِى رِوَايَةِ اَبِى هُرَيرَةَ فَلَمَّا رَاَى عُمَّالُ كِسْرى فَقَالَ لاَ نُقَاتِلُ هؤُلاَءِ فَقَعَدَ فِىسَفِيْنَةٍ وَلَحِقَ بِفَارِسَ ـ رواه فى الحلية (الرحمة المهداة ص ٣٠٢)

ছাহাম বিন মিন্জাব বর্ণনা করেন যে, আমরা 'আলা বিন হাযরামীর সাথে জিহাদের জন্য রওয়ানা হলাম। অতঃপর দারীন নামক স্থানে উপনীত হলাম।

তখন আমাদের ও শত্রুদের মাঝে সমুদ্র অন্তরায় ছিলো। তখন হযরত 'আলা বিন হাযরামী (রাযি.) সমুদ্রের কিনারে দাঁড়িয়ে বললেন, يا عليم (হে সর্বজ্ঞানী) يا حكيم (হে মহা প্রজ্ঞাময়) يا علي (হে মহা মর্যাদার অধিকারী) يا عظيم (হে মহান) হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই বান্দা, আটকা পড়ে আছি। (সমুদ্রের একূলে আটকা পড়ে আছি, অন্যপারে তোমাদের দ্বীনের শত্রুরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পরাজিত করে, তোমার দ্বীনের পথে আনার জন্য) তাদের পর্যন্ত যাওয়ার পথ আমাদের সামনে খুলে দাও। এই দু'আ করে তিনি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বললেন। সমুদ্রের পানি আমার ঘোড়াগুলোর বুক পর্যন্তও পৌছে নি, এমন অবস্থায় নিরাপদে আমরা সমুদ্র পার হয়ে গেলাম।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.)-র বর্ণনায় আছে,পারস্য সম্রাটের প্রশাসক যখন এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখলো তখন সে বলে উঠলো, আমরা এদের সাথে লড়াই করতে পারি না। অতঃপর সে নৌপথে পারস্যে ফিরে গেল (এবং তার বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।)

হযরত যায়েদ বিন খারেজা (রাযি.)-র কারামত

৯৪ নং কারামত ঃ

ذَكَرَ الْحَافظُ بْنُ حَجَرٍ فى تَهْذِيبِ التَّهْذِيْبِ فى تَرْجَمَته وَ انَّه الْمُتَكَلِّمُ بَعْدَ الْمَوْت رَوَاهُ ابن سَعدٍ وابنُ ابى حَاتم و التِّرمذى وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ والبَغَوِىُّ والطبرىْ و اَبُو نَعيمٍ وغَيْرُهم ـ (ص ٤٠٩-٤١٠ ج ٣)

তাহযীবুত্তাহযীব গ্রন্থে হযরত যায়েদ বিন খারেজা (রাযি.)-র পরিচয় পর্বে বলা হয়েছে যে, তিনি মৃত্যুর পর কথা বলেছিলেন। (ইবনে সা'আদ, ইবনে আবী হাতিম, তিরমিযি, ইয়াকুব বিন সুফিয়ান, বাগাবী, তাবারী, আবু নাঈম প্রমুখ এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

যায়েদ বিন খারেজা তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রাযি.)-র খেলাফত কালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাহযীবুত্তাহযীবের টীকায় আছে, মৃত্যুর পরে কথা বলার ঘটনা হযরত নো'মান বিন বশীর (রাযি.) এভাবে বর্ণনা করেছেন—

যায়েদ বিন খারেজার ইনতিকালের পর তাঁর জানাযার নামায পড়ানোর জন্য তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রাযি.)-র আগমনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

আমি (নো'মান বিন বশীর) ভাবলাম, ইত্যবসরে দুই রাকাত নামায পড়ে নেই। এদিকে আমি নামায শুরু করেছি ওদিকে যায়েদ বিন খারেজা মুখের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে বলে উঠলেন—

السلام عليك يا اهل البيت

তার সাথে সকলের কথাবার্তা চলছিলো আর আমি সিজদায় سبحان ربى الاعلى পড়ছিলাম। যায়েদ বিন খারেজা কথার মাঝে বললেন, লোক সকল! নিরব হয়ে আমার কথা শোনো। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যের অনুসারী ছিলেন। আবু বকর সত্যের অনুসারী ছিলেন। তিনি শারীরিকভাবে তো ছিলেন হালকা-পাতলা, কিন্তু আল্লাহ্‌র বিধান জারী করার ব্যাপারে ছিলেন খুবই মযবুত ও বলবান। অতঃপর হযরত উমর ফারূক ছিলেন সর্বাধিক সত্যানুসারী। তিনি যেমন ছিলেন মযবুত দেহের অধিকারী, তেমনি আল্লাহ্‌র বিধান জারী করার ক্ষেত্রেও ছিলেন খুবই কঠোর। এখন হযরত উছমান (রাযি.)-র খেলাফতের দুই বছর পার হয়ে গেছে। আর চার বছর অবশিষ্ট আছে। ইনিও সত্যের মূর্ত প্রতীক। তাঁর খেলাফত আমলের সব কিছুই হবে গোলযোগপূর্ণ। আরিছ কূপের কথা তো তোমাদের জানাই আছে। যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি হযরত উছমানের হাত থেকে পড়ে গিয়েছিলো। আসলে সেদিন থেকেই ফেতনার দরজা খুলে গেছে। আর হে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা! তোমার উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি হোক! তোমরা কী সা'আদ ও খারেজার অবস্থা জানো না। অতপর তিনি বিলকুল খামোশ হয়ে গেলেন। এ ঘটনা কয়েক সূত্রে হযরত নো'মান বিন বশীর ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু ওয়াকিদ লায়ছি (রাযি.)-র কারামত

৯৫ নং কারামত ঃ

ইবনে ইসহাক ও আল্লামা বায়হাকী (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু ওয়াকিদ লায়ছি (রাযি.) বলেছেন, বদর যুদ্ধে তিনি এক মুশরিককে হত্যা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তলোয়ার তাকে স্পর্শ করার পূর্বেই তার মাথা কেটে নীচে পড়ে গেলো।

হযরত সাহল বিন হানীফ (রাযি.)-র কারামত

৯৬ নং কারামত ঃ

হাকিম, বায়হাকী, আবু নঈম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হযরত সাহল বিন হানীফ (রাযি.) বলেছেন যে, বদর যুদ্ধে অবস্থা এই ছিলো যে, আমরা কোন মুশরিক খোদাদ্রোহীকে লক্ষ্য করে তরবারির ইঙ্গিত করা মাত্র তরবারি না পড়তেই তার মাথা কেটে দূরে গিয়ে পড়তো।

ঘটনা এই যে, বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা আগমন করতেন এবং মুসলিম যোদ্ধার ইশারা পাওয়া মাত্র উদ্দিষ্ট মুশরিককে হত্যা করতেন।

হযরত আবু বুরদাহ (রাযি.)-র কারামত

৯৭ নং কারামত ঃ

ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন, হযরত আবু বুরদাহ (রাযি.) বলেছেন, আমি মুশরিকদের তিনটি কর্তিত মুণ্ডসহ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এই তিনজনের দুজনকে তো আমি হত্যা করেছি। কিন্তু তৃতীয়জনের ঘটনা এই যে, এক সুদর্শন তাগড়া যুবক একে হত্যা করেছেন। কিন্তু তিনি আমাদের মুজাহিদ দলের কেউ নন। কেননা আমার সকল সাথীকেই আমি চিনি। অতঃপর আমি নিহত মুশরিকের মাথা কেটে নিয়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বললেন, তিনি ছিলেন অমুক ফেরেশতা।

হযরত সাহল বিন আমর (রাযি.)-র কারামত

৯৮ নং কারামত ঃ

আল্লামা বায়হাকীর বর্ণনায় হযরত সাহল বিন আমর (রাযি.) বলেন, বদর যুদ্ধে আমি কিছু সংখ্যক গৌর বর্ণের লাল-সাদা পোশাক পরা যোদ্ধা দেখেছি, যারা চিত্র বর্ণের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে লড়াই করছিলেন। তারা যেদিকে ধাওয়া করতেন কাতারকে কাতার সাফ করে দিতেন।

হযরত উসামাহ বিন যায়েদ (রাযি.)-র কারামত

৯৯ নং কারামত ঃ

বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনা মতে হযরত উসামা (রাযি.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের উপস্থিতিতে তিনি জিবরীল (আ.)-কে দেখেছেন।

জনৈকা মুহাজির ছাহাবি (রাযি.)-র কারামত

১০০ নং কারামত ঃ

ইমাম বায়হাকী ও ইবনে আদী (রহ.) হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণনা করেছেন, জনৈকা অন্ধ বৃদ্ধার নওজোয়ান আনসারী পুত্র মৃত্যুবরণ করলো। বৃদ্ধা তখন তার মুখে কাপড় দিয়ে দিলেন। আমরা সবাই বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিচ্ছিলাম। কিন্তু বৃদ্ধা বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! আজ তুমি আমার বিপদ দূর করে দাও। হে আল্লাহ্ মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের ওসিলায় আমায় সাহায্য করো।

হযরত আনাছ বলেন, আমরা তখনো সেখানেই বসা ছিলাম। এরই মধ্যে সেই মৃত যুবক, যে পিতার দিক থেকে আনসারী ছিলো, চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে বৃদ্ধা মাকে লক্ষ্য করে বললো, এখন আর চিন্তা করো না। আমি জীবিত হয়ে গেছি। পরে আমরা সকলে তাহার সাথে আহার করলাম।

উল্লেখ্য যে, উক্ত বৃদ্ধা ছাহাবিয়া আবেগে আত্মহারা হয়ে এ দু'আ করেছিলেন। আর ভাবে নিমগ্নতার ক্ষেত্রে মানুষ নির্দোষ। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে অসম্ভব ধরনের কিছুর জন্য দু'আ করা উচিত নয়।

উক্ত ছাহাবিয়ার হিজরতের আসল উদ্দেশ্য তো ছিলো আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টি। তবে বিপদাপদে সাহায্য লাভ করা ছিলো পার্শ্ব উদ্দেশ্য। ছালাতুল হাজতেরও এরূপ উদ্দেশ্য থাকে। অর্থাৎ প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া। কিন্তু সেটা আসল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র ইবাদতের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি সাধন।

হযরত ছাবিত বিন কায়স (রাযি.)-র কারামত

১০১ নং কারামত ঃ

আল্লামা বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওবায়দুল্লাহ্ আনছারী হতে বর্ণনা

করেছেন যে, হযরত ছাবিত বিন কায়স যে সময় ইয়ামামা যুদ্ধে শহীদ হলেন তখন তাঁর দাফন কার্যে আমিও শরীক ছিলাম। তাঁকে যখন কবরে রাখা হলো তখন তিনি বলে উঠলেন—

محمد رسول الله মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল। ابوبكرالصديق আবু বকর হলেন ছিদ্দীক, উমর হলেন শহীদ। عثمان البر الرحيم উছমান হলেন নেককার ও দয়ালু।

আমরা সবাই তার এ কথা স্পষ্টভাবে শুনলাম। অতঃপর তিনি আগের মতই মৃত অবস্থায় হয়ে গেলেন।

হযরত জা'আদ বিন কায়স (রাযি.)-র কারামত

১০২ নং কারামত ঃ

ইবনে সা'আদ হযরত জা'আদ বিন কায়স মুরাদী (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন যে, আমরা চারজন হজ্জের উদ্দেশ্যে দেশ থেকে রওয়ানা হলাম। ইয়ামানের বিয়াবান অঞ্চলে আমরা এ আওয়ায শুনতে পেলাম—

হে সওয়ার দল! তোমরা যখন জমজম ও হাতীমে উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের সালাম আরয করবে এবং এ পয়গাম দিবে যে, আমরা তাঁর দ্বীনের উপর অবিচল এবং তার প্রতি অনুগত আছি। তাঁর আনুগত্যের উপদেশ হযরত ঈসা (আ.)ও আমাদের দিয়ে গেছেন।

হযরত বিলাল বিন হারিছ (রাযি.)-র কারামত

১০৩ নং কারামত ঃ

ইমাম আহমদ, বায্‌যার, আবু ইয়া'লা, বায়হাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হযরত বেলাল বিন হারিছ (রাযি.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। মক্কার পথে উরুজ নামক স্থানে আমরা তাবু ফেললাম এবং আলাদা আলাদা তাবুতে বিশ্রাম নিলাম। আমি আমার তাবু থেকে বের হয়ে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুশল জানার জন্য যখন সেদিকে গেলাম তখন দেখলাম তাবুতে তিনি নেই, বরং দূরে মরুভূমিতে একা অবস্থান করেছেন। আমি দ্রুত সেদিকে গেলাম। কিন্তু কিছু দূর যেতেই শোরগোলের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমার বুঝতে বাকী থাকলো না যে, জ্বিন বা ফেরেশতাদের ভির চলছে সেখানে। তাই আমি থেমে

গেলাম। মনে হচ্ছিলো যেন বহু লোক চিৎকার করে কথা বলছে এবং তুমুল ঝগড়া চলছে। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাসতে হাসতে আমার কাছে আসলেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই শোরগোল কিসের ছিলো? তিনি বললেন, মুসলমান ও কাফির জিনদের বসবাসের ব্যাপারে বিবাদ চলছিলো এবং উভয় পক্ষ মীমাংসার জন্য আমার কাছে এসেছিলো। আমি তাদের বক্তব্য শুনে এই ফায়সালা করে দিলাম যে, মুসলমান জ্বিনেরা হাবশায় এবং কাফির জ্বিনেরা গোর অঞ্চলে বাস করবে এবং একে অন্যের এলাকায় অনুপ্রবেশ করবে না। হাদীছের বর্ণনাকারী হযরত কাছীর বিন আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, হাবশা অঞ্চলে জ্বিনগ্রস্ত রোগী সহজেই আরোগ্য লাভ করে। পক্ষান্তরে গোর অঞ্চলের জ্বিনগ্রস্ত রোগী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করে থাকে।

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাযি.)-র কারামত

১০৪ নং কারামত ঃ

فِىْ رَوْضِ الرَّيَاحِيْنِ مِنْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثُ الْمُتَّفَقِ عَلٰى صِحَّتِهٖ اَيْضًا فِىْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ الَّذِىْ قَالَ فِيْهِ اللَّتِىْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ اَنَّهٗ اَخَذَ شَيْئًا مِنْ اَرْضِهَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَاَعْمِ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِىْ اَرْضِهَا فَمَا مَاتَتْ حَتّٰى ذَهَبَ بَصَرُهَا وَبَيْنَمَا هِىَ تَمْشِىْ فِىْ اَرْضِهَا اِذْ وَقَعَتْ فِىْ حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ ـ اخرجاه فى الصحيحين (ص١٧ مصرى)

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ সম্পর্কে বর্ণিত যে হাদীছটির বিশুদ্ধতায় সকল মুহাদ্দিস একমত তা এই যে, জনৈকা দুষ্ট স্বভাবের নারী এই মিথ্যা দাবী করলো যে, হযরত সাঈদ অন্যায়ভাবে তার একখন্ড জমি দখল করে নিয়েছেন। তখন হযরত সাঈদ তার নামে বদদু'আ করে বললেন, হে আল্লাহ্! এ নারী যদি মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তার চক্ষু ফুটো করে দাও এবং তার জমিনের উপরই তাকে মৃত্যু দান করো। ফলে সে অন্ধ হয়ে গেলো। একদিন সে তার জমিনের উপর হাঁটছিলো, এমন সময় এক গর্তে পড়ে সেখানেই তার মৃত্যু হলো। বুখারী ও মুসলিম এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

হযরত সালমান ও আবু দারদা (রাযি.)-র কারামত

১০৫-১০৬ নং কারামত

انَّه كَانَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا قَصْعَةٌ فَسَبَّحَتْ حَتّى سَمِعَا التَّسْبِيْحَ - (رياض الصالحين ص ١٨)

হযরত সালমান ও আবু দারদা (রাযি.) এক স্থানে বসা ছিলেন। তাঁদের মাঝে একটি পেয়ালা রাখা ছিলো এবং 'সুবহানাল্লাহ্' তাছবীহের আওয়াজ আসছিলো। তাঁরা তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন।

হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.)-র কারামত

১০৭ নং কারামত ঃ

فِى حَدِيْث طَوِيْلٍ قَالَ مَا كَانَ لِىْ مِنْ طَعَامٍ الاَّ مَاءَ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتّى تَكَسَّرَتْ عُكْنُ بَطْنِىْ وَمَا اَجِدُ عَلى كَبِدِى سَخْفَةَ جُوْعٍ فَقَالَ اِنَّهَا مُبَارَكَةٌ وَاِنَّهَا طَعَامُ طَعِمٍ - رواه مسلم (تيسير الوصول ص ١٥٢ ج ٢)

এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু যর! তোমাকে খাবার কে খাওয়াতো ? (হযরত আবু যর বলেন) আমি জবাব দিলাম, জমজমের পানি ছাড়া আর কোন খাবার ছিলো না। কিন্তু তাতেই আমি এমন মোটাতাজা হলাম যে, পেটের চামড়া দলা হয়ে গেলো এবং ক্ষুধা আমার কলিজায় কোন প্রভাব ফেলে নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, জমজমের পানি খুবই উত্তম জিনিস এবং পেট ভরার জন্য খুবই উত্তম খাদ্য। ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ঘটনা এই যে, হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.) জমজম কূপের সামনে এক মাস অবস্থান করেছিলেন এবং এ সময় শুধু জমজমের পানিই ছিলো তার অবলম্বন। অন্য কোন খাদ্য তিনি তখন গ্রহণ করেন নি। যদিও এই পবিত্র পানির এমনই গুণ ও বরকত, তবে এই বরকতের প্রকাশস্থল আল্লাহ্র বিশেষ বান্দারাই শুধু হয়ে থাকেন।

হযরত ইমরান বিন হাছীন (রাযি.)-র কারামত

১০৮-১১০ নং কারামত ঃ

মুসলিম শরীফে হযরত ইমরান বিন হাছীন (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ফিরেশতারা আমাকে ছালাম করতেন। কিন্তু আমার ত্রিশ বছরের পুরনো অর্শ রোগের এক বিশেষ চিকিৎসা গ্রহণের পর থেকে ফিরেশতাদের ছালাম করা বন্ধ হয়ে গেলো। পরে সেই চিকিৎসা ত্যাগ করলে আবার ফিরেশাতারা ছালাম করা শুরু করলেন।

তিরমিযি শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইমরানের ঘরে মানুষ কোন সালামকারীকে দেখতো না, কিন্তু এই আওয়াজ শুনতে পেতো।

"হে ইমরান! السلام عليكم"

নাসীমুর রিয়ায গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য বরাতযোগে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইমরান বিন হাছীনের সাথে ফিরেশতারা মুছাফাহা করতেন।

হযরত হারিছ বিন কিলদাহ (রাযি.)-র কারামত

১১১-১১২ নং কারামত ঃ

اَخْرَجَ ابنُ سَعد والحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَالْحَارِثَ بنَ كَلَدَةَ يَاكُلاَنِ حَرِيرَةً اُهْدِيت لاَبِى بَكْرٍ فَقَالَ الحَارِثُ ارْفَعْ يَدَكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ اِنَّ فِيْهَا لَسَمَّ سَنَةٍ وَاَنَا وَاَنْتَ نَمُوتُ فِىْ يَومٍ وَاحِدٍ فَرَفَعَ يَدَه فَلَمْ يَزَالاَ عَلِيلَينِ حَتّى مَاتَا فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ عِندَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ (تاريخ الخلفاء ص ٦٠)

ইবনে সা'আদ ও হাকিম বিশুদ্ধ সনদে ইবনে শিহাবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর ও হযরত হারিছ বিন কিলদাহ (রাযি.) একত্রে বসে কোথাও থেকে হাদিয়ারূপে আসা ছাতু জাতীয় কিছু খাচ্ছিলেন। হঠাৎ হযরত হারিছ (রাযি.) বলে উঠলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! হাত উঠিয়ে ফেলুন। এতে এমন বিষ মিশানো হয়েছে যার ক্রিয়ায় এক বছরের মাথায় মৃত্যু ঘটে। সুতরাং আমরা উভয়ে একই দিন মৃত্যুবরণ করবো। তখন উভয়ে এক সাথে তা খাওয়া বন্ধ করলেন এবং এক বছর পরে একই দিনে উভয়ে মৃত্যু বরণ করলেন।

এখানে হযরত হারিছের দুটি কারামত প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমতঃ কোন প্রমাণ ছাড়াই তিনি বিষ ও বিষের প্রকার বুঝতে পেরেছেন। অথচ এক বছর স্থায়ী ক্রিয়া বিশিষ্ট বিষ চিহ্নিত করার কোন প্রমাণ তাঁর হাতে ছিলো না। দ্বিতীয়তঃ এ কথাও তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তাদের উভয়ের মৃত্যু একই দিনে হবে। নিঃসন্দেহে এই ইলহাম ও কাশফ ছিলো হযরত হারিছ বিন কিলদাহ (রাযি.)-র অতি বড় কারামত।

হযরত হিলাল বিন উমাইয়া (রাযি.)-র কারামত

১১৩ নং কারামত ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنِّى لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ تَعَالَى مَا يُبْرِئُ ظَهْرِىْ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِىْ وَلَهَا شَاْنٌ اَخْرَجَهُ الْبُخَارِى والترمذى وابوداود كذا فى التَّيسر الْمَطْبُوعِ فى كَلْكَته صفحة ٨١ ـ (تكشف ص ٢٩ ج ٥)

হিলাল বিন উমাইয়া (রাযি.) সম্পর্কিত ঘটনা হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত হয়েছে। সে ঘটনার একাংশে আছে, হযরত হিলাল রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তিনি জানেন যে, আমি সত্যবাদী এবং অবশ্যই আল্লাহ্ এমন কিছু নাজিল করবেন যা আমাকে অপবাদ আরোপের হদ (শাস্তি) থেকে মুক্ত করবে। তখন জিবরীল (আ.) لعان সম্পর্কিত আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি لعان সংক্রান্ত আয়াত নাযিল না হতো তাহলে আমার ও সেই মহিলার ব্যাপার খুবই কঠিন হয়ে যেতো। অর্থাৎ ব্যভিচারের অপরাধে রজমের শাস্তি দেয়া হতো। বুখারী, তিরমিযি ও আবু দাউদ এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়। আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রীর উপর যেমন ব্যভিচারের শাস্তি আসবে না তেমনি স্বামীর উপরও অপবাদ আরোপ করার শাস্তি আসবে না। বরং উভয়কে কসম করে নিজ নিজ নির্দোষিতা দাবী করতে হবে। এটাই হলো لعان। বিস্তারিত জানতে হলে ফেকাহ বা তাফসীর গ্রন্থ দেখুন।

এখানে হযরত হিলাল বিন উমাইয়ার কারামত এই যে, তার কসম রক্ষা করে لعان সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছে। অথচ কাশফ ছাড়া তার জানার কোন উপায় ছিলো না যে, এ সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হবে কি হবে না।

হযরত 'আমির বিন ফোহয়ারা (রাযি.)-র কারামত

১১৫ নং কারামত ঃ

رَوَى الْبُخَارِى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِى حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِيْنَ بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ وَاُسِرَ عَمْرُو بْنُ اُمَيَّةَ الضمرى قَالَ لَه عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَنْ هٰذَا وَ اَشَارَ اِلَى قَتِيْلٍ فَقَالَ لَه عَمْرُو بْنُ امية هٰذَا عَامِرُ بن فُهَيْرَةَ فَقَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ اِلَى السَّمَاءِ حَتَّى اِنِّى لَاَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ بَيْنَه وَبَيْنَ الْاَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ ـ (ص ٥٨٧ ج ٢)

একটি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী লিখেছেন, হযরত হিশাম বিন উরওয়াহ বলেন, আমাকে আমার পিতা বলেছেন, 'বিরে মাউনা'র মর্মান্তিক ঘটনায় যখন ছাহাবা কেরামকে শহীদ করা হলো তখন আমর বিন উমাইয়া (রাযি.)-কে বন্দী করা হয়। আমের বিন তোফায়েল এক শহীদের প্রতি ইংগীত করে আমর বিন উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করলো, এ লোকটি কে ? আমর বিন উমাইয়া (রাযি.) বললেন, একে চিন না! ইনিই তো আমির বিন ফোহায়রা (রাযি.)। তখন সে বললো, এর জানাযাকে আমি আসমানের দিকে উঠে যেতে দেখেছি। এক সময় তা এতো উপরে উঠলো যে, আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর আবার তা জমিনে ফিরে আসলো।

আল্লাহ পাক আমির বিন ফোহায়রার বুজুর্গী ও কারামত প্রকাশের জন্যই তার জানাযা আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

জনৈক জ্বিন ছাহাবীর কারামত

১১৬-১১৮ নং কারামত ঃ

اَخْرَجَ ابْنُ الْجَوْزِى فِىْ كِتَابِ صَفْوَةِ الصَّفْوَةِ بِسَنَدِه عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ فِىْ نَاحِيَةِ دِيَارِ عَادٍ اِذْ رَاَيْتُ مَدِيْنَةً مِنْ حَجَرٍ مَنْقُوْرٍ فِىْ

وَسَطِهَا قَصْرٌ مِنْ حِجَارَةٍ تَاوِيهِ الجن فَدَخَلْتُ فَاذَا شَيْخٌ عَظِيْمُ الْخَلْقِ يُصَلِّىْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوْف فِيْهَا طَرَاوَةٌ فَسَلَّمَ اَتَعَجَبُ مِنْ عَظِيْمِ خَلْقَتِه كَتَعَجبِى مِنْ طَرَاوَةِ جُبَّتِه فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَىَّ وَقَالَ يَا سَهْلُ ان الاَبْدَانَ لاَ تُخلقُ الثِّيَابَ وَانَّمَا تُخْلِقُهَا رَوَائِحُ الذُّنُوْبِ وَمَطَاعِمُ السُّحْفِ وَان هذه الجُبَّةُ عَلَىَّ مُنْذُ سَبْعَ مِائَةِ سَنَةٍ لَقِيْتُ فِيْهَا عِيْسى وَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلاَمُ فَامَنْتُ بِهِمَا فَقُلْتُ وَمَنْ اَنْتَ قَالَ مِنَ الَّذِيْنَ نُزِلَتْ فِيْهِمْ قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ - (لباب النقول مصرى ص ١١٧ ج ٢)

আল্লামা ইবনে জাওযী তাঁর صفوة الصفوة গ্রন্থে নিজ সনদে সাহল বিন আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি কাওমে আদের বস্তির এক প্রান্তে অবস্থান করছিলাম। সেখানে পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাথর খোদাই করা বাড়ী-ঘর দেখতে পেলাম। মধ্যস্থলে এক বড় ইমারত ছিলো। তাতে জ্বিনদের বসবাস ছিলো। ইমারতে প্রবেশ করে দেখি বিরাট দেহের অধিকারী এক বৃদ্ধ কাবামুখী হয়ে নামায পড়ছেন। তার দেহে রয়েছে পশমের এক জুব্বা যা একেবারেই নতুন মনে হচ্ছিলো। আমি তার বিরাট দেহ আর নতুন ঝলমলে জুব্বার কথা ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি নামাযের ছালাম ফিরালেন। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়েই বললেন। হে সাহাল বিন আব্দুল্লাহ্! শরীরে পরিধানের কারণে বস্ত্র কখনো জীর্ণ বা পুরনো হয় না। কেননা শরীরের এমন কোন বৈশিষ্ট নেই যার কারণে কাপড় জীর্ণ হয়ে ছিড়ে যাবে। কাপড় তো শুধু গুনাহের কারণেই জীর্ণ হয়ে ফেটে যায়। আমার এই সাধারণ জুব্বা সাতশ বছর ধরে ব্যবহার করছি এবং এই পোশাকেই আমি হযরত ঈসা (আ.) ও রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং তাদের উপর ঈমান এনেছি। (সাহল বলেন,) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে ? তিনি বললেন, আমি তাদের একজন যাদের সম্পর্কে সূরা জ্বিনে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ

দেখুন, এই জ্বিন ছাহাবীর তিনটি কারামত এখানে প্রকাশ পেলো। প্রথমতঃ

জানাশোনা ছাড়াই তিনি সাহল বিন আব্দুল্লাহ্র নাম বললেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি সাহল বিন আব্দুল্লাহ্র মনের ভাবনা জেনে ফেললেন এবং তার আশ্চর্য হওয়ার কারণ দূর করলেন। তৃতীয়তঃ সাতশত বছর ধরে জুব্বা ব্যবহার করছেন অথচ তা একেবারেই নতুন রয়ে গেছে।

সময় সল্পতার কারণে খুব সংক্ষেপে ছাহাবা কেরামের সামান্য কিছু কারামত এখানে জমা করা হলো। নতুবা আরো বিরাট আকারে সংগ্রহ করে পেশ করা যেতো। যাই হোক আল্লাহ্র শোকর যে, এই মোবারক কাজ সমাপ্ত হলো এবং আমি মনে করি যে, এইটুকুই ঈমান তাজা করার জন্য যথেষ্ট। হযরত ইমাম হোসায়ন (রাযি.)-র কারামত যেদিন লেখা হচ্ছিলো সেদিন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফাতেমা জাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহার যিয়ারত আল্লাহ্ পাক নছীব করেছেন।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এবং পাঠকবর্গ, প্রকাশক ও যারা এর জন্য মেহনত করেছেন তাদের সকলকে তোমার রহমতে ডুবিয়ে দাও। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

— ▣ —

আমাদের প্রকাশিত বিশেষ গ্রন্থাবলী
আহকামে মাইয়্যেত
সীরাতুল মুস্তফা (সঃ)
কাসাসুল আম্বিয়া
বারো চান্দের ফজীলত
তাম্বীহুল গাফেলীন
খাবের তাবিরনামা
আফজালুল মাওয়ায়েজ
গুনিয়াতুত তালেবীন
আশরাফী বেহেস্তী জেওর
আল-মানার (অভিধান)
মুনাজাতে মকবুল
হিসনে হাসীন
মুসলিম শরীফ
নাফেউল খালায়েক
আমলে কোরানী
তিনশত মোজেযা
উম্মতের ঐক্য
জবানের হেফাজত
শামায়েলে তিরমিযী
ফতুহুল গয়ব
শরীয়তের দৃষ্টিতে পর্দা
মনযিল
মুসলিম নারীদের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর উপদেশ
রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার হাকীকত
মাকামে সাহাবা ও কারামাতে সাহাবা
মোহাম্মদী লাইব্রেরী চকবাজার, ঢাকা